সবার প্রিয় সুভাষ

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭
জুন, ১৯৭০

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
কালিপদ মজুমদার
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস
৩৩বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ
জহর দাস

দশ টাকা

SABAR PRIYA SUBHAS

By

Sudhangsu Ranjan Ghosh

Price Rs. 10·00

* এই গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও চিত্রাদি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে পেয়েছি।   —লেখক

আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে

I am led to the conclusion that the principles that should form the basis of our collective life are justice, equality, freedom, discipline and love. …I shall go further and say these principles constitute the essence of socialism.

—Subhas Chandra, 1929

In my openion, however, the fight for political freedom will have to be conducted simultaneously with the fight for socio-economic emancipation.

—Subhas Chandra, 1935

National Socialism has been able to create national unity and solidarity and to improve the condition of the masses. But it has not been able to radically reform the prevailing economic system which was built up on a capitalistic basis.

—Subhas Chandra, (Tokio Speech)

আমি জানি সুভাষচন্দ্র বোসকে মারবার মত বোমা বৃটিশ এখনও তৈরি করতে পারেনি। —সুভাষচন্দ্র, ১৯৪৫

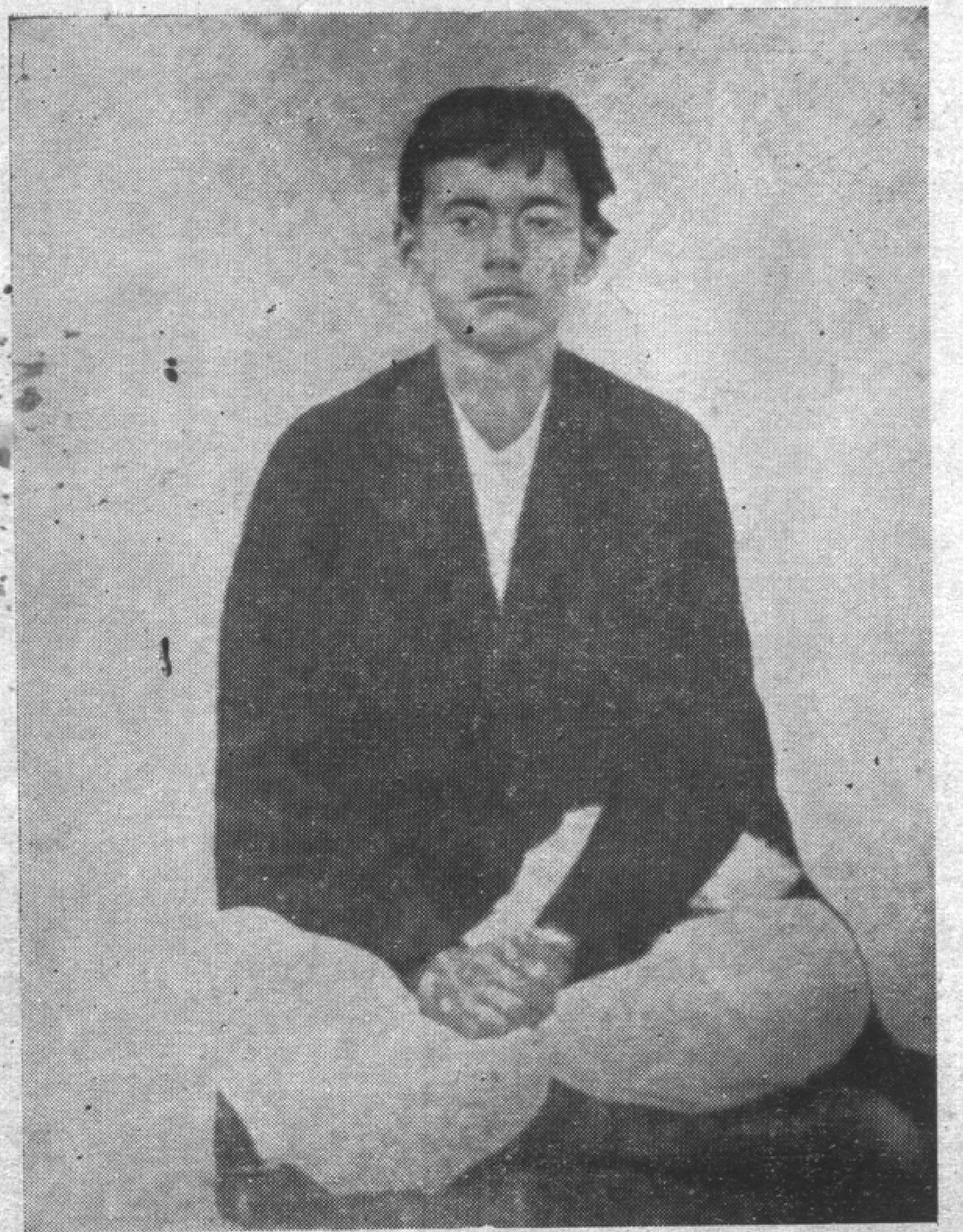
I can die thousand times if I can shake hands with him. —কোন এক জাপানী সামরিক অফিসার



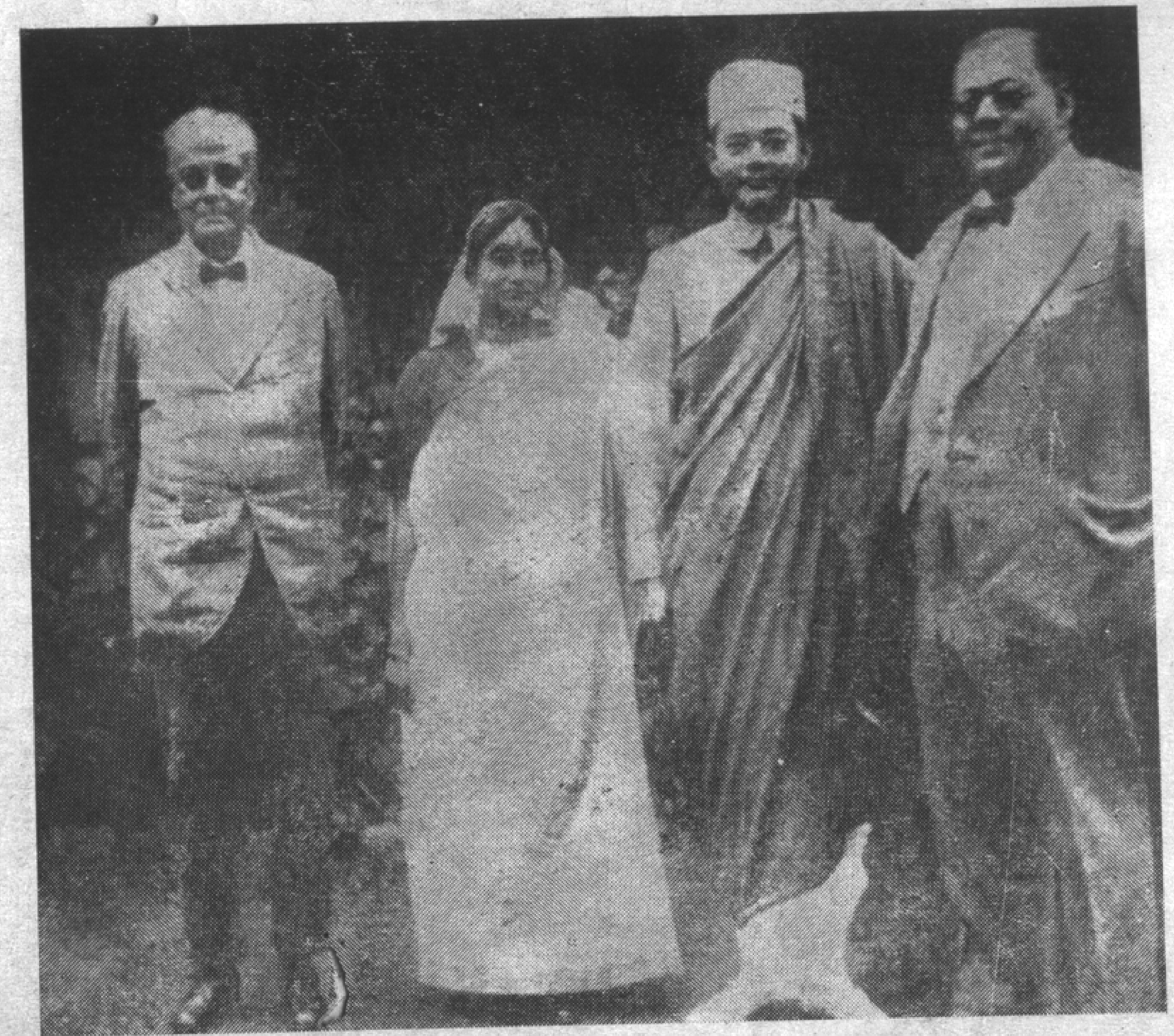
পরিবারের সঙ্গে পিতা জানকীনাথের কোলে ছোট্ট সুভাষ



সুভাষ জননী প্রভাবতী দেবী



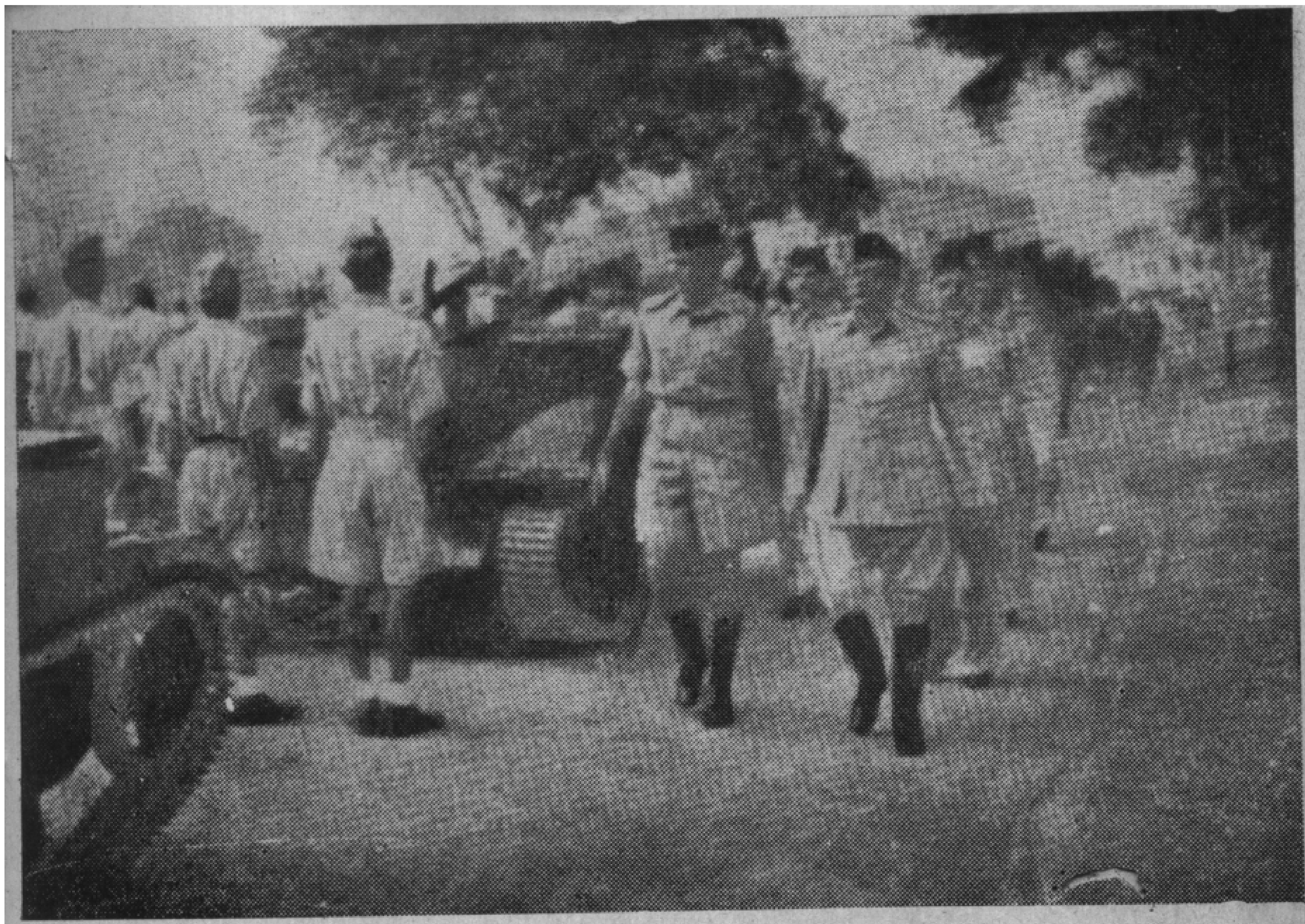
কিশোর সুভাষ



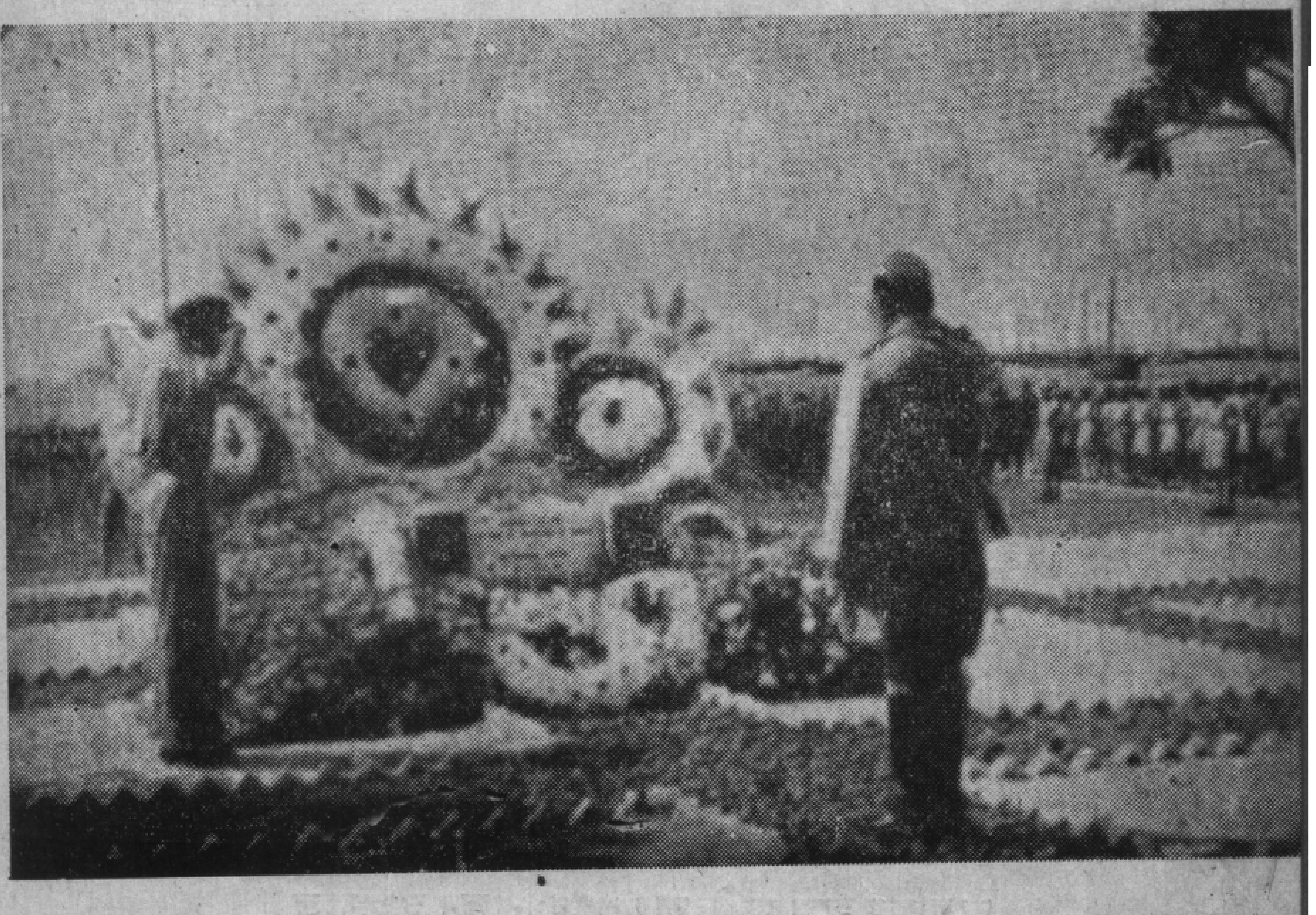
জানকীনাথ, বিভাবতী, সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবী



এ. এফ. ভি ব্যাটালিয়ান পরিদর্শনরত সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর, ১৯৪৩



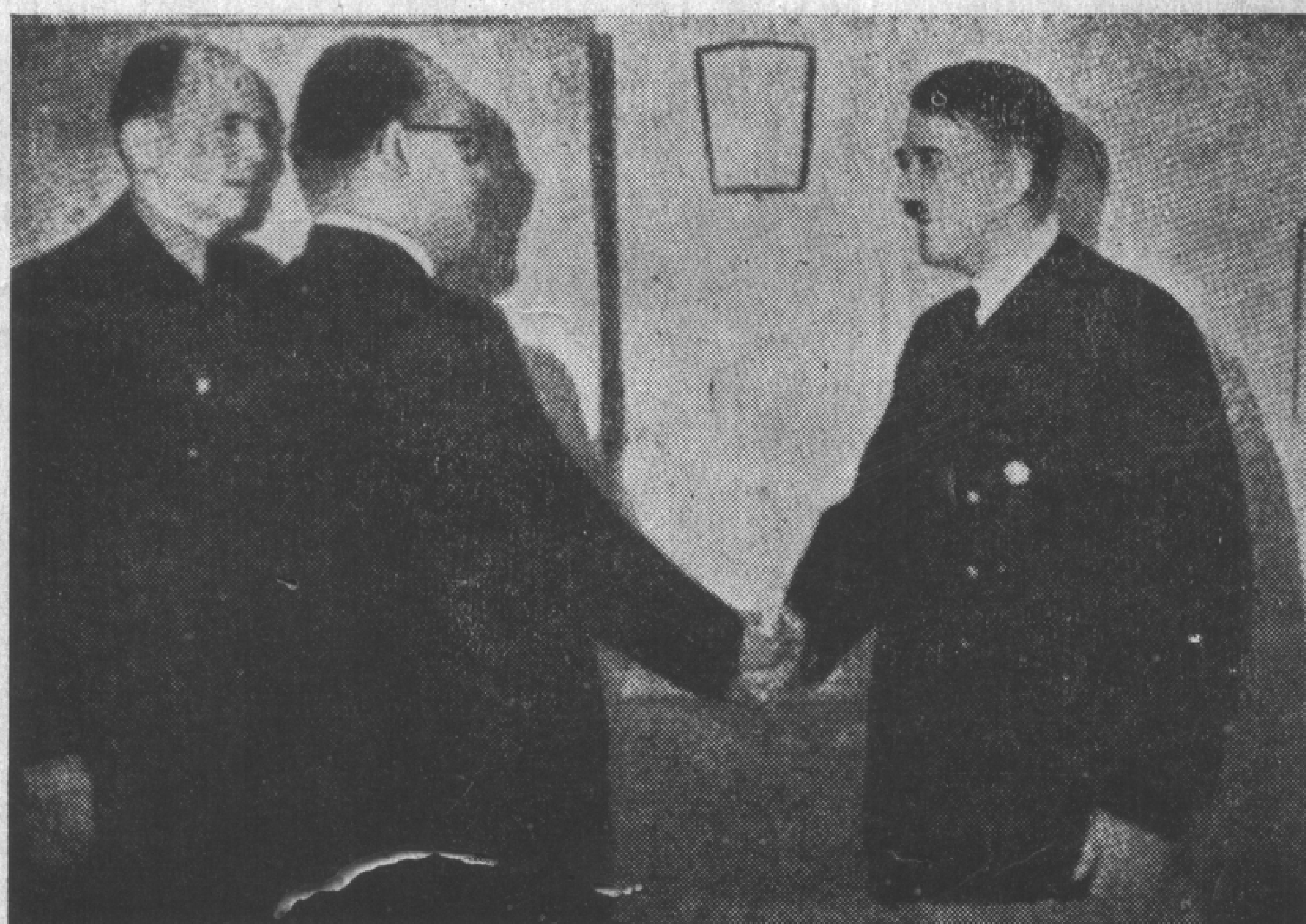
সুভাষচন্দ্র কর্তৃক সিঙ্গাপুরে আই. এন. এ শহীদ স্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন



তলোয়ার হস্তে স্বাধীনতার শপথ নিচ্ছেন সুভাষচন্দ্র



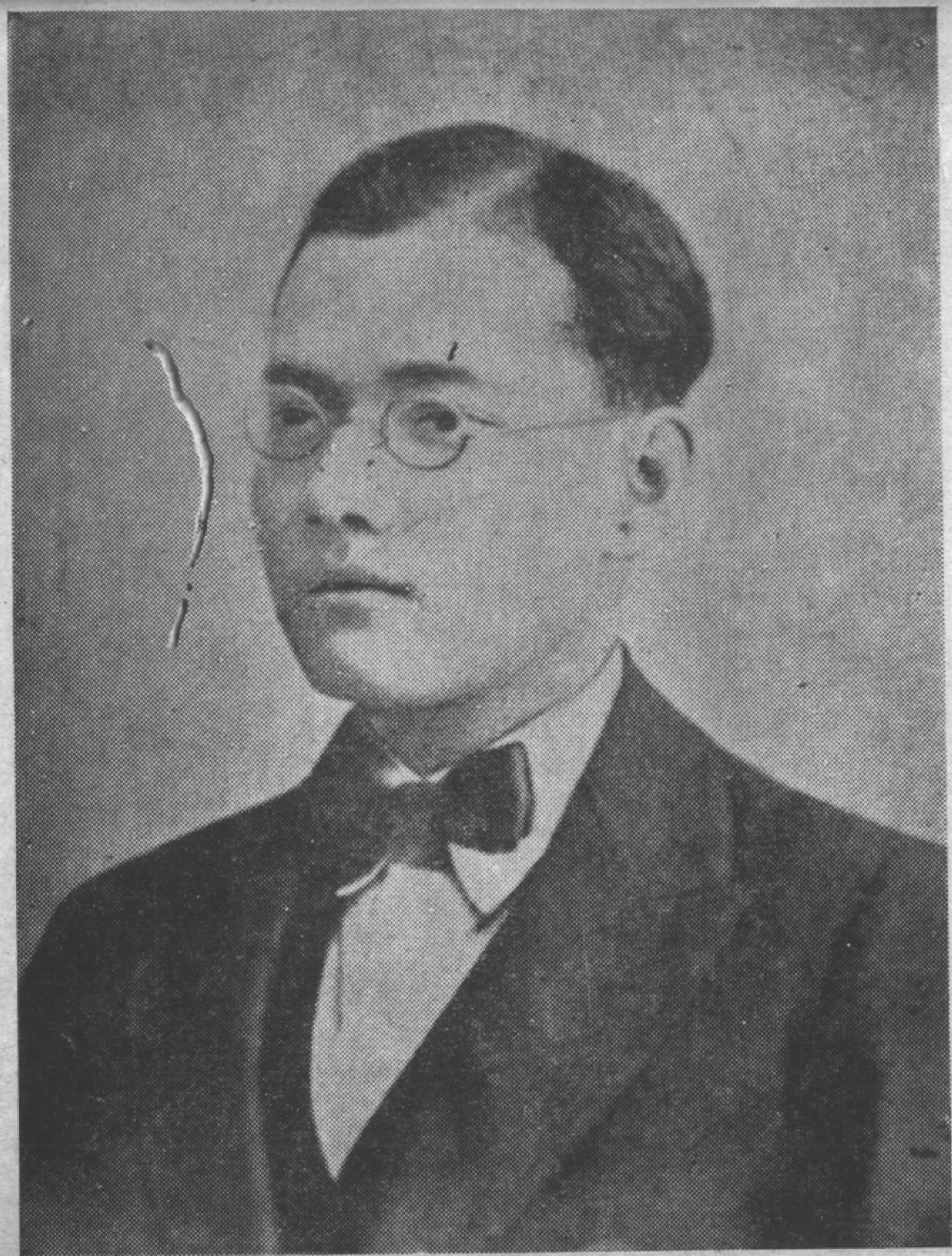
মেসেরিৎস্-এ সুভাষচন্দ্র ও হাউপ্টম্যান হারবিগ



হিটলার নেতাজীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন



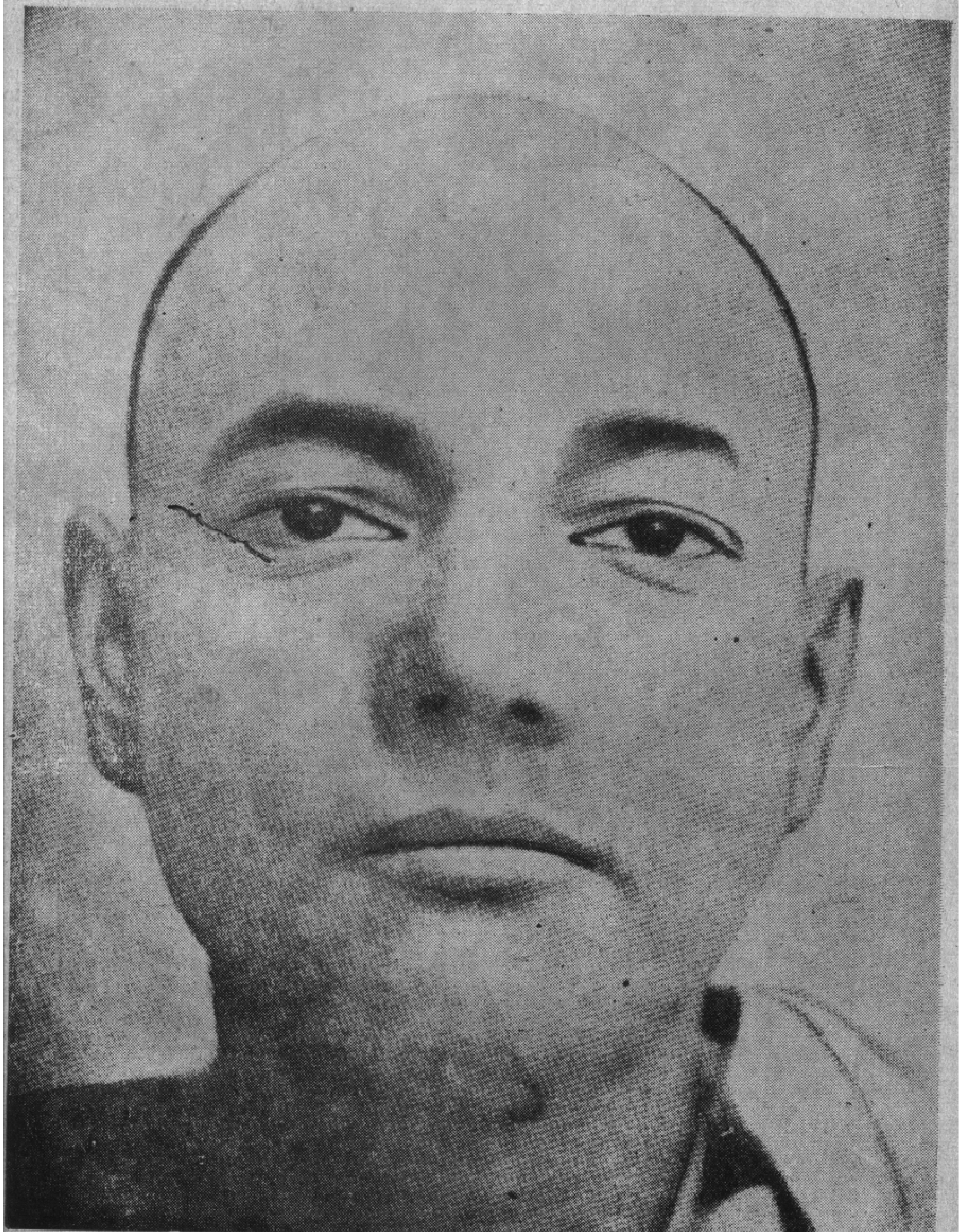
নেতাজীর সিঙ্গাপুরে গমন, সঙ্গে রাসবিহারী বসু



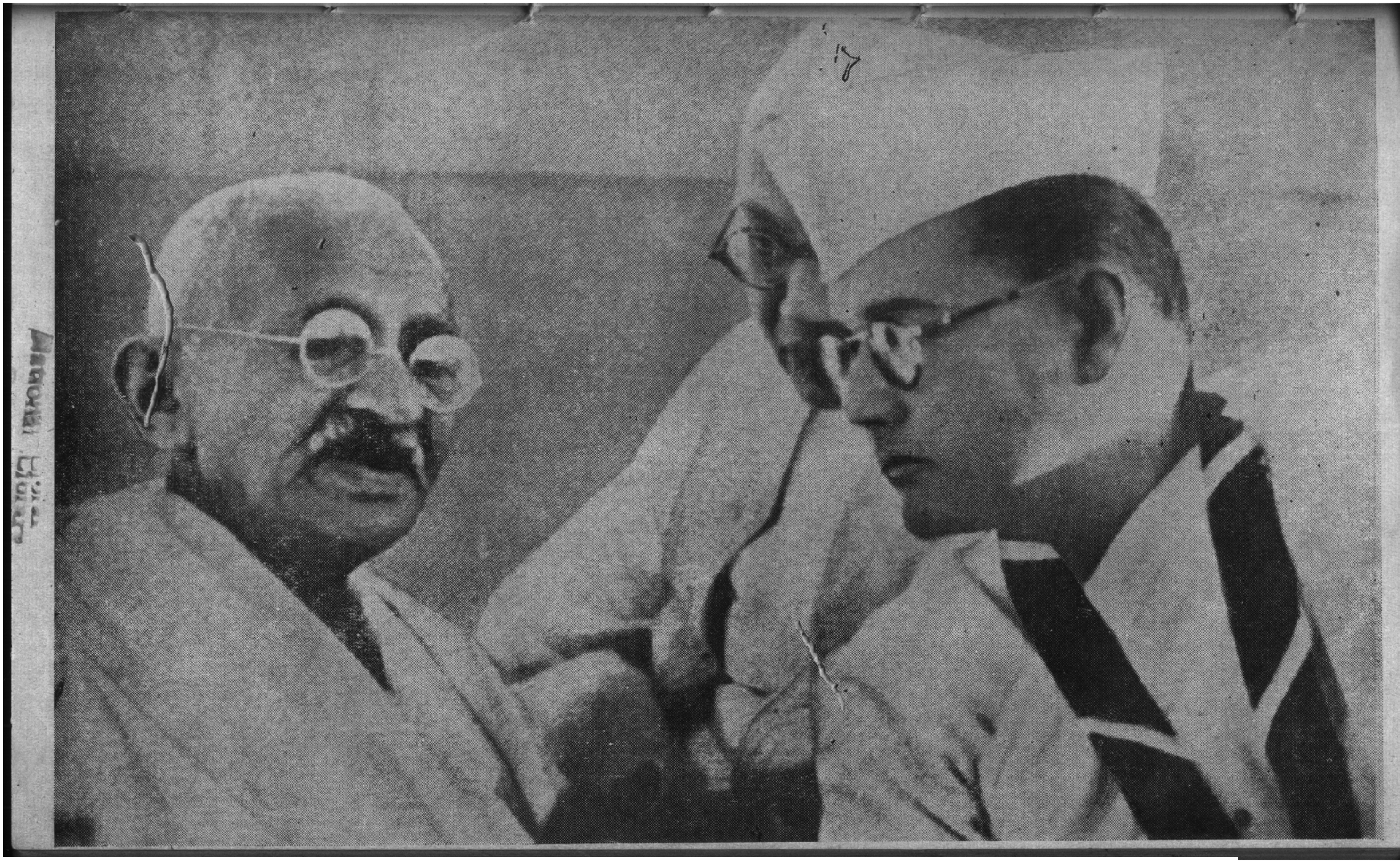
কেমব্রিজে সুভাষচন্দ্র ১৯১৯-২০



কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী সুভাষচন্দ্র



পিতৃবিয়োগের পর সুভাষচন্দ্র





রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র



অজস্র অভিনন্দনধন্য সুভাষচন্দ্র



নেতাজী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল টোজো



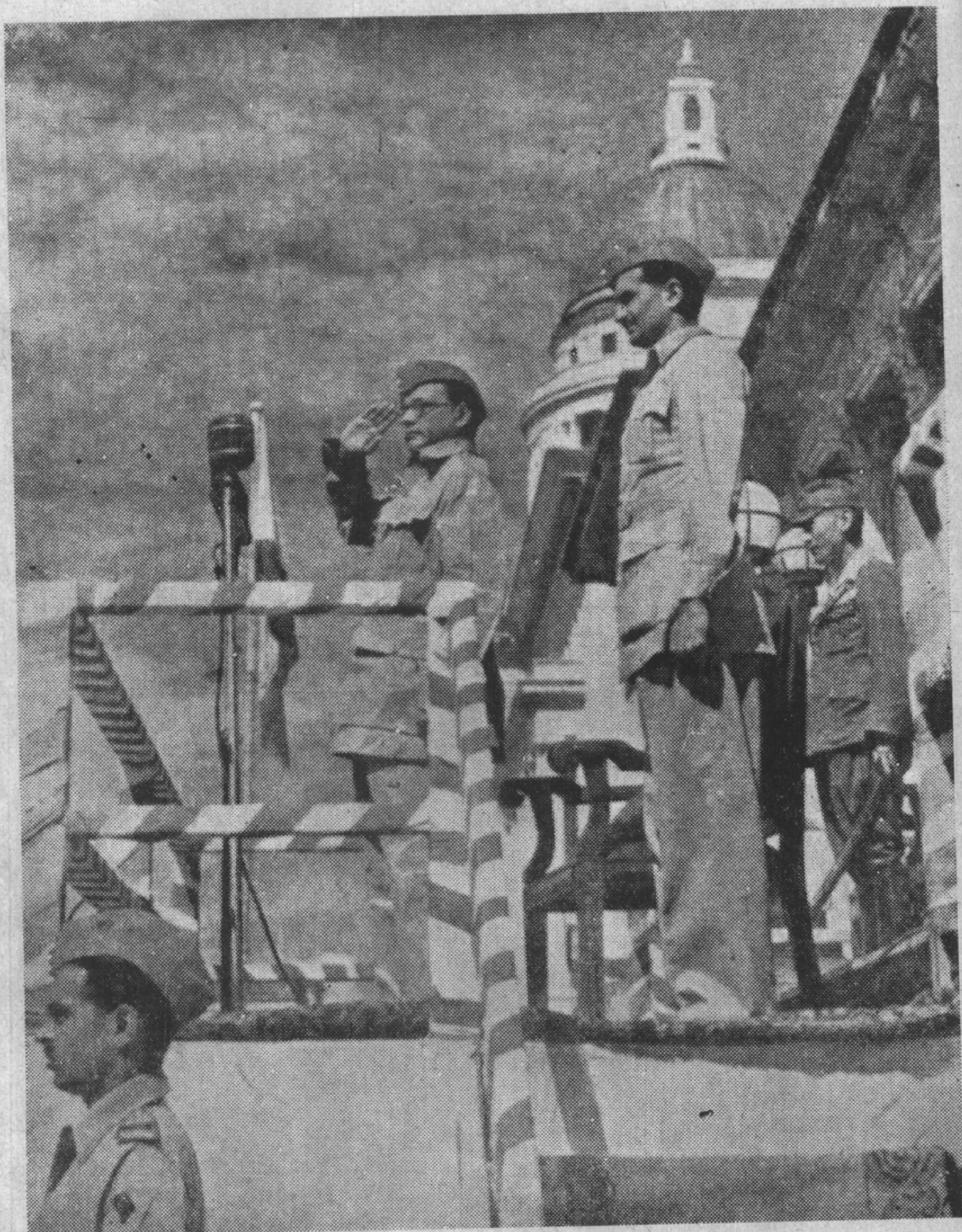
অন্তর্ধান-এর সময় সুভাষচন্দ্র



আজাদ হিন্দ ঘোষণাপত্র পাঠ,
২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩



সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক



নেতাজী সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজে অভিনন্দন গ্রহণ করছেন



রণাঙ্গনে সুভাষচন্দ্র



জাপানের রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল নেতাজীকে অভিবাদন জানাচ্ছেন



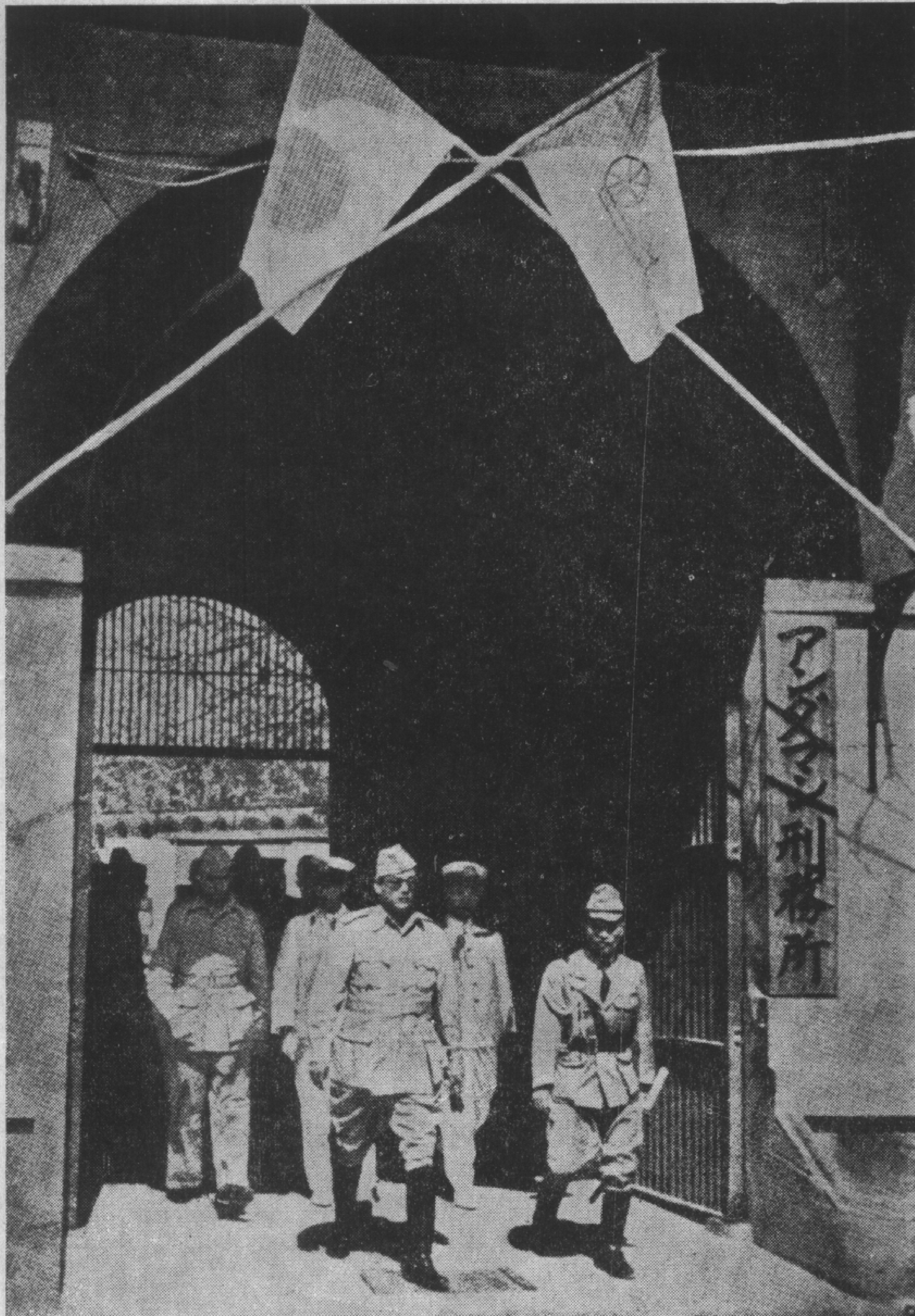
টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্রের বেতার ভাষণ



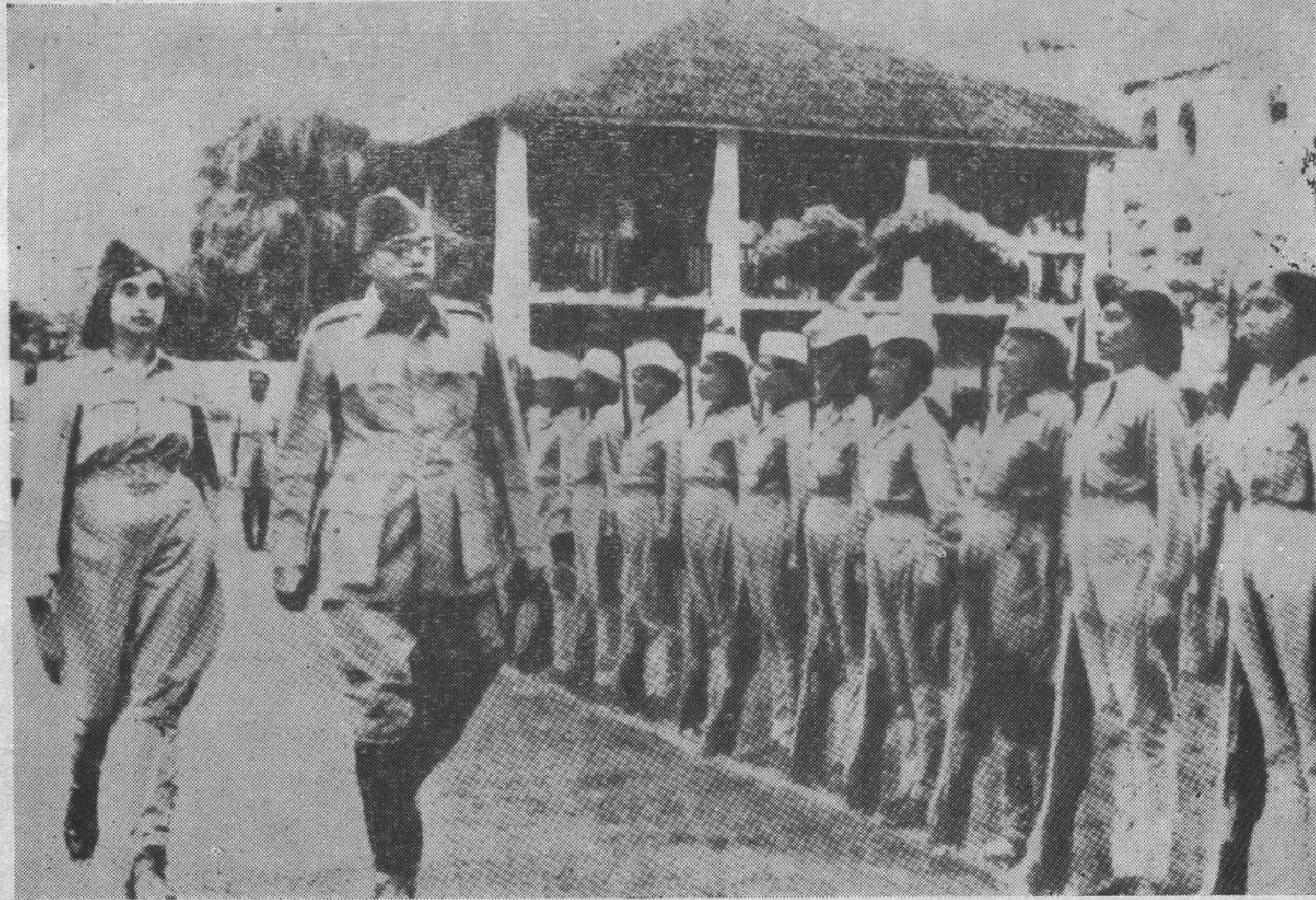
সুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুরে আগমন



যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছেন সুভাষচন্দ্র



সেলুলর জেল পরিদর্শন করে নেতাজী বেরিয়ে আসছেন



ঝাঁসির রাণী বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করছেন সুভাষচন্দ্র

ARZI HAKUMAT-E-AZAD HIND
(PROVISIONAL GOVERNMENT OF AZAD HIND)

Tel. Nos. 5021, 5022, 5023.

SYONAN,

Ref:

Date, 16th August 1945

ORDER.

During my absence from Syonan, Major General M. Z. Kiani will represent the Provisional Government of Azad Hind.

Subhas Chandra Bose

HEAD OF THE STATE,

PROVISIONAL GOVERNMENT OF AZAD HIND.

সুভাষচন্দ্রের শেষ হুকুমনামা



সুভাষচন্দ্রের তৈলচিত্রের সামনে শোক বিহ্বলা ইন্দিরা গান্ধী

ঠিক সময়টা কেউ বলতে পারল না। সবাই বলল, বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে। উত্তরায়ণ অনুগামী মাঘের সূর্য তখন মধ্য গগন পরিক্রমা করে একটুখানি পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সবেমাত্র। তখনকার দিনের কলকাতার নামকরা উকিল জানকীনাথ বসু অন্যদিনকার মতো সেদিনও ব্যস্ত ছিলেন কটকের আদালতের কাজে। কাজের মাঝেই শুনলেন, তার ষষ্ঠ পুত্রের জন্মের কথা।

শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি চলে এলেন জানকীনাথ। নবজাতকের জন্ম সময়টার কথা সবাইকে শুধালেন। সকলেই সেই এক কথা বলল, বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে। কিন্তু নবজাতকের ঠিকুজি বা কোষ্ঠি তৈরি করতে হলে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড সমন্বিত সঠিক জন্ম সময় দরকার। তা কেউ বলতে না পারায় হতাশ হয়ে ডায়েরিতে শুধু একটা কথা লিখে রাখলেন জানকীনাথ, আজ দুপুরে আমার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো।

যাই হোক পুত্রের নাম রাখলেন সুভাষচন্দ্র।

পরে যেখানে ওঁর অন্যান্য সব সন্তানের জন্মক্ষণ লেখা ছিল, সেখানে লিখে রাখলেন জানকীনাথ, ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি কটকের বাড়িতে সুভাষের জন্ম হয়। বেলা বারোটার কয়েক মিনিট পরে।

বিরাট বড় বাড়ি। কটকের উড়িয়া বাজারের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে বোসেদের এই বাড়িটা শুধু আয়তনেই বড় নয়; লোকজনের সংখ্যাও অনেক বেশী তার মধ্যে। আত্মীয় স্বজন ও ঝি চাকর ছাড়া পরিচিত অপরিচিত অতিথি অভ্যাগত ও আশ্রিতদের ভিড় লেগেই আছে। কোন বাঙালী ভদ্রলোক শহরের হোটেলে জায়গা না পেলেই উঠতেন বোসেদের বাড়িতে।

শুধু লোকজন নয়, গরু ঘোড়া ছাগল হরিণ ময়ূর বেজী প্রভৃতি পশু-

পাখিরও অভাব ছিল না সে বাড়িতে। কিন্তু বাড়িতে এত লোকজন ও পশুপাখি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হত শিশু সুভাষের। লোকজনের ভিড়ের মাঝেই একা-একা বোধ করতেন সব সময়। বাবা মাকে আরও নিবিড় করে কাছে পেতে চাইতেন।

কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। বাবা সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন। অসংখ্য কাজ তাঁর হাতে। সে সব কাজের মানে বুঝতেন না সুভাষ। তবু দেখতেন সারাদিনের মধ্যে একটিবারও বেশ কিছুক্ষণের জন্য বাড়িতে থাকছেন না বাবা। এক কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই বেরিয়ে যাচ্ছেন আর এক কাজে। সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসেকিউটার জানকীনাথ ওকালতির কাজ নিয়েই থাকতেন না শুধু, তিনি ছিলেন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবামূলক সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে। তার উপর তিনি ছিলেন বাংলা দেশের বিধানসভার সদস্য ও কটক পৌর প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান।

দেখতে বড় সুন্দর ছিলেন সুভাষ। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আকৃষ্ট হত সকলে। পুষ্টল গোলগাল মুখ। টানা-টানা চোখ। বাঁশির মত নাক। বাঁদিক ঘেঁষা সিঁথির দুপাশে বিন্যস্ত এক মাথা কালো চুল। ছোট ছেলেরা সাধারণতঃ খেলাধুলা নিয়েই থাকে। কিন্তু খেলাধূলার প্রতি কোন ঝোঁক ছিল না সুভাষের। দেখলেই মনে হত, কী যেন ভাবিছে সুভাষ। ভাসা-ভাসা চোখের আরও উদাস দৃষ্টি ছড়ানো রয়েছে সামনে। তবু কিছুই সে দেখছে না। শুধু ভাবছে আর ভাবছে। সে ভাবনার যেন শেষ নেই, সীমা নেই। স্বচ্ছ সুন্দর দৃষ্টিটা সামনে ছড়ানো থাকলেও শুধু এক সুদূরগন্ধী ব্যাপ্তিই ছিল না তার মধ্যে, সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল এক অন্তর্ভেদী গভীরতা।

দেখে একবার মনে হত কী যেন খুঁজছে সুভাষ। না পেয়ে দূরে যেতে চাইছে। আবার মনে হত সঙ্গে সঙ্গে কাছে যা কিছু আছে তার গভীরেও ঢুকতে চাইছে।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ব্যাপ্টিস্ট মিশন পরিচালিত প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে ভর্তি হল সুভাষ। স্কুলটা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল বলে পরিচিত হলেও সেখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল শুধু ইংরিজি। ছোট থেকে ছেলেরা ভাল ইংরিজি শিখে বড় দরের সরকারী চাকরি পাবে এই ভেবে সেকালের উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজাত বাড়ির লোকেরা ছেলেদের সাহেবী স্কুলে ভর্তি করত।

কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের বেশ নাম আছে। এর পর সেই স্কুলে ভর্তি হলেন সুভাষ এগার বছর বয়সে। ক্লাসের ছেলেরা অবাক হয়ে গেল যেন সকলে। এমন লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে কেউ যেন কখনও দেখেনি। খেলাধূলো করতে চায় না। কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। বেশী কথাও বলে না। শুধু একলা বসে আপন মনে কী সব ভাবে।

তবে পড়াশুনো খুব যে বেশী করে তা নয়। ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। কারণ ছোটবেলা থেকেই দুটি চোখ খারাপ হয়ে গেছে। সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বারণ করেছে ডাক্তার। সারাদিনের মধ্যে সকালে মাত্র আড়াই ঘণ্টা পড়া। কিন্তু কী আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সব পড়া সহজ ভাবেই তৈরি হয়ে যায়।

রোজ সকালে আড়াই ঘণ্টা মন দিয়ে পড়ার পর ভিখিরীদের ভিক্ষে দেয় সুভাষ। নিজের হাতে ভিক্ষে না দিলে তৃপ্তি হয় না মনে। একদিন দিতে না পারলে সারাদিন মনটা কেমন কেমন করে। একটা অস্বস্তির কাঁটা খোঁচা দিতে থাকে মনের তলায়। ভিক্ষে দেওয়ার পর চান খাওয়া সেরে স্কুল যাওয়া। স্কুল থেকে এসে কিছু খেয়ে বেড়াতে যাওয়া। কিন্তু সঙ্গী সাথী বেশী হলে চলবে না। মাত্র দুজন কি একজন। তাও আবার শহরের ভিতর কোনখানে নয়, শহরের সমস্ত ভিড় ও জনকোলাহল ছাড়িয়ে যেতে হয় নদীর ধারে অথবা শ্মশান ঘাটে।

ক্লাসের সব ছেলেই ভালবাসে সুভাষকে। সুভাষ সবার প্রিয়।

তবু তাদের মধ্য থেকে মাত্র দুজনকে বেছে নিলেন তিনি। একজন হলেন চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী আর একজন জগন্নাথ চৌধুরী। সহপাঠি বৃন্দাবন পালিতও বিশেষ খোঁজখবর রাখতেন সুভাষের। বৃন্দাবনের মতে জগন্নাথই ছিলেন বেশী অন্তরঙ্গ সুভাষের।

জগন্নাথের সঙ্গে রোজ বিকালে নদীর ধার দিয়ে চলে যেতেন সুভাষ। সেখানে মাঝে মাঝে ধ্যানে বসে যেতেন। ওই ধ্যানের বাতিকটা গড়ে উঠেছিল স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে। একবার মাত্র বিবেকানন্দের জীবনী পড়ে সব বলে দিতে পারতেন সুভাষ। তাঁর স্মৃতিশক্তির কোন তুলনা ছিল না। মাত্র এক নম্বর কম পাওয়ার জন্য ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় প্রথম হতে পারেননি।

নিজের চোখে সব কিছু দেখে ও এক সঙ্গে কাজ করে আশ্চর্য হয়ে যেতেন বৃন্দাবন পালিত। একটা ছেলে সব দিকে ভাল হয়ে ওঠে কি করে! সুভাষ শুধু পড়াশুনোতেই ভাল নয়, তার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিই শুধু যে অদ্ভুত তা নয়। তার সংগঠন প্রতিভাও ছিল অসাধারণ।

তখন ১৯১১ সাল। সুভাষের বয়স মাত্র চোদ্দ। সেবার ভয়ংকর মহামারী দেখা গেল কটক শহরে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্লাসের ছেলেদের নিয়ে এক সমাজসেবী দল গড়ে তুললেন সুভাষ। নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে দলের ছেলেদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কলেরা রোগীদের সেবা করে বেড়াতে লাগলেন। আর্ত মানুষের সেবা করে আনন্দ পেতেন সুভাষ। অবশ্য এ সেবার প্রেরণা পান তিনি তাঁর মার কাছে।

একবার কটকের র‍্যাভেনশ কলেজের মেসে মঙ্গল মাঝি নামে একটি সাঁওতাল ছেলে নিওমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। ছাত্রাবাসের অন্যান্য ছেলেরা অবহেলা করতে থাকে তাকে। সেবার অভাবে ছেলেটির প্রাণান্ত হবার উপক্রম। কথাটা কিভাবে সুভাষের মার কানে গেল একদিন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে একখানি লালপাড় শাড়ী

পড়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তথাকথিত নীচ জাত বলে সেবার অভাবে মারা যাবে একটি ছেলে, এ কখনই হতে পারে না।

মা গিয়ে নিজের হাতে পরম যত্নের সঙ্গে সেবা করতে লাগলেন ছেলেটির। তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে মাথাটি কোলের উপর নিলেন তুলে। তারপর হাত বোলাতে লাগলেন মাথায়। ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল মেসের ছেলেরা। লজ্জিত হলো নিজেদের হৃদয়হীন ব্যবহারের জন্য। এই সেবার মাধ্যমে তাদের চরম শিক্ষা দিচ্ছেন যেন সুভাষের মা। ঘরের বাইরে তখন ছেলেদের ভিড় জমে উঠেছে। এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন সুভাষ। সেবার সব ভার নিজের হাতে নিয়ে মাকে বললেন, তুমি যাও মা, এরকম ভুল আমাদের আর কখনও হবে না।

ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে সুভাষ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী দলনেতা। দৃঢ়সংবদ্ধ এক ভাবগাম্ভীর্য, কথা বলার সুন্দর হৃদয়স্পর্শী ভংগিমা, এক অটল শৃংখলাবোধ—সব মিলিয়ে একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল কিশোর সুভাষের মধ্যে। সুভাষকে সবাই ভালবাসত শ্রদ্ধা করত। তাঁকে শ্রদ্ধা করার আর একটা কারণ ছিল তাঁর ইংরিজি জ্ঞান।

মিশনারী স্কুলের পড়া শেষ করে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন যখন সুভাষ তখন দেখা গেল ক্লাসের সব ছেলের থেকে তিনি অনেকখানি এগিয়ে আছেন ইংরিজিতে। তাই দেখে ছেলেরা শ্রদ্ধার চোখে দেখত সুভাষকে।

শৃংখলা ছাড়া কোন কাজ হয় না। দলবদ্ধ হয়ে কোন কাজ করতে সবচেয়ে আগে চাই শৃংখলা। সুভাষের দলের ছেলেদের বয়স তখন মাত্র দশ থেকে বারোর মধ্যে। তবু সেই বয়সেই সৈনিক-সুলভ এক শৃংখলাবোধে রপ্ত করে তুললেন তাদের। তাই প্রায়ই তাদের মার্চ করাতেন। বলতেন, খেলাধূলোই কর, আর সমাজসেবাই কর, আগে ডিসিপ্লিন শেখ।

রোজ বিকালে ছুটির পর দলের সব ছেলেকে নিয়ে নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে যেতেন সুভাষ। কিন্তু এলোমেলোভাবে হৈ হুল্লোড় করতে করতে গেলে হবে না। সৈন্যদের মতো সকলকে মার্চ করতে করতে যেতে হবে। কেউ খালি পায়ে কেউ জুতো পড়ে তালে তালে মার্চ করতে করতে এগিয়ে যেত আর সকলের সামনে যেতেন তাদের দলপতি সুভাষ। নদীর ধারে গিয়েই তাদের ছুটি। যে যার ইচ্ছামতো ছোটাছুটি আর খেলাধূলোয় মেতে উঠত। সুভাষ কিন্তু তাদের সে মাতামাতিতে যোগ দিতেন না। নদীর ধারে একটি নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে একা একা বসে কী যেন আকাশ পাতাল ভাবতেন। কখনও নদীর জলের ঢেউএর দিকে তাকিয়ে থাকতেন এক দৃষ্টিতে, কখনও বা দূর আকাশের দিকে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী পড়তে ভাল লাগত সুভাষের। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়তেন যত্নের সঙ্গে। বাড়িতে আপন ঘরে বসে মাঝে মাঝে আপনা থেকেই ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন। কিন্তু বাড়িতে সব সময়ই লোকজনের ভিড়। সেখানে ধ্যান বা যোগ অভ্যাসের কোন সুযোগ নেই। তবু তারই মধ্যে সুযোগ করে নিতেন সুভাষ। সন্ধ্যে হয়ে গেলেও নিজের ঘরে আলো জ্বালতেন না। খাটের উপর অন্ধকারে বসে ধ্যান করতেন।

একদিন বিছানা পাততে এসে সুভাষকে এইভাবে দেখে বিস্ময়ে চীৎকার করে ওঠে বাড়ির ঝি। কথাটা বাবা মা শুনে রেগে যান। বাড়ির অনেকে ঠাট্টা করতে থাকে। কিন্তু বড় অদ্ভুত ছেলে ছিল সুভাষ। কারো কোন কথা শুনত না। ইচ্ছা যেখানে নিবিড় উপায় সেখানে হবেই। কোন কাজে একবার নামলে কেউ আটকাতে পারত না তাঁকে। বড় অনিবারণীয় আর অপ্রতিরোধ্য ছিল তাঁর গতি।

তাছাড়া কতই বা চোখে চোখে রাখবে বাড়ির লোক। ফাঁক পেলেই সুভাষ চলে যেতেন নদীর ধারের মোলায়েম নির্জনে অথবা

শ্মশান ঘাটে। শ্মশানে গিয়ে জীবনটাকে বড় অস্বস্তিকরভাবে ছোট বড় অনিত্য বলে মনে হত। তবু তাঁর মনে হত, এই অনিত্যতার মধ্যেই করতে হবে নিত্যতার সন্ধান। আর জীবনটা বড় অনিত্য বলেই হয়ত বড় বেদনাময়। পৃথিবীতে কোথাও সুখ নেই অথবা আসলে সুখ বলে হয়ত কোন জিনিসই নেই ; সবই মায়া ভ্রান্তি। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হত ঈশ্বরই হচ্ছেন একমাত্র নিত্য ও পরম সত্য ; তাঁকে পেলেই পাওয়া যাবে অক্ষয় অনন্ত শান্তি।

ধ্যান করতে করতে মনে মনে নিশ্চিত হয়ে উঠতেন সুভাষ, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন। যুগে যুগে বহু সাধক সাধনার দ্বারা তাঁকে লাভ করেছেন। তাঁকে লাভ করে পেয়েছেন অনন্ত শক্তি। পেয়েছেন পরম সত্যের সন্ধান।

তবে আবার আর একটা কথা মনে হত সুভাষের। শুধু নির্জনে বসে ধ্যান করলেই ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে না। ঈশ্বর শুধু নির্জনতার মধ্যে নেই, তিনি আছেন মানুষের মধ্যেও। আর্ত মানুষের সেবার মাধ্যমেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। সেটাও এক ধরনের যোগ। জীবপ্রেম ও জনসেবা যে ঈশ্বরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, বিবেকানন্দের লেখা পড়ে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল সুভাষের মধ্যে।

মাঝে মাঝে আবার আর একটা কথা মনে হত। নিজে থেকে আপন মনে ধ্যান করলেই ধ্যান হয় না। তার একটা পদ্ধতি আর প্রক্রিয়া আছে। সেটা শিখতে হবে উপযুক্ত গুরুর কাছে। মনে হত, এখনই বেরিয়ে পড়ি গুরুর সন্ধানে। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই। তাঁকে খুঁজে বার করে মনের সব গোপন কথা অকপটে বলি।

ধর্মচর্চার বিষয়ে সুভাষের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন সতীশচন্দ্র মিত্র। তাঁর শিশুফৌজের অন্যতম সদস্য। সতীশকে সঙ্গে করে দূরে কোন নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে শোনাতেন সুভাষ। একদিন সতীশচন্দ্র

হঠাৎ একটি প্রশ্ন করে বসলেন সুভাষকে, জগন্মাতা ও দেশমাতার মধ্যে কে বড় ?

সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি লাইন তুলে বললেন, জগন্মাতা ও দেশমাতার মধ্যে ত কোন পার্থক্য নেই।

মা কিন্তু ভাল চোখে দেখতেন না সুভাষের এই ধর্মপ্রবণতাটাকে। ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে মাঝে মাঝে চিন্তিত হয়ে উঠতেন তাঁরা। অনেক যুক্তি আলোচনা করে অবশেষে ঠিক করলেন ম্যাট্রিকুলেশান পাশটা হয়ে গেলেই কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে সুভাষকে। ভাবলেন, নতুন পরিবেশে নিশ্চয়ই মনের পরিবর্তন হবে তাঁর।

বাবা মা রাগ করলেও কোন উপায় ছিল না। কারণ সুভাষের এই ধর্মপ্রবণতাটা বাবার কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া। ধর্ম ও নীতির প্রতি একটা বাতিক রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল যেন সুভাষের। মানুষের প্রতি তাঁর মৈত্রী ও মমতা আর শৃংখলাবোধ এই ধর্ম ও। নীতিবোধেরই যেন অঙ্গস্বরূপ। তখন রাজনীতি মাথায় ঢোকেনি সুভাষের। দেশকে মা বলে ভাবতে শিখলেও দেশপ্রীতি তখনও কোন নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি তাঁর মনে। তবু যারা আর্ত যারা দুঃস্থ তাদের জন্য কিছু করতে হবে এই ধরনের একটা গঠনমূলক প্রবৃত্তি তাঁর উদাস মনের উদার দিগন্তটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত মাঝে মাঝে।

ছাত্রজীবন থেকেই ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের ভাব শিষ্য ছিলেন জানকীনাথ। কলকাতায় এ্যালবার্ট স্কুলে পড়বার সময়ই কেশব সেনের ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে যান। আকৃষ্ট হন তাঁর প্রতি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন জানকীনাথের সহপাঠী। রাজা রামমোহন ১৮২৪ সালে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজের সমস্ত দায়িত্বভার পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের উপর। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক

চিন্তাধারার জন্য ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর। দেশের মৃতপ্রায় স্থিতিশীল ধর্ম ও সংস্কৃতির মাঝে ব্রাহ্মরা নিয়ে এলেন নতুন প্রাণের জোয়ার। দেশের গোঁড়া পণ্ডিতরা পাশ্চাত্ত্য জগতের সব কিছুকেই ঘৃণার সঙ্গে বর্জন করতেন। ব্রাহ্মরা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যা কিছু ভাল তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কেশব সেন ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও উগ্রতম প্রবক্তা। কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া আর একজন মনীষীর প্রভাব ছিল জানকীনাথের জীবনে। তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত হয়েও তিনি ছিলেন পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রতি আশ্চর্যভাবে সহনশীল।

রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁদের প্রত্যেকেরই অসাধারণ অবদান থাকলেও দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বা স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনদিন কিছু ভাবেননি। কেশবচন্দ্র উল্টো বলতেন, ভারতে বৃটিশের আগমন ঈশ্বরের বিধান। ঈশ্বরচন্দ্রের মতো স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষও কোন দিক দিয়েই বিরোধিতা করেননি বৃটিশ সরকারের। রাজা রামমোহনের সমস্ত কর্মোদ্যোম ধর্ম সমন্বয়ে ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারেই ব্যয়িত হয়েছে। এঁদের কেউই সরকার বিরোধী ছিলেন না। দেশে এঁরা যে নবজাগরণ এনে-ছিলেন তা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই ছিল সীমাবদ্ধ; পরাধীন ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে তা প্রসারিত হয়নি।

জানকীনাথও সরকারবিরোধী ছিলেন না। ছিলেন না বলেই সরকারী ওকালতি ও পাবলিক প্রসেকিউটারের পদ গ্রহণ করেছিলেন। ছেলেমেয়েদের ইংরিজি স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। জানকীনাথের বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সরকারের শিক্ষাবিভাগের একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী। পরে এসব কথা ভেবে দুঃখিত হন সুভাষ।

তখন সুভাষের মনে কোন মাথা ব্যাথা ছিলনা দেশের রাজনৈতিক

অবস্থা সম্বন্ধে। ছিলনা বলেই ১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ যখন দিল্লী আসেন তখন সেই উপলক্ষে এক ইংরিজি রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সুভাষ। অবশ্য পুরস্কার নেবার সময় উপস্থিত হতে পারেননি ; কলকাতা যেতে হয়েছিল সপরিবারে।

সুভাষের মনে তখন একমাত্র চিন্তা কিভাবে একই সঙ্গে আত্মার উন্নতি আর সমগ্রভাবে মানবজাতির উন্নতির জন্য কিছু করা যায়। তখন দেশ বা জাতির কথা মনে আসেনি তাঁর। তখন ফাঁক পেলেই শুধু সমগ্রভাবে সব মানুষের দুঃখকষ্টের কথা ভাবতেন। কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মনের মধ্যে তখন দারুণ একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুভব করতেন সুভাষ। এক একবার ভাবতেন কোন সাধু সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যোগ বিদ্যা শিখে নিয়ে আত্মার উন্নতি আর মুক্তির জন্য সাধনা করবেন। কিন্তু আবার ভাবতেন নিজের মুক্তি—সেটা ত স্বার্থপরতার কথা। আর পাঁচজন মানুষের জন্য কিছু করতে হবে।

সুভাষের মনে হত, একটা শরাহত পাখি দুঃসহ যন্ত্রণায় যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে তাঁর বুকের ভিতর। কিন্তু শত চেষ্টাতেও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। মনে শান্তি পাচ্ছেন না কোনমতে। এমন সময় একদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। বেণীমাধববাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভক্ত হলেও আসলে তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। তিনি কেশব সেনের ঢঙে খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে ও ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে যান সুভাষ।

একদিন একখানি চিঠিতে সুভাষ তার মনের অবস্থা বেণীমাধববাবুকে জানালেন। বেণীমাধববাবু বললেন, প্রকৃতির কাছে যাও। একমাত্র প্রকৃতিই তোমাকে আত্মিক শান্তি দিতে পারবে। সূর্যাস্তের রং ঝরা অপরাহ্নের কোন নির্জন পাহাড় প্রান্তর বা নদীতীর বেছে নাও, তারপর সেখানে ধ্যানে বসে যাও। নিঃশেষে বিলিয়ে দাও নিজেকে প্রকৃতির কাছে। দেখবে প্রকৃতিই তোমার সব প্রশ্নের জবাব

দিচ্ছে। প্রকৃতিই তোমার চিত্তের সব অশান্তির উপর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। আমিও এইভাবে শান্তি পেয়েছি মনে।

এইভাবে সুভাষও প্রকৃতিপূজা করলেন বেশ কিছুদিন। মনে শান্তিও পেলেন কিছুটা। কিন্তু সব অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হলো না। সব প্রশ্নের জবাব মিলল না। অথচ সুভাষ যখন ছোট ছিলেন তখন কোন প্রশ্ন জাগত না তাঁর মনে। বাড়ির ভিতরের ও বাইরের পরিবেশকে সহজভাবে মেনে নিয়েছিলেন। বাবা মাকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। পিতৃভক্তি সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করতেন। বাবা মার যে কোন আদেশ অপ্রতিবাদে পালন করতেন, স্কুল থেকে এসে বাগানে হয় মালীর সঙ্গে কাজ করতেন অথবা বেড়াতে যেতেন সম মনোভাবাপন্ন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে।

কিন্তু একটু বড় হতেই এই সরল মোলায়েম জীবনযাত্রা ভাল লাগত না। তাঁর মনে হলো বাড়ি ও স্কুলের বাইরেও একটা বিরাট জগৎ আছে। বাবা মার প্রতি কর্তব্য ছাড়াও একটা বৃহত্তর কর্তব্য আছে। আত্মসুখ ছাড়াও একটা মহত্তর সুখ আছে। এসব কথা তাঁর মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিল অনেকগুলো। একান্ত নির্জনে নিজেকে বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন সুভাষ, মানুষের জন্মের সার্থকতা কি, জীবনের আদর্শ কি ?

এমন সময় সহসা একদিন অন্ধকারের মাঝে আলো পেয়ে গেলেন সুভাষ। একদিন তাঁদের কটকের বাড়ির পাশের এক বাড়িতে বাইরে থেকে আসা এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর কাছে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা কতকগুলি বই রয়েছে। তার মধ্যে একখানি হাতে তুলে নিয়ে পড়তে পড়তে একটা চমৎকার আস্বাদ পেলেন সুভাষ। যতই পড়তে থাকেন এক পরম আনন্দের রোমাঞ্চ জাগতে থাকে তাঁর সারা দেহে। এ আনন্দ জীবনে কখনও পাননি এর আগে। কোন পার্থিব বস্তুপ্রাপ্তির আনন্দের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না এ আনন্দের।

বইগুলি বাড়িতে নিয়ে এসে বারবার পড়তে লাগলেন গভীর মনযোগের সঙ্গে। অন্ধকারে এতদিন যা হাতড়িয়ে বেড়িয়েছিলেন আজ তা অপ্রত্যাশিতভাবেই পেয়ে গেলেন হঠাৎ। শিক্ষাগুরু বেণীমাধব একদিন প্রকৃতিপূজার মধ্য দিয়ে তাঁর মধ্যে জাগিয়েছিলেন শৃংখলাবোধ ও নীতিবোধ। আজ স্বামীজীর বাণী দীক্ষিত করল তাঁকে এক মহান আদর্শে। 'আত্মনো মোক্ষার্থম জগদ্ধিতায়'—জগতের হিতসাধন করো তোমার আত্মার মুক্তির জন্য। সুভাষের মনে হলো, একথা যেন কোন প্রাচীন মুনিঋষির কথা নয়, একথা তাঁর প্রাণের কথা। এ আদর্শ সবচেয়ে মহান।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়েই দেশকে প্রথম ভালবাসতে শেখেন সুভাষ। দেশকে ভালবেসে ও দেশের মানুষদের জন্য কিছু করার মধ্য দিয়েই আত্মার উন্নতি সাধন করতে হবে। ত্যাগের মধ্য দিয়ে পরমার্থ লাভ করতে হবে। সুভাষের বয়স তখন মাত্র পনের। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধে এমন তীব্রভাবে মেতে ওঠার বয়স তখন হয়নি। তবু কেমন করে তা সম্ভব হলো তা নিজেই বুঝতে পারলেন না সুভাষ। শুধু বুঝলেন তাঁর অন্তরের ছোট্ট অন্ধকার কুঠরিটাতে অফুরন্ত আলোভরা অনন্ত আকাশখানা এসে ঢুকে পড়ল। সে আলোর তীব্রতায় চোখ ঝলসে যেতে লাগল তাঁর। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে উঠল অন্তরাত্মা।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সিস্টার নিবেদিতার একটি কথা বিশেষভাবে মনে দাগ কাটে সুভাষের। নিবেদিতা একজায়গায় বলেন, দেশমাতাই ছিলেন তাঁর অন্তরের একমাত্র ভক্তির পাত্র। সারা দেশের মাঝে কোনখানে এমন কোন কান্নার ধ্বনি ছিল না যা তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠত।

এইভাবে তখন থেকে বিবেকানন্দই হয়ে উঠলেন তাঁর কাছে একমাত্র আদর্শ পুরুষ। বিবেকানন্দের দেশপ্রেম ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধই তাঁর কাছে হয়ে উঠল একমাত্র জীবনাদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হতে লাগল সুভাষের, বাড়ির এই পরিবেশে থেকে

লক্ষ্মী ছেলের মত বাবা মার অনুশাসন শুনে সে আদর্শ পূরণ করা যায় না। মাঝে মাঝে একান্ত নির্জনে বসে প্রার্থনা করতেন সুভাষ, হে জগন্মাতা, মা বাবা নয়, একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়স্থল।

এই সময় সম-মনোভাবাপন্ন ছেলেদের নিয়ে দলটা বাড়ালেন সুভাষ। স্কুল ছুটির পর অনেকক্ষণ ধরে ফাঁকা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করতেন ও ভক্তিমূলক গান গাইতেন। বাবা মা প্রায়ই অনুযোগ করতেন, তুমি বাইরে যার তার সঙ্গে মিশছ। এতে পড়াশুনো গোল্লায় যাবে।

১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক প্রবল রাজনৈতিক বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে সমগ্র বাংলা দেশ। কার্জন প্রশাসনিক কারণে বাংলাকে ভাঙ্গতে চাইলেও বাঙালীদের বুঝতে বাকি রইল না, কার্জনের আসল উদ্দেশ্য হলো নবজাগ্রত বাঙালী জাতির শক্তিকে খর্ব করা। ভারতের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার আগেই প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে বাঙালীরা। দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষায় বাঙালীরাই অগ্রণী হয়ে উঠতে থাকে সবচেয়ে বেশী। রাজনৈতিক চেতনা আর বিদ্রোহের সুর তাদের মধ্যেই বেশী। কিন্তু ১৯০৫ সালের আগে সে সুপ্রকট হয়ে ওঠেনি, সে সুর স্পষ্টতঃ শোনা যায়নি।

১৮৫৭ সালে সংগঠিত সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে সবাই স্বীকার করে নিলেও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতের রাজনৈতিক নেতারা ও ধরনের বিদ্রোহ আর চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন ইওরোপীয় কায়দায় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে। আরও চেয়েছিলেন সেই স্বাধীনতা হবে ইওরোপের উন্নত দেশগুলির সংসদীয় গণতন্ত্রের ছাঁচে-ঢালা স্বাধীনতা। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

গোড়া থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সুরটা ছিল নরম। সুচতুর

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার সহজেই তা ধরতে পেরেছিল। তারাও তাই মাঝে মাঝে কিছু কিছু স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক সুযোগ সুবিধা দিয়ে খুশি রাখতে চেয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এক বছর পরই উত্তর প্রদেশেও বাংলার মত আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট পাশ করে গভর্ণর জেনারেলের অধীনস্থ পরিষদের সভ্য সংখ্যা বারো থেকে ষোল করা হয়। অবশ্য ভোটাধিকার দেয়া হয়নি। কিন্তু সে যাই হোক, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের এই স্বার্থকেন্দ্রিক আপোষমূলক মনোভাবে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হতে পারেনি বাংলা দেশ। কারণ বিদেশীদের আক্রমণে বাংলা দেশের ক্ষতিই হয় অন্যান্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী। প্রথমে পর্তুগীজ, তারপর ওলন্দাজ, পরে ফরাসী ও ইংরেজ প্রভৃতি জাতিদের দ্বারা বারবার উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলা দেশ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাই এই বাংলা দেশেরই বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৯০৫ সালে তাই গোটা বাংলা দেশ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিকে সংহত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনে।

সেই আন্দোলনের ঢেউ সুদূর কটকে গিয়েও পড়ল ছড়িয়ে। রাজনীতি কিন্তু তখনও মাথায় ঢোকেনি সুভাষের। মাঝে মাঝে শুধু স্বদেশী আন্দোলনের মিছিল দেখতে পেতেন বাড়ির ভিতর থেকে। মাঝে মাঝে তর্ক হত ভাই বোনদের মধ্যে। একবার ভাইদের সঙ্গে মিলে মিশে তখনকার দিনের কয়েকজন বিপ্লবীর ছবি টাঙ্গিয়ে রাখেন ঘরের দেয়ালে। একদিন পুলিশ বাড়ি সার্চ করতে এসে সেই ছবিগুলি সব নিয়ে যায়।

রাজনীতির প্রতি প্রথম আগ্রহ জাগে সুভাষের ১৯১২ সালে। এই সময় একদল ছাত্র কলকাতা হতে কটকে এসে ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এদের মধ্যে একজনের আবেগময় বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান সুভাষ। ছোট থেকেই বক্তৃতা শুনতে ভাল-

বাসতেন। ওই ছাত্র দলটির সঙ্গে নিজে গিয়ে আলাপ করে তাদের কলকাতার ঠিকানা নিলেন।

সুভাষ দেখলেন, ওরা সব ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ। ওরা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে ভক্তি করে আবার দেশের স্বাধীনতা চায়। বিবেকানন্দ ১৯০২ সালে পরলোকে গমন করলেও বাংলা দেশের ছাত্র সমাজে তখনও উত্তরোত্তর ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর প্রভাব। ছাত্রদলটি বিবেকানন্দের ভক্ত বলে তাদের সবাইকে খুব ভাল লেগে গেল সুভাষের। স্বামী বিবেকানন্দের যে দিকটি সবচেয়ে আকৃষ্ট করে ছাত্রসমাজকে তা হলো ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়। ধর্মের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বাস্তব কার্যকারিতাকে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন বিবেকানন্দ। সব ধর্মকে সমস্ত রকমের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের এক স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজা রামমোহন। এজন্য সনাতন হিন্দু ধর্ম থেকে বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র একটি ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাঁকে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই বিবেকানন্দ সমস্ত গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে এক উদার যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন হিন্দুধর্মকে। তাছাড়া ধর্মবোধের সঙ্গে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রীতিকে যুক্ত করে দেখার ফলে ধর্মসাধনার ক্ষেত্র হতে মোক্ষলাভের বাসনা ও সব রকম স্বার্থপরতার দূরীকরণ সহজ হয়ে ওঠে তাঁর পক্ষে। বিবেকানন্দের আর একটা বড় কাজ হলো, হিন্দুধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মনোভাবের আমূল পরিবর্তন সাধন করা।

এই সময় বিবেকানন্দের লেখা পড়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব বেড়ে যায় সুভাষের মনের মধ্যে। তাঁর মনে হয় জীবনে বড় কিছু করতে হলে অনেক বড় ত্যাগ করতে হয়। আরও মনে হয়, আপন আত্মার মুক্তির জন্য যে সব সাধু সাধনা করে তারা যেমন স্বার্থপর

তেমনি যে সব ছেলে বাপ মার নির্দেশমত চলে ও পড়াশুনো করে ভবিষ্যৎ তৈরি করে তারাও তেমনি স্বার্থপর।

এই সব চিন্তার ফলে কতকগুলো বিষয়ে প্রায়ই মতভেদ হতে লাগল সুভাষের বাবা মার সঙ্গে। সুভাষ যখন তখন তাঁর বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে এখানে সেখানে বেড়াতে যেতেন। বাপ মা নিষেধ করলেন। বললেন, এরকম আর করো না ; নিজেকে সংশোধন করো।

এছাড়া রোজ সন্ধ্যের সময় বেড়িয়ে বাড়ি ফিরতেও দেরি হয়। বাবা মা বকাবকি করতেন। কিন্তু বাবা মার কথা শুনতেন না সুভাষ। চুপ করে থাকতেন। মুখের সামনে কোন প্রতিবাদ করতেন না ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠত তাঁর মন। তাঁর কেবলি মনে হত, এ বিদ্রোহ প্রয়োজন আছে জীবনে। বিদ্রোহ না থাকলে জীবনে বড় হতে পারে না মানুষ। বর্তমান বাস্তব অবস্থাকে মানুষ যদি সহজভাবে মেনে নেয় তাহলে বড় হবার জন্য কোন চেষ্টাই করবে না।

বাবা মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন সুভাষের ভবিষ্যৎ ভেবে। ভাবলেন, ছেলেটার মাথায় ধর্মের ভূত ঢুকেছে, পড়াশুনো সব মাটি হয়ে গেল।

বাবা মা যাই ভাবুন, পড়াশুনো সম্বন্ধে নিজের কর্তব্যে একেবারে অবহেলা করেনি বলেই ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন সুভাষ। মাত্র এক নম্বরের জন্য প্রথম হতে পারলেন না। খুশি হলেন বাবা মা। শুধু খুশি হলেন না, আশ্চর্য হলেন, এত কম পড়ে এত ভাল ফল কি করে করল সুভাষ। যাই হোক, তাঁরা ঠিক করে ফেললেন, এবার আর এখানে রাখা ঠিক হবে না সুভাষকে। তাই পরীক্ষার ফল বার হবার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষকে নিয়ে কলকাতা রওনা হলেন।

সেদিন রাত্রিতে কলকাতাগামী একটি ট্রেনের কামরায় শুয়ে শুয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই ভাবলেন সুভাষ। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে লাগল মনটা। ঘুম হলো না।

॥ দুই ॥

শুধু সুভাষ নয়, তাঁর মত সব ছেলেই শৈশবে ও বাল্যে বাড়ির ভিতরকার ও বাইরেকার পরিবেশকে সহজভাবে মেনে নেয়; তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে। কিন্তু যতই বড় হতে থাকে সে, ততই অনেক প্রশ্ন জাগে তার মনে। এ প্রশ্ন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নির্বিশেষ দার্শনিক প্রশ্ন নয়; এ প্রশ্ন আপনা থেকে বেরিয়ে আসে অস্তিত্বের গভীর থেকে। তখন মনে হয়, আমি কে, কোথা হতে এসেছি, আমার জীবনের লক্ষ্য কি?

এই সব প্রশ্ন সুভাষের মনেও জাগল। একান্ত নির্জনে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন বারবার। মানুষ কি শুধু নিজের জন্যই বাঁচবে? মানব জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা কিসে?

এসব প্রশ্নের উত্তর না পেলেও কলেজ জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠল সুভাষের কাছে। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে জীবনের একটা অর্থ উদ্দেশ্য ও আদর্শ আছে; আর সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দীর্ঘ দিনের সাধনায় দেহমনকে গড়ে তুলতে হয়।

এই সঙ্গে আর একটা জিনিস বুঝতে পারলেন, শুধু যোগসাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি করা যায় না। সমাজসেবাই শ্রেষ্ঠ যোগ। সমাজসেবার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনকে প্রসারিত করে বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত না করলে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক কোন উন্নতিই সম্ভব নয়।

এমন সময় কটকে দেখা কলকাতার সেই ছাত্রদলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে ভালভাবে আলাপ করলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি দেখলেন এই দলের ছেলেরা সবাই পড়াশুনো করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে। রাজনীতির ব্যাপারে তারা নরমপন্থী;

সন্ত্রাসবাদীদের মত উগ্র নয়। দেশকে তারা ভালবাসে, পরাধীনতা হতে মুক্ত করতে চায় দেশকে কিন্তু হিংসাত্মক উপায়ে নয়। তাদের দেশপ্রীতি ছিল ধর্মবোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে।

কলকাতার এই দলটির সঙ্গে সুভাষের প্রথম পরিচয় হয় বছর খানেক আগে হেমন্তকুমার সরকার নামে একটি ছেলের মাধ্যমে। ছেলেটি তখন কলকাতা থেকে কটক বেড়াতে গিয়েছিল। হেডমাষ্টার-মশায় বেণীমাধব দাস পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। হেমন্ত বলেছিল, আধ্যাত্মিক উন্নতি আর গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে জাতির সেবাই আমাদের একমাত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্য।

এ দলের দলপতি ছিলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ডাক্তারি পড়া একটি ছেলে। হেমন্ত কলকাতায় গিয়ে তাদের দলপতিকে দিয়ে একখানা চিঠি দেওয়ান সুভাষকে। বাংলার রাজধানীর কোন এক রাজনৈতিক দলের নেতার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে খুব খুশি হন সুভাষ। তবু ধর্মের ভূত নামতে চায় না ঘাড় থেকে। ঈশ্বর আত্মা ধর্ম প্রভৃতির চিন্তা ছাড়তে চায় না মনকে। যোগসাধনা তখনও নিয়মিতই করে যেতে থাকেন।

কিন্তু কলকাতায় কলেজে ঢোকার পর ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি আপনা থেকেই চলে গেল সুভাষের জীবন থেকে। সুভাষের বয়স তখন মাত্র ষোল। কিন্তু মাত্র এই ষোল বছর বয়সে কলকাতার মত বিরাট শহরের সবচেয়ে সেরা কলেজে তিনি ভর্তি হয়েছেন এটা ভেবে গর্ব অনুভব করতেন সুভাষ। কলকাতার বিশালতা ও বৈচিত্র্য প্রথমে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিলেও পরে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিলেন তার সঙ্গে।

কলকাতায় এসে হেমন্ত ও সুরেশ ব্যানার্জির সেই দলটাকে খুঁজে বার করলেন সুভাষ। তখন কলকাতায় সন্ত্রাসবাদীদের কাজকর্ম চলেছে পুরো দমে। তখন যে কোন যুবক বা ছাত্রসংগঠনের পিছনেই সি

তখন কলকাতার ছাত্রসমাজে চার রকমের প্রবণতা অনুসারে গড়ে উঠেছিল চারটি দল। এক শ্রেণীর ছেলে কেবল রাজা জমিদারের ধনী ছেলেদের কাছে কাছে থাকত আর তাদের পোষাক নকল করত। আর একদল ছিল বইএর পোকা; স্বাস্থ্য ও সমাজের কথা না ভেবে কেবল বই নিয়ে থাকত। আর একদল ছিল বড়ই ধর্মপ্রবণ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভক্ত। ছাত্রদের মধ্যে একটি গুপ্ত বিপ্লবী দলও ছিল। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রাবাসে ছিল তাদের আড্ডা। প্রেসিডেন্সী কলেজ সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হলেও লোকে বলত অনেক বিপ্লবী ছাত্র পড়ত এই কলেজে। এই কলেজের ইডেন হিন্দু হোস্টেল ছিল বিপ্লবীদের মিলনক্ষেত্র। সেইজন্য প্রায়ই পুলিশ গিয়ে তল্লাসী চালাত সেখানে। আপন আপন দলে ছেলে ভর্তি নিয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়াও চলত বিভিন্ন দলের মধ্যে। বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক দলগুলির সঙ্গে সুভাষদের দলের প্রায়ই বিরোধ বাধত। সুভাষদের দল অহিংসপন্থী হওয়ার জন্য তাঁদের নেতাকে হত্যার চেষ্টা করে সন্ত্রাসবাদীরা।

কটকে থাকার সময় ধর্ম ও যোগসাধনার একাধিপত্য ছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনে। কলকাতায় আসার পর থেকে সে জীবনে এল সমাজসেবা ও জাতীয় পুনর্গঠনের প্রবণতা। ধর্মের পাশে রাজনীতির চিন্তাও আসন পেতে বসল মনের মাঝে। কলকাতায় এসে ইতিহাস, দর্শন, জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে নতুন নতুন বই পড়ার আগ্রহ জাগল। বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব পড়ল তাঁর জীবনে।

বিবেকানন্দ ছিলেন শুধুমাত্র একজন ধর্মনেতা। কিন্তু প্রথমে রাজনীতি ও পরে যোগসাধনার মাধ্যমে ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক নতুন পথের সন্ধান দেন অরবিন্দ। কলকাতায় এসে সুভাষ দেখলেন, ১৯০৯ সালে অরবিন্দ রাজনীতি ছেড়ে যোগসাধনার জন্য পণ্ডিচেরী চলে গেলেও বাংলা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব তখনও অপরিসীম ও অতুলনীয়। অনেকে বিশ্বাস করত, যোগসাধনায়

সিদ্ধিলাভ করে অলৌকিক শক্তি বলে ভারতকে স্বাধীন করবেন শ্রীঅরবিন্দ।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শুরু থেকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায়। নরমপন্থী বা দক্ষিণপন্থী নেতারা বৃটিশের কাছ থেকে শুধু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন দাবী করেই ক্ষান্ত থাকতেন। কিন্তু চরমপন্থীরা চাইতেন পূর্ণ স্বাধীনতা। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন এই চরম পন্থীদের নেতা এবং অরবিন্দ ছিলেন তিলকের শিষ্য। বাংলাদেশে সাধারণতঃ চরমপন্থীদের প্রভাব বেশী থাকায় বাঙ্গালীদের কাছে অরবিন্দ ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তার উপরে তিনি বিপ্লবী বারীন ঘোষের ভাই বলে বিপ্লবী যুবকরাও ভক্তি করত তাঁকে।

কিভাবে তা কেউ না জানলেও শংকরাচার্যের মায়াবাদের একটা রীতিমত প্রভাব শিকড় গেড়ে উঠেছিল সুভাষের কিশোর জীবনে। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্য ও পরমার্থ; সুতরাং সাধনার দ্বারা সেই পরমার্থলাভই হবে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এই ধারণা কেমন যেন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে। বেণীমাধব দাসের প্রকৃতি পূজা এ ধারণার শিকড় তুলে ফেলতে পারেনি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণীপাঠও সে মায়াবাদের কুয়াশাকে দূঢ় করতে পারেনি।

কিন্তু কলকাতায় এসে সেই মায়াবাদে প্রথম সংশয় জাগল। কলকাতার পথে-ঘাটে যখন নিজের চোখে দেখতে লাগলেন সুভাষ, ইংরেজ সাহেবরা ভারতীয়দের নেটিভ বলে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধোর করছে, ট্রেনে, ট্রামে, বাসে অপমানিত করছে, যখন দেখলেন কত ক্ষুধার্ত ভিখিরি মুমুর্ষু অবস্থায় পথেই জীবন কাটাচ্ছে তখন কিছুতেই মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না এই সব ঘটনাকে। বাড়ি থেকে কলেজ যাবার সময় পথে রোজ কয়েকজন ভিখিরিকে গাড়িভাড়ার পয়সা থেকে সাহায্য করতেন সুভাষ। তাদের জন্য নিজে কষ্ট করেও আনন্দ পেতেন মনে।

অরবিন্দের বাণী আর একটা ধাক্কা দিল সুভাষের সেই মায়াবাদটাকে। এই ব্যাপারে বিবেকানন্দের সঙ্গে অরবিন্দের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কাছে। ভারতীয় ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যুগে যুগে বিভিন্ন রকমের সাধনরীতি দেখা দেয়। বৈদান্তিকরা যেমন জ্ঞানযোগের উপর জোর দিতেন বৈষ্ণবরা তেমনি জোর দিতেন ভক্তিযোগের উপর। বিবেকানন্দ এসে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম তিনটি যোগের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এই তিনটি যোগের সমন্বয়ের কথা বলেন একমাত্র শ্রীঅরবিন্দ। তিনিই প্রথম দেখান, বিভিন্ন রকমের যোগ-অভ্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে জৈবচেতনার সব স্তর অতিক্রম করে এক অতিমানস চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারে। আর সেখানেই সে পেতে পারে তার জীবনের পরম সত্যকে।

সে যাই হোক, অরবিন্দের একটি বাণী সুভাষের খুব মনে লাগে। একটি বক্তৃতায় অরবিন্দ একবার বলেছিলেন, আমি দেখতে চাই তোমাদের কেউ কেউ বড় হও; নিজেদের জন্য বড় হওয়া নয়, ভারতবর্ষকে বড় করার জন্য, যাতে সে পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। তোমাদের মধ্যে যারা দরিদ্র ও অখ্যাত—আমি দেখতে চাই যে সেই দারিদ্র্য ও অখ্যাতি তোমরা মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করেছ। মাতৃভূমির গৌরব তোমাদের কর্মের লক্ষ্য হোক, তোমাদের দুঃখবরণের ভিতর দিয়ে মাতৃভূমি পরমানন্দ লাভ করুক। //

এটি ছিল অরবিন্দের কোন এক রাজনৈতিক বক্তৃতার একটি অংশ। সুভাষের এক দাদা প্রায়ই আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন। অরবিন্দের অন্যান্য বাণী ও পত্রগুলিও যত্নের সঙ্গে পড়তে থাকেন সুভাষ।

ছোট থেকে সুভাষ ছিলেন বড় অন্তর্মুখী আর ভাবপ্রবণ। কিন্তু এবার এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল তাঁর জীবনে। অন্তরের মাঝে

এক বিপুল কর্মোদ্যমের উত্তাপ অনুভব করলেন সুভাষ। সে উত্তাপে তাঁর অন্তর্মুখী জীবনের গুটিয়ে থাকা পাপড়িগুলি ফুটে উঠল একে একে। আপন আত্মার সুরভিতে মগ্ন সুভাষ এবার চোখ মেলে চারিদিকে তাকালেন। বর্ণগন্ধময় সেই আশ্চর্য পাপড়িগুলিকে তুলে ধরলেন মানবকল্যাণের এক মহত্তর আদর্শের আকাশপথে।

পৈত্রিক বাড়ি এলগিন রোড থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ তিন মাইল দূর। কিন্তু রোজ হয় যাবার সময় অথবা বাড়ি ফেরার সময় হাঁটতে হয় সুভাষকে। একবার তাঁদের বাড়ির কাছে একটি বুড়ী ভিখিরিকে দেখেন সুভাষ। পথের ধারে জবু থবু হয়ে বসে ভিক্ষে করে। তার থাকবার কোন জায়গা নেই; খাবার কোন সংস্থান নেই। পরাধীনতা ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার উপর আরও বেশী করে বিদ্রোহী হয়ে উঠল সুভাষের মন। ধর্মসাধনার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেন। এইসব নিরাশ্রয় সর্বহারা মানুষরা যদি এইভাবে কষ্ট পায় তাহলে যোগসাধনা করে লাভ কি? ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ ত তাঁর কাম্য নয়। যাই হোক নিজে কষ্ট করে পায়ে হেঁটে ট্রাম বাসের পয়সা বাঁচিয়ে সাধ্যমত রোজ দু চার পয়সা করে সাহায্য করতে লাগলেন। দক্ষিণ কলকাতার অনাথ ভাণ্ডারের সদস্যরূপে প্রতি রবিবার ভিক্ষেয় বেরিয়ে চাল টাকা আদায় করতে লাগলেন। তবু মন ভরে না। কতটুকু সাহায্যই বা করা হয় তাতে গরীবদের!

সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবার কাজও এগিয়ে চলল। ১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে তিনিও পল্লী উন্নয়নের জন্য জোর দিলেন। এই বছরেই একদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম দেখলেন ও তাঁর বক্তৃতা শুনলেন সুভাষ। আফ্রিকায় তখন মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে। সেই উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয় এবং তাতে ভাষণ দিতে

আসেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর আবেগময় কণ্ঠ ও ওজস্বিনী ভাষায় মুগ্ধ হয়ে যেত জনতা। সুভাষের কিন্তু তেমন ভাল লাগত না। তাঁর ভাষার অলংকার ও ঐশ্বর্য সত্ত্বেও কী একটা গভীর জিনিস যেন তার মধ্যে নেই যা অরবিন্দের কয়েকটি সাদা ও সরল কথার মধ্যে আছে।

রাজনীতির দিকে মনটা তখনও যায়নি সুভাষের। স্থির হয়নি তখনও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ধর্মের প্রতি মোহ তখনও যায়নি। ভাবলেন গুরুকরণ হয়নি বলেই হয়ত উন্নতি হচ্ছে না অধ্যাত্ম সাধনায়। প্রশান্তি পাচ্ছেন না মনে।

তখন ১৯১৪ সাল। ১৯০৫ সাল থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে অগ্নিযুগ শুরু হয়েছে তা তখন চলছে পুরোদমে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা কানে আসে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুবরণ, মানিকতলা ষড়যন্ত্রের মামলা, আলিপুরের বোমার মামলা একের পর এক ঘটে যায়। ১৯১২ সালে দিল্লীর রাজপথে হাতীর পিঠের উপর চড়ে যাওয়া বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা মারেন বসন্ত বিশ্বাস।

এইসব বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের সততায় ও গভীরতায় কোন সন্দেহ নেই সুভাষের মনে; বরং শ্রদ্ধা অনুভব করে তাঁদের প্রতি। তবু তাদের হিংসাত্মক কাজ মেনে নিতে পারেন না মনে প্রাণে। বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাব তখনও কাজ করে চলেছে মনের গভীরে।

কলেজে পড়াশুনো করতে ভাল লাগে না সুভাষের। অধ্যাপকদের বক্তৃতার মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু খুঁজে পেতেন না। কলেজে তখনও প্রথম বর্ষ পার হয়নি। এমন সময় গুরু খোঁজার বাসনা আর চেপে রাখতে পারলেন না মনে। পথে ঘাটে যে কোন সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই মনে ভাবেন এরই কাছে দীক্ষা নিই।

একবার কলকাতা হতে ষাট মাইল দূরে একটি নদীর ধারে ফাঁকা মাঠে এক পাঞ্জাবী সাধুকে দেখে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন সুভাষ। সাধুটি আকাশের তলায় ফাঁকা মাঠের উপর থাকত আর যে যা দিত তাই খেত। রাত্রিবেলায় তার গায়ের উপর দিয়ে কত সাপ চলে যেত। তবে সাধুটি তত্ত্বকথা কিছুই জানেন না; তাই তাকে গুরু করলেন না সুভাষ। অবশেষে ১৯১৪ সালেই গ্রীষ্মের ছুটির সময় এক বন্ধুর কাছে তার বৃত্তি পাওয়া টাকা ধার করে আর এক বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে লছমনঝোলা, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন, বেনারস, গয়া প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রগুলি ও পরে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গাগুলি দেখলেন। মথুরার এক সাধু সুভাষকে বললেন, ঘরে ফিরে যাও, গৃহত্যাগের সময় এখনও তোমার হয়নি। কিন্তু তার কথা ভাল লাগল না সুভাষের।

বৃন্দাবনের কুসুম সরোবরে কয়েকজন বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে বাস করলেন সুভাষ। এই সাধক দলের গুরু রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। হিন্দুদর্শন ও ধর্মতত্ত্বে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। কিন্তু তিনি শংকরাচার্য বিরোধী ছিলেন বলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কথা ভাবতেও পারলেন না সুভাষ। রামকৃষ্ণদাস বাবাজী প্রায়ই বলতেন, শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদের থেকে বৈষ্ণবদের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনেক ভাল। শংকরাচার্যের মায়াবাদের ঘোর তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সুভাষের অন্তরাত্মাকে। তাই শংকরাচার্যের উপর আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না।

বৃন্দাবন থেকে বেনারসে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে এলেন। সে মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সুভাষের বাবা ও পরিবারের সকলকে জানতেন। সেখানে দিনকতক থেকে সেখান থেকে সোজা একদিন হঠাৎ কলকাতার বাড়িতে চলে এলেন। বাড়িতে তখন ভীষণ হৈ চৈ চলছে তাঁর জন্য। কারণ তিনি কাউকে বলে যাননি। চারদিকে অনেক

খোঁজাখুঁজি চলেছে। অনেক জ্যোতিষের কাছে গণনা করান হয়েছে। কিন্তু তাঁরা পুলিশে খবর দেননি।

বাড়িতে এসেই জ্বরে পড়লেন সুভাষ। জ্বর থেকে টাইফয়েড। বিছানায় শুয়ে শুয়েই একদিন শুনতে পেলেন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

॥ তিন ॥

এ যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল সুভাষের জীবনে। ছোট থেকে ধর্মচর্চা করতে গিয়ে মায়াবাদের একটা রাজ্য গড়ে উঠেছিল তাঁর মনে। সে রাজ্যটা প্রথম সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেল এই মহাযুদ্ধের ঘটনা থেকে। দিনের পর দিন যুদ্ধের ঘটনাবলী যতই পড়তে থাকেন ততই ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যায় সেই মায়াবাদের দুর্গটা। প্রশ্ন জাগে মনে, এতদিন যা চেয়ে এসেছেন তা ভুল তা মিথ্যা। শুধু যোগসাধনা করে দেশকে স্বাধীন করা যায় না; মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করা যায় না। অবশ্য তাঁর এই মায়াবাদ প্রথম আঘাত খায় কলকাতার পথে ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচার আর ভিখিরিদের দৃশ্য দেখে। কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। সে আঘাতে স্থায়ী ফল কিছু হয়নি।

দেশকে মায়ের মত ভালবাসতেন সুভাষ। দেশের লোকের প্রতি আন্তরিক দরদ ছিল, কিন্তু কিভাবে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবেন, কিভাবে দেশের নিপীড়িত জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূর করবেন, কোন স্পষ্ট ধারনা ছিল না সে বিষয়ে। কলেজ হোস্টেলে বেড়াতে গিয়ে প্রায়ই বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা হত। কারণ তখন বিপ্লবীরা বিভিন্ন কলেজের ছাত্রাবাস গুলিতে গিয়ে ছাত্রদের বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না সুভাষের। আবার বিবেকানন্দ অরবিন্দের ধর্মভিত্তিক

জাতীয়তাবাদ ও গান্ধীজীর অহিংসা নীতির প্রভাব সত্বেও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তখনও সে বিষয়ে। তখনও ভাবতেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজসেবার মধ্য দিয়েই হবে জাতীয় পুনর্গঠন, আসবে জাতীয় স্বাধীনতা।

অসুখ থেকে সেরে উঠে পড়াশুনোয় মন দিলেন সুভাষ। কয়েকমাস ধরে পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হয়েছে। আই, এ পরীক্ষা এসে গেছে। কিন্তু ১৯১৫ সালের আই, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করলেও খুব একটা ভাল ফল করতে পারলেন না। যাই হোক আই, এ পাশ করে দর্শনে অনার্স নিয়ে বি, এতে ভর্তি হলেন।

দর্শনশাস্ত্রের প্রতি প্রথম থেকেই একটা আগ্রহ ছিল সুভাষের। কারণ তিনি ভাবতেন, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যত কিছু জটিল প্রশ্ন আছে তার উত্তর একমাত্র দর্শনই দিতে পারে। কিন্তু কিছুদিন দর্শনের বইগুলি পড়ার পর হতাশ হলেন সুভাষ। দেখলেন, দর্শন প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে না, জীবনের কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না ; দর্শন শুধু মনের মধ্যে নিয়ে আসে এক বুদ্ধিগত শৃংখলা আর চিন্তা পদ্ধতিকে করে উন্নত। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য দর্শন, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না, উল্টো প্রশ্ন জাগায়। সংশয় থেকেই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের শুরু। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে বলতেন, বস্তুর সত্যতায় প্রথমে সংশয় করবে, তা না হলে সে সত্যতাকে জানবার ইচ্ছা জাগবে না। সংশয়ই গতি দান করে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে। শুধু প্রশ্ন আর সংশয়। কোথাও কোন গভীর বিশ্বাসের কথা খুঁজে পেলেন না সুভাষ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ক্ষেত্রে।

তবে একটা কাজ হলো। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রভাবে সুভাষের মনেও প্রশ্ন জাগল বেদান্তের পরমার্থ সম্পর্কে। বাইরের যে বস্তুজগৎকে এতদিন ভাল করে চোখ মেলে চেয়ে দেখেননি সে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে জাগল প্রথম বুদ্ধিগত কৌতূহল। তিনি ভাবলেন,

চোখের সামনে যে মাটি যে মানুষ দেখছি তা মিথ্যা বা তুচ্ছ নয়। বিশ্বসৃষ্টির ক্রমবিবর্তনে সব কিছুরই কিছু না কিছু অবদান আছে।

তখন ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাস। সেদিন দুপুরে কলেজ লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনো করছিলেন সুভাষ, এমন সময় একটা হৈ চৈ শুনে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। শুনলেন, একজন ইংরেজ অধ্যাপক তাঁদের শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রকে মেরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হলো ব্যাপারটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। এর আগে তিনি ট্রামে বাসে পথে ঘাটে ইংরেজ সাহেবরা ভারতীয়দের নেটিভ বলে কিভাবে অপমানিত করে তা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। তবু অহেতুক আবেগে উত্তেজিত হওয়া স্বভাব নয়। তিনি বরাবরই অন্তর্মুখী এবং যুক্তিবাদী। ভাল করে না দেখে শুনে অথবা ভাবনা চিন্তা না করে কোন কাজ করেন না। তাই শান্তভাবে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের শ্রেণীর ছাত্র-প্রতিনিধি, সুতরাং আসল ব্যাপারটা জানা দরকার।

সুভাষ গিয়ে জানলেন, ইংরেজ অধ্যাপক ই, এফ ওটেন যখন একটি ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন তখন সুভাষদের ক্লাসের জনকতক ছাত্র সেই ঘরের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল। এতে ওটেন দারুণ চটে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন ছেলেগুলিকে।

সুভাষ দেখলেন দোষটা ওটেনেরই। কারণ ছেলেরা সত্যিসত্যিই গোলমাল করলেও ওটেন তাদের ভদ্রভাবে নিষেধ করতে পারতেন; এভাবে গায়ে হাত দেয়া উচিত হয়নি। ক্লাসের প্রতিনিধি হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানালেন সুভাষ। বললেন, যে সব ছেলেকে অপমান করেছেন, তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ওটেনকে।

তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এইচ, আর, জেমস। সব কথা শুনে জেমস বললেন, এটা অসম্ভব। ওটেন হচ্ছেন ইণ্ডিয়ান

এডুকেশনাল সার্ভিসের একজন সদস্য। এই ক্ষমা চাওয়ার কথা আমি কেমন করে তাঁকে বলব? তাছাড়া এটাকে অপমান বলে না, উনি শুধু হাত ধরে ছেলেদের সরিয়ে দিয়েছেন।

জেমসের কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না সুভাষ। ছেলেরাও একথা মানল না। পরের দিন সাধারণ ধর্মঘট হলো কলেজে। ব্যর্থ হলো অধ্যক্ষের সমস্ত দমনমূলক চক্রান্ত। তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ওই কলেজেই অধ্যাপনা করতেন। ছাত্রদের উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। কিন্তু তাঁর ও কলেজের সব জনপ্রিয় অধ্যাপকদেরই আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হলো। ধর্মঘট সফল হলো। পরের দিন ধর্মঘটে যোগদানকারী ছাত্রের উপর একটা পাইকারী জরিমানা ধার্য করলেন।

পরের দিনও ধর্মঘট চলল। অবশেষে ওটেনের উপর চাপ দেয়া হলো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। ওটেন অপমানিত ছাত্রদের ডেকে ঝগড়া মিটিয়ে নিলেন। পরের দিন ধর্মঘটের অবসান হলো। ছাত্ররা যোগদান করল ক্লাসে। এইভাবে ব্যাপারটা মিটে গেল; তবু ছাত্রদের উপর ধার্য জরিমানা তুলে নিলেন না অধ্যক্ষ। শুধু যারা গরীব ও অপারগ তাদের দিতে হবে না।

একমাস পর আবার এই ধরনের এক ঘটনা ঘটল। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্রকে আবার অপমান করেছেন ওটেন। ছাত্ররা আবার ক্ষেপে উঠল। কিন্তু কি করবে তারা? মহা চিন্তায় পড়লেন সুভাষ। শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের দ্বারা প্রতিবাদ করলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে ছাত্রদের উপর। জরিমানা করা হবে ছাত্রদের উপর। তাই সব ছাত্র প্রতিনিধিরা মিলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ওটেনকে সরাসরি শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। একদিন উপরতলায় এক বারান্দায় কয়েকজন ছাত্র সামনে থেকে ওটেনকে আক্রমণ করে উপর সিঁড়ি বেয়ে তাঁকে গড়িয়ে নিচে ফেলে দিল।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। বাংলা সরকার কলেজ বন্ধ করার

আদেশ দিল এবং এই কলেজে বারবার গোলমালের জন্য এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করল। অধ্যক্ষ জেমস কলেজ বন্ধ রাখার নীতি মানতে না পারায় তাঁকে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা হলো। কিন্তু তার আগে একদিন অধ্যক্ষ যে সব ছেলের নাম অপরাধীর তালিকায় ছিল তাদের সকলকে ডেকে পাঠালেন। সুভাষের নামও তার মধ্যে থাকায় তাঁকেও যেতে হলো। সকলের চেয়ে সুভাষের উপরেই জেমসের আক্রোশটা বেশী। সুভাষকে দেখে জেমস গর্জন করে বলে উঠলেন, বোস, তুমিই হচ্ছ কলেজের সব কিছু অশান্তির মূলে। তোমাকে আমি কলেজ থেকে বহিষ্কার করছি।

কোনরূপ প্রতিবাদ না করে গম্ভীরভাবে সুভাষ শুধু বললেন, ধন্যবাদ।

এই বলে সঙ্গে সঙ্গে কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেন সুভাষ। এর পর কলেজের গভর্ণিং বডিও অধ্যক্ষের এই বহিষ্কারের আদেশ অনুমোদন করল। তারপর শুরু হলো তদন্ত কমিটির কাজ। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ছাত্রদের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হলে সুভাষও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, ওটেনের উপর আক্রমণকে সমর্থন করেন কি না।

সুভাষ বললেন, এই আক্রমণকে অবশ্য আমি সমর্থন করি না। কিন্তু ছাত্রদের উত্তেজিত হওয়ার গুরুতর কারণ ছিল।

এরপর কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকের অন্যায় কাজগুলি একটির পর একটি করে বলে গেলেন। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলো না কমিটি। তারা চাইল সুভাষ বিনা সর্তে ওটেনের আক্রমণকে নিন্দা করুক। কিন্তু তা করলেন না সুভাষ। জেনে শুনে অন্যায়কে ও অসত্যকে কখনই সমর্থন করবেন না তিনি। তাতে যদি তাঁর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় হোক।

কমিটি সুভাষের উপর বহিষ্কারের আদেশকেই বহাল রাখল।

তখন কলকাতার রাজনৈতিক অবস্থা বড়ই বিক্ষুব্ধ। বাংলায় চলছে অগ্নিযুগের পালা। এই সময় কলকাতার অন্যতম বিপ্লবী শিশির দত্তগুপ্ত রিভলবার সহ বাড়িতে ধরা পড়েন। বছর দুই আগে ১৯১৪ সালে রডা কোম্পানিতে পাঠাবার সময় বিভিন্ন ধরনের বহু অস্ত্র মাঝপথে চুরি করে নেয় বিপ্লবীরা। এই বছরেই ঢাকার বিখ্যাত বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির একজন সদস্য নির্মল রায় সি, আই, ডি ইনস্পেক্টার নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষকে হত্যা করেন। ১৯০৭ সালে মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ও ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমার মামলায় বিপ্লবীদের কাছ থেকে পাওয়া বহু বোমা, বোমা তৈরির ছাঁচ ও রিভলবার কোর্টে দেখানো হয়। এইসব বোমার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য হলো একটি পুস্তক বোমা। যে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে বোমার আঘাতে মারতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসু ভুল করে অন্য এক ইংরেজ দম্পতিকে মারেন এবং ধরা পড়ে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করেন এবং প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করেন সেই কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য কৌশলে তাঁর বাড়িতে এক পুস্তক বোমা পাঠানো হয়। বই পড়ার নেশা ছিল কিংসফোর্ডের। সেই কথা জানতে পেরে বিপ্লবীরা একটি সুবৃহৎ আইনের বইএর ভিতরে আশ্চর্য কৌশলে একটি টাইম বোমা ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু বইখানি কিংসফোর্ড দেখার সময় পাননি এবং তাঁর চাকর বইটি তাঁর লাইব্রেরীর একটি আলমারিতে তুলে রাখে। দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত থাকার ফলে বোমাটি ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যায়।

ওটেনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্সী কলেজের বহিষ্কৃত ছাত্রদের উপর নজর রাখতে লাগল পুলিশ। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করল। কোন কাজ না থাকলে কোন যুবকের শুধু শুধু কলকাতায় বসে থাকা উচিত নয়। এই ভেবে সুভাষের দাদারা তাঁকে কটকে পাঠিয়ে দিলেন।

১৯১৬ সালের মার্চ মাসে কটক চলে গেলেন সুভাষ। কলেজ থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে একদিকে যেমন তাঁর পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হলো, অন্যদিকে তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের জন্য প্রভূত আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি খুঁজে পেলেন মনের মধ্যে। আত্মত্যাগের আস্বাদ পেলেন জীবনে প্রথম।

কটকে গিয়ে সমাজসেবায় মন দিলেন সুভাষ। পড়ার বইগুলি দূরে সরিয়ে রেখে দিলেন। ধর্ম ও সাধনার বাতিক ঝেড়ে ফেললেন মন থেকে। মানুষের সেবা করে অদ্ভুত আনন্দ পেতে লাগলেন অন্তরে। নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম জনসেবাই ভগবানের সেবা— বিবেকানন্দের এই বাণীর মর্মার্থ আজ যেন নতুন করে উপলব্ধি করলেন।

কটকে তখন ছাত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল ছিল। তারা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে রোগীদের সেবা করত। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত রোগীদেরও বাদ দিত না। তাদের দলে যোগ দিলেন সুভাষ। স্থানীয় হাসপাতালের কলেরা বিভাগের ডিউটি দিতে লাগলেন, কারণ ওই সব বিভাগে তখন শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স ছিল না।

এক বছর কটকে থাকার পর আবার কলকাতায় ফিরে এলেন সুভাষ। তখন ১৯১৭ সাল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। তখন স্যার আশুতোষ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা। বাড়ির তরফ থেকেও চেষ্টা চলতে লাগল। তবে তখনও পর্যন্ত কিছু ঠিক না হওয়ায় বড় চঞ্চল হয়ে উঠলেন সুভাষ। তখন বাঙালী বাহিনীতে লোক নেয়া হচ্ছিল শুনে সেনাবাহিনীতে যোগদান করার মনস্থ করে ফেললেন।

বৃটিশ সরকার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বাঙালীদের ভর্তি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে হতেই কয়েকজন বাঙালী

সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালীদের ভর্তির ব্যাপারে সরকারকে রাজী করাবার জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার এ্যাম্বুলেন্স কোর-এ যোগ দেবার সুযোগ দিতে বাঙ্গালীদের মেসোপটেমিয়ায় পাঠায়। সেখানে বাঙ্গালীরা ভাল কাজ করায় ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীতে বাঙ্গালীদের ভর্তি করা হয় এবং ৪৯ নম্বর বাঙ্গালী বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীতেই ভর্তি হবার জন্য আবেদন করেন সুভাষ। এক বছর আগে হতেই যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা জাগে তাঁর মনে। ঐ সময় একজন যুদ্ধ ফেরৎ অফিসারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ঐ অফিসার ভদ্রলোক তুরস্কে যুদ্ধবন্দীরূপে কিছুদিন ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী শুনে উত্তেজনার রোমাঞ্চ জাগে সারা গায়ে। বীরত্বের মধ্য দিয়ে প্রাণশক্তির এক অপরূপ ও আশ্চর্য বিকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে মনের প্রতিটি অণু পরমাণু।

কিন্তু এ ইচ্ছা সফল হলো না সুভাষের। কারণ তাঁর চোখ দুটি খারাপ ছিল। তাই স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও চক্ষু পরীক্ষক মেজর কুক তাঁকে অনুপযুক্ত বলে রায় দিলেন।

যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুটা সদয় হলো। সুভাষকে জানানো হলো, অন্য একটি কলেজ দেখতে হবে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তি না থাকলে তিনি ভর্তি হতে পারেন। বঙ্গবাসী কলেজ ভর্তি করতে চাইল সুভাষকে। কিন্তু সেখানে তখন দর্শনে অনার্স নেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে স্কটিশ চার্চ কলেজে চেষ্টা করতে লাগলেন সুভাষ। এজন্য কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর আর্কুহার্ট সাহেবের কাছে গিয়ে একদিন দেখা করলেন। আর্কুহার্ট সাহেব নিজেই বাইবেল ও দর্শন পড়াতেন কলেজে। অত্যন্ত ভাল লোক, বিচক্ষন এবং সহানুভূতিশীল। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ভর্তি করতে পারি, কিন্তু একটা শর্তে, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ যদি কোন বাধা না দেন।

তখন সুভাষের মেজদাদা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন কলকাতায় সুভাষের অভিভাবক। তিনি এ কাজের ভার নিলেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের মত করালেন। তবে সুভাষকে নিজে একবার যেতে হলো তাঁর কাছে। তিনি স্পষ্ট বললেন, তুমি অন্য কলেজে ভর্তি হলে আমার কোন আপত্তি নেই।

অবশেষে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে স্কটিশ চার্চ কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে দর্শনে অনার্স নিয়ে আবার ভর্তি হলেন সুভাষ। আবার শুরু হলো শিক্ষাজীবন।

এই বছরেই মাসখানেক পরে ভারত শাসন ব্যাপারে বৃটিশ সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত ভ্রমণ ও বঙ্গভঙ্গ রদ করলে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু ১৯০৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতাদের কারাবাসের ফলে বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে বিশেষভাবে। সরকারের প্রশাসনযন্ত্রকে বিকল করে দেবার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের হত্যার চেষ্টা করা হয়। বিপ্লবীরা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের মত কোনমতেই বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কোনরকম আপোষ করে চলতে রাজী নন, তাঁরা চান পূর্ণ স্বরাজ আর তার জন্য চালিয়ে যেতে চান আপোষহীন ক্লান্তিহীন সংগ্রাম।

১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটেন প্রচার করে যে ছোট ছোট নিপীড়িত দেশগুলির স্বাধীনতার জন্যই তারা যুদ্ধে নেমেছে। এই প্রচারের কথা শুনে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ভারতীয়রা। তারা বলে, তাই যদি হয় তবে বৃটেনের ভারতকে আগে স্বাধীনতা দেয়া উচিত। কারণ ভারতকে অন্যায়ভাবে পরাধীন করে রেখে তাকে পীড়ন করে চলেছে। সুতরাং ভারতের ব্যাপারে তাদের শাসননীতি এবং তার স্বাধীনতার ব্যাপারে তাদের প্রকৃত মতামত অবিলম্বে ঘোষণা করুক বৃটিশ সরকার।

ভারতের এই বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করবার জন্য ভারত সচিব মণ্টেগু ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট ঘোষণা করেন, মহামান্য সরকার বাহাদুরের নীতি হচ্ছে শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগে ভারতীয়দের আরও বেশী করে অংশ গ্রহণের সুযোগ দান এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে ভারতে যাতে দায়িত্বশীল সরকার গড়ে ওঠে তার জন্য ভারতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমোন্নতি সাধন।

এই ঘোষণা অনুযায়ী যাতে ঠিক কাজ হয় তার জন্য মণ্টেগু ভারতে আসেন এবং তখনকার বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন। পরে এই বিবৃতিই ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে পরিণত হয়। এই আইন অনুসারে বৃটিশ শাসিত প্রদেশের সরকারগুলিকে হস্তান্তরিত ও সংরক্ষিত এই দুই বিভাগে ভাগ করা হয়। শিক্ষা, কৃষি, আবগারী ও স্বায়ত্তশাসন এই চারটি দপ্তর আসে হস্তান্তরিত বিভাগের আওতায় এবং এই সব দপ্তরের ভার দেয়া হয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের থেকে নেয়া মন্ত্রীদের হাতে। পুলিশ, অর্থ ও বিচার বিভাগ থাকে গভর্ণরের কার্যনির্বাহক পরিষদের মনোনীত সদস্যদের হাতে। আরও ঠিক হয়, কেন্দ্রে কিন্তু এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চলবে না। সেখানে গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের মনোনীত সদস্যরাই সকল বিভাগ পরিচালনা করবেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদ নামে কেন্দ্রে যে দুটি আইন পরিষদ ছিল তাদের কাছে বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যরা কোন ভাবে দায়ী ছিলেন না। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের কিছু অধিকার দিলেও কার্যতঃ বৃটিশ সরকারের স্বৈরাচারের পথে কোন বাধা রইল না, কারণ আসল ক্ষমতা রইল বড়লাট ও ছোটলাটের হাতে।

স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সামরিক

শিক্ষালাভের একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন সুভাষ। তখন ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীর একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছিল এবং তাতে ভর্তি চলছিল। কলকাতার বিখ্যাত সার্জেন ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এ ব্যাপারে। ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাদানই এই শাখা গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং ভর্তির ব্যাপারে কড়াকড়ি নেই। তাই সহজেই ভর্তি হয়ে গেলেন সুভাষ। শিক্ষার জন্য শিবিরে থাকতে হলো চার মাস। তার মধ্যে কিছুদিন বেলঘরিয়ায় থাকতে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন গ্রে ছিলেন তাঁদের সর্বাধিনায়ক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক শাখার ছেলেরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই অল্পদিনের মধ্যে শিখে ফেলল সাধারণ সৈনিকের কাজ। তাদের গার্ড অফ অনার, কুচকাওয়াজ প্রভৃতির কাজ দেখে সন্তুষ্ট হলেন ছোটলাট ও তাঁর মিলিটারি সেক্রেটারি।

সামরিক শিক্ষার জন্য প্রথম বছরটা পড়াশুনোয় ভাল মন দিতে পারলেন না সুভাষ। তা না পারলেও কোন ক্ষোভ ছিল না মনের মধ্যে। উল্টো তিনি যখন সৈনিকের পোশাক পরে ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে ঢুকতেন অথবা রুট মার্চ করে যেতেন তখন একটা গর্ব ও মর্যাদা অনুভব করতেন। পুলিশ ও সরকারের কর্মচারিরা তাঁদের খাতির করত। তাতে মনে হত যে মর্যাদায় দেশের নাগরিক হিসাবে তাঁদের জন্মগত অধিকার এবং যে মর্যাদা হতে তাঁদের জোর করে বঞ্চিত রাখা হয়েছে সেই মর্যাদা এখন তাঁরা পাচ্ছেন।

পরের বছরই বি, এ পরীক্ষা। এবার পড়াশুনোয় মন দিলেন। ১৯১৯ সালের বি, এ পরীক্ষায় ফল ভাল হলো। অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। কিন্তু এম, এ তে আর দর্শন পড়ার ইচ্ছা রইল না। এতদিন দর্শনশাস্ত্র পড়ে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু জীবনের কোন-মৌলিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাননি তাতে। তিনি এম, এ তে পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়বেন

ঠিক করলেন। কিন্তু মাসকতকের মধ্যেই তাতেও কোন আগ্রহ রইল না তাঁর।

সুভাষচন্দ্রের বাবা তখন কলকাতায়। একদিন সন্ধ্যের সময় বাবার ঘরে ডাক পড়ল সুভাষচন্দ্রের। গিয়ে দেখলেন সেখানে মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসে আছেন। সুভাষকে সরাসরি বলা হলো, তিনি ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস পড়বার জন্য যেতে রাজী আছেন কি না। এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানাবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয়া হলো।

চব্বিশ ঘণ্টা নয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মন ঠিক করে ফেললেন সুভাষচন্দ্র। তিনি ইংলণ্ড যাবেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে বৃটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করা সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে। তবে তাঁর উত্তীর্ণ হবার আশা খুব কম, কারণ সময় খুব অল্প এবং বয়সের দিক থেকে একবার- মাত্রই পরীক্ষা দিতে পাবেন। যদি কোনরকমে পাশ করেও যান, তখন ভাববার সময় থাকবে যথেষ্ট।

আর সময় নেই। রওনা হতে মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। গোটা পথটাই সমুদ্রপথে যাবেন। জাহাজের বার্থ যোগাড় করা হলো। কিন্তু বহিষ্কৃত ছাত্র হিসাবে সুভাষের উপর পুলিশের কড়া নজর থাকায় পাসপোর্ট নিয়ে ঝামেলা হলো। তবে তাঁর একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় বড় দরের পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁর তৎপরতায় ছয় দিনের মধ্যেই পাসপোর্ট পাওয়া গেল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন অধ্যাপক ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের পড়াশুনো করতে যাওয়ার ব্যাপারে প্রাদেশিক উপদেষ্টা ছিলেন। সৌজন্যের খাতিরে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলেন সুভাষ। কিন্তু বহিষ্কৃত ছাত্রদের তিনি একেবারে দেখতে পারতেন না বলে আই, সি, এস পড়তে যাওয়ার ব্যাপারে নানাভাবে নিরুৎসাহিত করতে লাগলেন। বললেন, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের সেরা সেরা ছাত্রদের

সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কখনই পেরে উঠবে না। কেন শুধু শুধু দশ হাজার টাকা নষ্ট করতে যাচ্ছ ?

সুভাষ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, আমার বাবা নষ্ট করবার জন্যই আমায় দশ হাজার টাকা দিতে চান। সুতরাং আমাকে যেতেই হবে।

এই বলে বেরিয়ে এলেন সুভাষ। যেতে তাঁকে হবেই। কিন্তু বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেশ ছেড়ে যেতে হবে তাঁকে। তখন ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস। মাত্র চার মাস আগেকার জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত ঘটনা অহরহ কাঁটার মত তখনও বিঁধছে তাঁর মনে। রাজনীতিতে তখনও যোগদান করেননি। তবু তখন হতেই একই সঙ্গে দেশের নিপীড়িত মানুষদের প্রতি অপরিসীম মমতা ও সহানুভূতি আর বিদেশী শাসকদের উপর তীব্র ঘৃণা জমতে শুরু করেছে অন্তরে।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন মহাত্মা গান্ধী বরণ করে নিলেও বোম্বাই কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন এই আইন প্রত্যাখ্যান করে। জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা পর্যন্ত বিশেষ অপর্যাপ্ত বলে মানতে পারল না এই আইন।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের পর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে যে দলাদলি চলছিল ১৯১৫ সালের পর থেকে তার একটু উন্নতি হয়। সুরাট কংগ্রেসে সংগঠন বোম্বাইএর স্যার ফিরোজ শা মেটা, পুনার জি, কে, গোখেল ও বাংলার স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দক্ষিণপন্থী নেতাদের হাতে চলে যায়। লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বামপন্থী নেতারা বেরিয়ে এসে এই বছর হতেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শুরু হয় অগ্নিযুগ। এঁরাই প্রথম বৃটিশ পণ্য বর্জনের কথা বলেন। পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় কোন পক্ষেই যোগ না দিয়ে মাঝখানে থাকেন।

১৯১৪ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হতে সত্যাগ্রহী আন্দোলনের জন্য প্রচুর সম্মান পেয়ে ভারতে ফিরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রভাব বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের উপর। ১৯১৬ সালে লোকমান্য তিলক জেল থেকে মুক্তি পেলে তিলক ও গান্ধীর প্রভাবে কংগ্রেসের দুই শাখার মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব অনেকটা কমে যায়। এই বছর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের দুই শাখার মধ্যে একটা আপোষও হয়। এমন কি মুসলিম লীগের সঙ্গেও কংগ্রেসের একটা আপোষ হয়। ভারতের আইন সভাগুলিতে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নেয় কংগ্রেস। মুসলিম লীগও কংগ্রেসের সঙ্গে একই স্বায়ত্তশাসনের দাবী পেশ করল। এই সময় মাদ্রাজের থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী শ্রীমতী এ্যানি বেসান্তও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবী করেন। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে এক বিরাট অভিযান শুরু করেন। এর জন্য সরকার তাঁকে অন্তরীণ করে। অবশ্য জনমতের চাপে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বামপন্থীরা পরের বছর শ্রীমতী বেসান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী করেন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে সন্তুষ্ট না হয়ে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য আন্দোলন করতে লাগল এ দেশের লোক তাই দেখে রেগে গেল বৃটিশ সরকার। তাদের আন্দোলন দমন করবার জন্য রাওলাট আইন নামে শাস্তিমূলক এক আইন পাশ করল। এই আইনের বলে যে কোন লোককে রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক করে রাখা যাবে।

এই আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর নেতৃত্বে দেশ জুড়ে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাঞ্জাবে অমৃতসরে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বাধীনে একদল সৈন্য ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগের একটি জনসভায়

নিরস্ত্র নির্দোষ জনগণের উপর নির্মমভাবে গুলি চালায়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সরকারও এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে এবং সুদূর ইংলণ্ডের অনেকেই এই ঘটনার নিন্দা করেন।

যাই হোক, এই সব ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতেই এই বছরের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'সিটি অফ ক্যালকাটা' জাহাজে গিয়ে উঠলেন সুভাষ। এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে কোনরকমে ছিনিয়ে নিলেন মনটাকে। ভাবতে লাগলেন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যাচ্ছেন। আরও ভাবলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ তাঁকে করতেই হবে। পরে চাকরি না করেন না করবেন। এতে আর কিছু না হোক প্রশাসনযন্ত্রের অনেক গোপন রহস্য ভালভাবেই জানা যাবে।

পৌঁছতে ২৫শে অক্টোবর হয়ে গেল। এক মাসের জায়গায় আরও দশ দিন বেশী লেগে গেল। কেম্ব্রিজে ভর্তি হতে আরও দশ বারো দিন লাগল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কেম্ব্রিজ খুব রক্ষনশীল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু অক্সফোর্ড অনেকটা উদার হতে শুরু করেছিল। তবে সুভাষ দেখলেন, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাধীনতা প্রচুর সেখানে। দেশী বিদেশী কোন ভেদ জ্ঞান নেই। জীবনে যেন প্রথম স্বাধীন আবহাওয়ার আস্বাদ পেলেন। এক নতুন মর্যাদা পেলেন জীবনের। এখানে পুলিশ নজর রাখে না; ইংরেজরা ঘৃণা করে না। পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানি সহ্য করতে হয় না পদে পদে। এখানে সবাই স্বাধীন।

তখন ইংলণ্ডে ভারতীয় ও ইংরেজ ছাত্রদের সম্পর্ক মধুর ও বন্ধুত্বপূর্ণ থাকত না সব সময়। সব ইংরেজ ছাত্রের কাছ থেকে সহানুভূতি পাওয়া যেত না। অন্য দিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বিশেষ ভাবে স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ছাত্রদের মন। সচেতন হয়ে উঠেছিল তারা জাতীয় মর্যাদা সম্পর্কে। তখন

ইংলণ্ডে একমাত্র শ্রমিক দলই ভারতের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিল।

সবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা শুরু হলো ১৯২০ সালের জুলাই মাসের লণ্ডন শহরে। একমাস ধরে চলল পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে ভাবতে লাগলেন সুভাষ। পরীক্ষা মোটেই তাঁর আশানুরূপ হয়নি। পাশ করার কোন আশা নেই। অনুবাদের পত্রটি মোটেই ভাল হয়নি। কিন্তু একদিন সকালে উঠে খবরের কাগজে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষ। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন।

বাড়িতে খবরটা টেলিগ্রাম করে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু নতুন করে ভাবনা বেড়ে গেল। এ চাকরি কেমন করে করবেন। যাই হোক বাড়ির চিঠি পেয়ে চিন্তার মাঝেও বেশ কিছুটা খুশি হলেন সুভাষ। চিঠিটা লিখেছেন মেজদা। লিখেছেন তার সাফল্যে বাড়ির সকলেই খুশি। মেজদার চিঠির উত্তর দেন সুভাষ ১৯২০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর। তিনি লিখলেন, "আপনার অভিনন্দনসূচক পত্র পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। জানি না, আই, সি, এস পরীক্ষা পাশ করে কী এমন আমার লাভ হয়েছে, তবু এই খবরে আপনারা যে খুশি হয়েছেন এবং বিশেষ করে বাবা মায়ের মন এই দুর্দিনে একটু হাল্কা হয়েছে তাতেই আমার আনন্দ।

পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করায় প্রচুর অভিনন্দন পাচ্ছি। কিন্তু আই, সি, এস গোষ্ঠিতে যোগদান করার চিন্তায় বিন্দুমাত্র আনন্দ পাচ্ছি না। চাকরি জীবনে মোটা মাইনে ও তারপর মোটা পেন্‌সন্‌ বরাদ্দ থাকবে জানি। দাসত্বে যদি যথেষ্ট কুশলতা অর্জন করতে পারি তাহলে একদিন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হবারও আশা আছে। যোগ্যতা গুণে দাসত্বের কাজে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু

চাকরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলে মেনে নিতে হবে? চাকরিতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাবে, কিন্তু সে সুখ কি আত্মার মূল্য দিয়েই কিনতে হবে আমায়? আমার মনে হয় আই, সি, এস গোষ্ঠির কোন লোককে চাকরির নিয়মকানুন যেভাবে মাথা নিচু করে মেনে নিতে হয় তার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শকে মানিয়ে চলার চেষ্টা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাধারণ লোকে যাকে উন্নতি বলে সেই উন্নতির তোরণে দাঁড়িয়ে আজ আমার মনের অবস্থা কি হচ্ছে তা আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন! সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে আপনার কোন মোহ নেই তা আমি জানি। কিন্তু আমার চাকরি ছাড়ার কথাতে বাবা যে খড়্গাহস্ত হয়ে উঠবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনি হয়ত বলতে পারেন এ চাকরি না এড়িয়ে এর ভিতরে প্রবেশ করে এর পাপকে দূর করা উচিত। কিন্তু তা হলেও একদিন না একদিন আমাকে তা ছাড়তে হবেই। তাছাড়া অনেক সন্দেহবাদী লোকে বলবে একবার চাকরিতে ঢুকলে আমার তেজ আর থাকবে না। সুতরাং চাকরির সেই অশুভ প্রভাব আমার উপর কিছুতেই পড়তে দেব না, এ বিষয়ে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি বিয়ে করব না, সুতরাং যখন যা সত্য বুঝব তাকে পালন করার পথে সাংসারিক বিবেচনার অধীন হয়ে থাকতে হবে না।

আমার মনের যা গঠন তাতে সন্দেহ হয় সিভিল সার্ভিসের পক্ষে আমার যোগ্যতা আছে কি না। বরং আমার ধারণা, আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে তা অন্যভাবে আমার নিজের ও আমার দেশের উপকারে লাগাতে পারি।

মনে দ্বন্দ্ব জেগেছে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে তখনও উপনীত হতে পারেননি সুভাষ। পরে ১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারি আবার একখানি চিঠি লেখেন মেজদাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাবাকেও সব কথা জানিয়ে তাঁর সম্মতি ভিক্ষা করে আলাদা চিঠি লেখেন। এই দুখানি

চিঠিতেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। মেজদাকে লেখেন, আপনি বলতে পারেন যে এই কুৎসিত ব্যবস্থাকে এড়িয়ে না গিয়ে এর ভিতরে প্রবেশ করে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া উচিত। কিন্তু সে সংগ্রাম করতে হবে একা, কর্তৃপক্ষের হুমকি ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলি সহ্য করে। চাকরির মধ্যে থেকে দেশের যেটুকু উপকার করতে পারা যায় তা সামান্য। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্য সার্ভিসের আওতায় থেকে অনেক কাজ করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, আমলাতন্ত্রের বাইরে থাকলে তাঁর কাজ দেশের পক্ষে বেশী মঙ্গলজনক হত। তাছাড়া এখানে আসল প্রশ্ন নীতিগত। নীতি অনুসারেই আমি এই শাসনযন্ত্রের অংশী হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারি না।

আমি এখন দুই পথের সংযোগস্থলে উপস্থিত, এবং কোন মধ্যপথ অবলম্বন করার কোন উপায় নেই। হয় আমাকে এই গলিত চাকরির মায়া ছেড়ে সর্বান্তঃকরণে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে, নতুবা সমস্ত আদর্শ আকাংখায় জলাঞ্জলি দিয়ে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে হবে।···আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে তাই আপনার নিকট আবেদন করছি।

মেজদা শরৎচন্দ্রের উপর অনেকখানি নির্ভর করতেন সুভাষ। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও মতামতের মূল্য একমাত্র মেজদাই বুঝতেন। তাই তাঁর আশা এ ব্যাপারে মেজদাই বাবা মাকে বুঝিয়ে শান্ত করবেন।

এই বছরেই ১৬ই ফেব্রুয়ারি আর একখানি চিঠি লেখেন মেজদাকে। তখন সব অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। তখন তাঁর আত্মবিশ্বাস যেমন আগের থেকে আরও গভীর হয়ে উঠেছে, তেমনি সিভিল সার্ভিসে যোগ না দেয়ার সংকল্প হয়ে উঠেছে আরও দৃঢ় আরও অটল। তিনি লিখলেন, যদি চিত্তরঞ্জন দাস এই বয়সে সংসারের সব কিছু ছেড়ে জীবনকে

অনিশ্চয়তার পথে ছেড়ে দিতে পারেন তবে আমার সাংসারিক সমস্যাহীন তরুণ জীবনে এ ক্ষমতা আরও বেশী। চাকরি ছাড়লেও আমার কাজের কিছুমাত্র অভাব ঘটবে না। শিক্ষকতা, সমাজসেবা, সমবায় প্রতিষ্ঠানাদি, সাংবাদিকতা, গ্রাম সংগঠন প্রভৃতি বহু কাজ রয়েছে যাতে হাজার হাজার তরুণ যুবক জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বর্তমানে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছি। ন্যাশনাল কলেজ ও নূতন সংবাদপত্র স্বরাজ নিয়েই আমি এখন কিছুদিন কাটাতে পারব। আত্মত্যাগের আদর্শ নিয়েই আমি জীবন শুরু করতে চাই। আমার কাছে সরল অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তা আর দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবন সবচেয়ে প্রিয়। তাছাড়া বিদেশী শাসকের অধীনে চাকরি করা অতি ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করি।

দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষে করে বাবা ও মার কাছে পত্র দিয়েছি। এই পথে ভবিষ্যতে লাঞ্ছনার ভয় আছে এজন্য তাঁরা হয়ত ভাববেন। আমি নিজে দুঃখ কষ্টের ভয় করি না। দুঃখের দিন এলে আমি তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করে এগিয়ে নিয়ে বরণ করে নেব।

এই চিঠিখানি যখন লেখেন সুভাষ তখন তাঁর উপর অরবিন্দ ঘোষের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই চিঠিখানিতেই তিনি জানান, অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার কাছে মহৎ, নিঃস্বার্থ ও অনুপ্রেরণার পথ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথের চেয়ে কন্টকাকীর্ণ।

সুভাষ তখন অক্সফোর্ডে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় একদিন বাবার কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেলেন। তিনি সুভাষের চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারেননি। অথচ সুভাষের মন তখন প্রতিজ্ঞায় অটল।

বাবা লিখেছেন, দশ বছরের মধ্যে এ দেশে স্বায়ত্বশাসন অনিবার্য। সুতরাং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোন সিভিল সার্ভিস চাকুরের

পক্ষে নূতন শাসন ব্যবস্থায় জীবন মোটেই দুর্বিসহ হয়ে উঠবে না।

সুভাষ তার প্রত্যুত্তরে লিখলেন, দশ বছর কেন, যদি আমরা উপযুক্ত মূল্য দিতে পারি তাহলে তার আগেই আমরা স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে পারব। সেই মূল্য হচ্ছে আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার। কেবল এবং দুঃখবরণের ভিত্তিতেই জাতীয় স্বাধীনতার সৌধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যদি আমরা স্বার্থের পিছনেই ছুটে চলি, চাকরির খুঁটি আঁকড়ে ধরে বসে থাকি তাহলে পঞ্চাশ বছরেও আমরা আমাদের স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে পারব না। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ প্রত্যেক পরিবারকে আজ দেশমাতার চরণে কিছু না কিছু অর্ঘ্য এনে দিতে হবে।

মেজদা একবার লেখেন, দেশে ফিরে এসে পদত্যাগ করবে।

কিন্তু সুভাষ তার উত্তরে জানান, প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করার কাজটিই হলো গোলামির প্রতীক। এবং এই কাজ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ছয় মাসের মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটবে। ঠিক সময়ে সাড়া না দেবার জন্য আন্দোলন দমে যেতে পারে। সুতরাং বর্তমান আন্দোলনের ঢেউকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করাই উচিত।

সিভিল সার্ভিস হতে সুভাষ তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠান ২২শে এপ্রিল। এই পদত্যাগপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে গেল ইণ্ডিয়া হাউসের সব লোক। তারা বলাবলি করতে লাগল, এর আগে আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে এভাবে পদত্যাগ করেনি।

পদত্যাগপত্র দাখিল করার দিনকতক পরেই বাড়িতে আর একখানি চিঠি লেখেন সুভাষ। তিনি লেখেন, একবার চাকরি মেনে নিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করলে তিন দিন বা তিন মাস করেন তাতে কিছু আসে যায় না। আমি বুঝেছি যে আপোষের মনোবৃত্তি

হীন বস্তু ও তাতে মানুষের অধঃপতন এবং আদর্শের হানি হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনের শেষের দিকে সরকারী উপাধির মুকুট পরে মন্ত্রীত্বের পদে বসেছেন তার কারণ তিনি এডমণ্ড বার্কের সুবিধাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। সুবিধাবাদের নীতি গ্রহণ করার মত মনের অবস্থা আমার নেই। আমাদের এক জাতি গঠন করতে হবে এবং হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আদর্শবাদ ছাড়া তা সম্ভব নয়।

আমার এখন এই বিশ্বাস জন্মেছে যে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবার সময় আজ এসেছে। তুচ্ছ চাপরাশী বা গভর্ণর যেই হোক না কেন, প্রতিটি সরকারী কর্মচারী তার কাজের ধারা ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের বুনিয়াদকে পাকা করবে। সরকারের অবসান ঘটাবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে সরকার থেকে সরে আসা।

এর আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে একখানি চিঠি লিখে তাঁর মনের কথা জানান সুভাষ। তার উত্তরে চিত্তরঞ্জন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও কাজকর্মের একটি পূর্ণ বিবরণ দেন। চিত্তরঞ্জন বলেন, রাজনৈতিক কর্মীর অভাব নেই সত্যি, কিন্তু আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মীর অভাব আছে।

চিত্তরঞ্জনের চিঠি পেয়ে মনে আরও জোর পান সুভাষ। তিনি আত্মীয়দের জানিয়ে দেন, দেশে ফিরবার পর আমার মনোমত কাজের অভাব হবে না।

সুভাষের বড়দাদা সতীশচন্দ্র তখন লণ্ডনে ব্যারিষ্টারি পড়ছিলেন। প্রথমে ইণ্ডিয়া অফিসের নির্দেশমত সিভিল সার্ভিসের সেক্রেটারী রবার্টস সাহেব পদত্যাগ প্রত্যাহার করতে বললেন সুভাষকে। পরে সহকারী ভারত সচিব স্যার উইলিয়াম ডিউক-ব্যাপারটা সতীশচন্দ্রকে জানালেন এবং তাঁর মাধ্যমে সুভাষকে অনুরোধ করলেন। কেম্ব্রিজের লেকচারাররাও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করল সুভাষকে। চারিদিক হতে চাপ আসতে লাগল।

একবার সিভিল সার্ভিসে শিক্ষানবীশদের জন্য ছাপা কতকগুলি নির্দেশ নিয়ে সিভিল সার্ভিসের সেক্রেটারী রবার্টসের সঙ্গে ঝগড়া হয় সুভাষের। এই সব নির্দেশের একটিতে শিরোনামা ছিল, 'ভারতে অশ্বের পরিচর্যা' তাতে লেখা ছিল, ভারতে ঘোড়ায় যা খায় সহীসরাও তাই খায়। আরও লেখা ছিল, ভারতে ব্যবসায়ীরা অসাধু একথা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে পড়েছে।

এই অপমানজনক উক্তি দুটি দেখে ভীষণভাবে রেগে যান সুভাষ। এই উক্তি দুটির প্রতি সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে পদত্যাগের ব্যাপার নিয়ে সেক্রেটারী রবার্টসের সঙ্গে দেখা করতে তিনি জানান, কর্তৃপক্ষ ঐ অপমানজনক নির্দেশগুলি সংশোধনের আশ্বাস দিয়েছেন।

রবার্টস তখন অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করলেন সুভাষের সঙ্গে। অনেক করে বোঝালেন। আপাততঃ চাকরিটা হাতে নিয়ে পরে না পোষালে ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তার আগেই সব ঠিক করে ফেলেছেন সুভাষ। তাই রবার্টসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

॥ চার ॥

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কেম্ব্রিজে দর্শনে ট্রিপস পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে থাকেন সুভাষ। পরের বছর জুন মাসে পরীক্ষা। ইচ্ছা, এ পরীক্ষায় পাশ করে ওখানকার বি, এ ডিগ্রী লাভ করবেন। সিভিল সার্ভিসে যোগদান করবেন না তা তিনি জানতেন। তাই লেখাপড়ার দিক থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন আরও কিছুটা।

কিন্তু পড়তে গিয়ে পড়ায় ঠিকমত মন দিতে পারেন না সুভাষ।

সিভিল সার্ভিস চাকরি ছাড়া ও বিয়ে না করার অটল সংকল্প গ্রহণ করেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না তাঁর মন। কেবলি ভাবতে থাকেন, সত্যিকারের কাজের কাজ কি করবেন। কিভাবে সার্থক করে তুলবেন জীবনকে। দেশসেবার বিরাট যজ্ঞে কিভাবে আত্মাহুতি দেবেন।

দিনে দিনে দিন যায়। আত্মার নৈবেদ্য সাজিয়ে মহা প্রতীক্ষায় বসে থাকেন সুভাষ। সেবাযজ্ঞের ঋত্বিক খুঁজতে থাকেন। ১৯২১ সাল আসতেই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেশজোড়া অসহযোগ আন্দোলনে ফেটে পড়ে সারা ভারতবর্ষ। সেই আন্দোলনের অজস্র ঢেউ যেন সাত সমুদ্র পার হয়ে আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে সুভাষের সামনে।

ইংলণ্ডে পড়াশুনোর কাজে ব্যস্ত থাকলেও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছিলেন সুভাষ। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন সুভাষ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য জাতীয়তাবাদী দল। এই দলের মধ্যে চরমপন্থী ও নরমপন্থী নামে দুটি গোষ্ঠী বেশ কয়েক বছর ধরে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সুভাষের শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি কংগ্রেসের বামপন্থী বা চরমপন্থী দলের উপরেই বরাবর বেশী। কারণ এই দলই দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আরও বলিষ্ঠ ও আপোষহীন সংগ্রামের পক্ষপাতী। তাছাড়া এই বামপন্থী দলের সমাজবাদী নীতির প্রতিও পূর্ণ সমর্থন আছে সুভাষের। এই দল চায় সব রকমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদের বিলোপ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের অবসান আর দেশের সমস্ত কৃষক ও শ্রমিকদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা। এই সব বিষয়ে কংগ্রেসের নরমপন্থীদের নেতা মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব আপোষমূলক ছিল। ১৯০৯ সালে চরমপন্থীরা দল থেকে বেরিয়ে আসেন, পরে ১৯১৮ সালে চরমপন্থীরা হন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তখন নরমপন্থীরা

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে অল ইণ্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশান প্রতিষ্ঠা করেন।

যাই হোক, জাতীয় কংগ্রেসই দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল এবং সমগ্র দেশ ও সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই সুভাষের। কর্মপন্থার দিক থেকে জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হলেও তার নীতি ও আদর্শ এক এবং মহাত্মা গান্ধী তার অবিসংবাদী নেতা এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই তাঁর।

মহাত্মা গান্ধীই ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে দুই দলের মধ্যে একটা মিটমাট করেন। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত স্মৃতি প্রতিটি দেশবাসীর মনে তখনও জ্বলছে। নিপীড়িত জনগণের মর্মভেদী আর্তনাদে দেশের আকাশ বাতাস তখনও ভরে আছে। তবু মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কেন যে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন সমর্থন করে ও ভারত সচিব মন্টেগুর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এক প্রস্তাব পাশ করলেন তা বুঝতে পারলেন না সুভাষ। চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি বাংলার নেতাগণ বিরোধিতা করেন এই প্রস্তাবের। কিন্তু সে বিরোধিতা তাঁদের টেকেনি।

মহাত্মা গান্ধী বললেন, এখন আমাদের কর্তব্য এই নতুন ভারত শাসন আইনে যেটুকু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে তার বিরোধিতা না করে তাকে কার্যকরী করে তুলতে সহায়তা করা।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নীতি যে ভুল তা মাস কয়েকের মধ্যেই প্রমাণিত হলো। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি দেখা গেল যে সব আশা করে বৃটিশ সরকারের নতুন ভারত শাসন আইন সমর্থন করেছিলেন গান্ধীজী, সে সব আশা তাঁর একটিও পূরণ হল না। জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দায়ী পুলিশ ও আদেশদানকারী অফিসারদের কোন শাস্তি দেয়া হলো না। বরং

তাদের অনেককে পুরস্কৃত করা হলো। প্রায় সকলেই কাজে বহাল রইল। যাদের বরখাস্ত করা হলো তাদেরও ভারতীয় রাজস্ব থেকেই বৃত্তি দেয়া হতে লাগল।

মহাত্মা গান্ধী আরও আশা করেছিলেন, বৃটিশ সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে বলেই তারা ভারত শাসন আইনে কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছে ভারতকে। কিন্তু পরে দেখলেন তাও ভুল। আসলে উপরে এক মিথ্যা স্বায়ত্তশাসনের ছলনাজাল বিস্তার করে মূল ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখে দিয়ে পুরোদমে দেশকে শোষণ করে যেতে লাগল বৃটিশ সরকার। তাই তাঁর যে সাপ্তাহিক পত্রিকায় একদিন ১৯১৯ এর ভারত শাসন আইনকে সমর্থন করে বৃটিশকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন গান্ধীজী, ১৯২১ সালে সেই পত্রিকাতেই বৃটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেন। শুরু করেন অসহযোগ আন্দোলন। তাঁর এই প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধটিকে রাজদ্রোহিতার পরিচায়ক বলে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করে বৃটিশ সরকার। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে ব্রুমফিল্ড নামে একজন ইংরেজ বিচারপতি তাঁর বিচার করেন। কেন তিনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছেন একটি বিবৃতিতে তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন গান্ধীজী।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে নেতৃত্ব করছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু এই আন্দোলনে, আরও অনেক সুযোগ্য কর্মী দরকার। সব কিছু লক্ষ্য করে দেশবন্ধুর কাছে একখানি চিঠি পাঠালেন সুভাষ। জানালেন, তাঁর কেম্ব্রিজে পড়া শেষ হয়ে গেলেই তিনি দেশে গিয়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে দেশের সেবা করতে চান।

সুভাষ লিখলেন, আপনি আজ বাংলা দেশে আমাদের সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আজ আমি উপস্থিত হয়েছি আমার যৎসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে। মাতৃভূমির

চরণে উৎসর্গ করবার আমার বিশেষ কিছুই নেই। আছে শুধু আমার মন আর এই তুচ্ছ শরীর।

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সবচেয়ে ভাল জানেন। শুনলাম আপনারা কলকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ স্থাপন করেছেন। ইংরাজি ও বাংলায় স্বরাজ পত্রিকা বার করতে চান। আরও শুনলাম বাংলাদেশের নানা জায়গায় গ্রাম্য সমিতিও স্থাপন করেছেন। আমি জানতে চাই আপনারা আমাকে এই স্বদেশসেবার ক্ষেত্রে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি না থাকলেও যৌবনোচিত উৎসাহ আছে। আমি অবিবাহিত। আমি বিশ্বাস করি আমি নিজে এ কাজে নামলে আমি এখানকার দুই একজন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে টানতে পারব।

এখন আমাদের দেশে কোন কোন বিষয়ে কাজ আরম্ভ করবার সুযোগ সুবিধা আছে তা এখান থেকে বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় দেশে ফিরলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা—এই দুটো কাজেই হাত দিতে পারব।

কংগ্রেস সম্বন্ধে আমার অনেকগুলো প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আড্ডা চাই। তার জন্য একটা বাড়ি তৈরী করা চাই। দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার জন্য বাঁধাবাঁধি ভাবে স্থায়ী একদল লোক থাকা দরকার। তারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াবে ঘুরে ঘুরে। সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে কংগ্রেস কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করবে।

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি কি তা এখনও ঠিক করা হয়নি। ভোটাধিকার সম্বন্ধেও কংগ্রেসের মত এখনও স্পষ্ট নয়। কংগ্রেসের মধ্যেও একটা গুপ্তচর বিভাগ খোলা দরকার। তারাও ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াবে। প্রচার বিভাগ থেকে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে। দেশের

বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে বিনামূল্যে তা বিতরণ করতে হবে জনসাধারণের মধ্যে। হয়ত খুব বেশী লিখে ফেললাম। আমার বহুভাষিতা ক্ষমা করবেন। আশা করি যথাশীঘ্র উত্তর দেবেন। আমার প্রণাম জানবেন।

১৯২১ সালের ২রা মার্চ আর একখানি চিঠি লেখেন চিত্তরঞ্জনকে। এই চিঠিখানিতে কি ধরণের কাজ করার যোগ্যতা তাঁর আছে সে বিষয়ে খোলাখুলিভাবে জানান সুভাষ। তিনি লেখেন, আমার নিজের কতকগুলো মতলব মনে আসছে। আপনাকে তা জানাচ্ছি। জাতীয় কলেজে আমি শিক্ষকতা করতে পারি। পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রে আমার কিছু পড়াশুনা আছে। আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরাজিতে প্রকাশ করেন তাহলে আমি তার সহ-সম্পাদকের কাজ করতে পারি। আপনারা যদি কংগ্রেসের কোন গবেষণা বিভাগ খোলেন তাহলে আমি তাতেও কাজ করতে পারি।

মুদ্রা ও তার আন্তর্জাতিক বিনিময় সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট নীতি নেই। শ্রমিক ও কারখানা আইন সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কোন নীতি নেই। দরিদ্র এবং তাদের সাহায্যের ব্যাপারেও কংগ্রেসের কোন নীতি নেই। তারপর 'স্বরাজ' পেলে আমাদের সংবিধান কি রকম হবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট নীতি নেই। কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা এখন পুরনো হয়ে গেছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের সংবিধান তৈরী করতে হবে।

আপনি অবশ্য বলতে পারেন, কংগ্রেস এখন বর্তমানের অবস্থা ভাঙ্গতে ব্যস্ত। সুতরাং ভাঙ্গার কাজ সম্পূর্ণ না হলে গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করতে হবে। জাতীয় জীবনের যে কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা নীতি ঠিক করতে

গেলে অনেকদিনের চিন্তা ও গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি পূর্ণ কার্যসূচী তৈরী করতে পারে তাহলে যেদিন আমরা স্বরাজ পাবো সেদিন কোন বিষয়ে কোন নীতির জন্য ভাবতে হবে না।

দেশের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও তার প্রকাশেরও একটা বিভাগ থাকা চাই। যেমন গত দশ বছরে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব এবং কোন রোগে কতজন মরেছে তার একটা বিবরণ। তারপর গত দশ বছরে কোন কোন দিক থেকে কি কি আয় ও ব্যয় হয়েছে তার একটা হিসাব। জাতীয় জীবনের এই সব বিভিন্ন খবরগুলো ভিন্ন ভিন্ন বইয়ে প্রকাশ করতে হবে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাও দরকার। তারপর আছে সমাজসেবা।

আমার নিজের মনে হচ্ছে এই কয় বিষয়ে আমার কাজ করার সুবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে ঠিক করতে হবে, আপনি আমাকে কোন বিভাগে চান। তবে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা বোধ হয় আমার মনের মত কাজ হবে। এই নিয়ে আমি এখন কাজ আরম্ভ করতে পারি। তারপর সুবিধামত অন্য কাজেও হাত দিতে পারি। আমার পক্ষে চাকুরী ছাড়া মানে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা। সুতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। খাওয়া পরা চললেই আমার যথেষ্ট হবে।

স্বদেশ সেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাতে বঙ্গ-দেশের প্রধান পুরোহিত। আমার যা বক্তব্য আমি তা শেষ করেছি। এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন।

কেম্ব্রিজের পড়া শেষ করে দেশে ফিরে এলেন সুভাষ। ১৯২১

সালের ১৬ই জুলাই নামলেন বোম্বাই-এ। পথে জাহাজে আসবার সময় ঢেউএর উপর জাহাজের ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে আশা নিরাশার এক বিপুল দ্বন্দ্বে সমস্ত মনটা দুলেছে তাঁর। আনন্দ ও আশংকার কম্পিত উত্তেজনায় শিউরে উঠেছে সারা দেহ। জীবন ও যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে যে ব্রত গ্রহণ করতে চলেছেন তিনি, শেষ পর্যন্ত সে ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারবেন তো।

জাহাজ থেকে নেমেই সুভাষ দেখা করতে ছুটলেন অসহযোগ আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। বৃটিশ সরকারের প্রতি আপোষমূলক মনোভাব থাকা সত্বেও দেশজোড়া এক অহিংস বিদ্রোহ সংগঠন করে তখন বেশ নাম করেছেন গান্ধীজী। ১৯১৪ সালে দেশে ফেরার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সত্যাগ্রহ করে সফল হয়ে ভারতে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করেন তার। অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, আইন অমান্য, গণপ্রতিরোধ প্রভৃতি আন্দোলনের ধারাগুলি আসলে সত্যাগ্রহেরই বিভিন্ন রূপ। সত্যাগ্রহের প্রকৃত অর্থ হলো সত্যে আগ্রহ এবং এই সত্য রক্ষার জন্য অহিংস ও শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম। কিন্তু এ এক অদ্ভুত সংগ্রাম। এ সংগ্রামে কোন রকমের হিংসা প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার বিন্দুমাত্র চিন্তাকেও প্রশ্রয় দেয়া হয় না এ সংগ্রামে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার আগে অনেকে রাজভক্ত বলত গান্ধীজীকে। কিন্তু বৃটিশ সরকারের রাওলাট আইন নামে আইন-বিরুদ্ধ আইন পাশ ও পাঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচার বেশ কিছুটা শক্ত ও বিদ্রোহী করে তোলে গান্ধীজীর নরমপন্থী মনটাকে। রাওলাট আইন পাশ হবার আগেই তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পরেও যিনি ১৯১৯ সালের অমৃতসর কংগ্রেসে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলে

কংগ্রেসকে নিজের মতে টেনে আনেন পরের বছর তিনিই আবার বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক বিরাট বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য শক্তি সংগ্রহ করতে থাকেন। যে কোন রকমের ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য দেহ-মনকে আশ্চর্যভাবে তৈরী করে তুলেছেন তিনি। আফ্রিকা থেকে আসবার সময় তাঁর ভক্ত অনুরাগীর একটা দল আসে তাঁর সঙ্গে। দেশে আসার পর থেকে দু বছরের মধ্যে আরও অনেক ভক্ত অনুরাগী তিনি লাভ করেছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ নেতৃত্ব অধিকার করতে পারার জন্য আরও বন্ধু তিনি লাভ করতে চান।

যাই হোক ভারতের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক দলের সর্বপ্রধান নেতার সঙ্গে দেখা করা দরকার সুভাষের। তখন কংগ্রেসে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ অনুরাগী ও বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন গুজরাটের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, দিল্লীর ডাক্তার কে, এম, আন্সারি, পাটনার ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, লাহোরের মহম্মদ আলম ও সর্দার শার্দুল সিং, এলাহাবাদের পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মাদ্রাজের রাজাগোপালাচারী, নাগপুরের শ্রীঅভয়ঙ্কর, বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও কলকাতার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, করাচীর জয়রামদাস দৌলতরাম। এদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলালের জনপ্রিয়তাই ছিল সবচেয়ে বেশী।

যেদিন বোম্বাইএ নামলেন জাহাজ থেকে সেইদিন বিকালেই গান্ধীজীর সঙ্গে মণিভবনে দেখা করতে গেলেন সুভাষ। বোম্বাইএ সাধারণতঃ ঐ বাড়িতেই থাকতেন গান্ধীজী। সুভাষ ভাবলেন, যে আন্দোলনে তিনি যোগ দিতে যাচ্ছেন সে আন্দোলনের নেতার সঙ্গে তাঁর প্রথমে পরিচিত হওয়া দরকার। তাছাড়া দেশ বিদেশের বিপ্লবী নেতাদের কথা পড়ে তাঁদের সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মেছে। এখন গান্ধীজীর সঙ্গে ঐ সব বিপ্লবী নেতাদের পার্থক্য কোথায় তা জানতে চান সুভাষ।

মণিভবনে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে কার্পেটে মোড়া একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো সুভাষকে। ঘরের মাঝখানে দরজার দিকে মুখ করে বসে কথা বলছিলেন গান্ধীজী সহকর্মীদের সঙ্গে। সুভাষ দেখলেন, সকলেরই পরণে ঘরে তৈরী খাদি। তা দেখে নিজের বিদেশী পোষাকের জন্য লজ্জিত হলেন এবং তার জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

প্রাণখোলা হাসি হেসে সুভাষকে অভ্যর্থনা জানালেন গান্ধীজী। এবার শুরু হলো আলোচনা। গান্ধীজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা আর তার রূপায়ণ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চেয়েছিলেন সুভাষ। জানতে চাইলেন, ধাপে ধাপে কেমন করে বিদেশী আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবেন। এজন্য একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে গান্ধীজীও তার উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন। এই সব প্রশ্নের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাত্র তিনটি প্রশ্ন।

গান্ধীজী বললেন, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস সংগ্রাম ধাপে ধাপে চলবে এবং শেষ ধাপ হচ্ছে করবন্ধ। সুভাষ জানতে চাইলেন, কংগ্রেসের কার্যকলাপ আন্দোলনের শেষ ধাপ করবন্ধে কবে পরিণত হবে। এটা হলো প্রথম প্রশ্ন।

সুভাষের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, কেবলমাত্র করবন্ধ বা আইন অমান্যের দ্বারাই কি বৃটিশ সরকারকে আমাদের হাতে স্বাধীনতা দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করা সম্ভব হবে?

নাগপুর কংগ্রেসের পর হতে গান্ধীজী বলে আসছিলেন, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যাবে। সুভাষের তৃতীয় প্রশ্ন হলো, মহাত্মা কেমন করে বা কোন যুক্তির উপর ভিত্তি করে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, তাঁর অহিংস আন্দোলনের প্রথম ধাপে তিনি বেশই সাড়া পেয়েছেন। এক কোটি সদস্য আর

এক কোটি টাকার জন্য যে আবেদন জানিয়েছিলেন দেশে তাতে তিনি সন্তোষজনক সাড়া পেয়েছেন। এখন চলছে পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ বিদেশী কাপড় বর্জন আর হাতে কাটা খাদির প্রচার। কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজকর্ম সফল হতে চলেছে। বিদেশী পণ্য বর্জনের অভিযান ভালই চলছে। এতে সরকার ক্রমশঃ রেগে গিয়ে কংগ্রেসীদের দমন করবার চেষ্টা করবে আর তখনই আসবে আইন অমান্য করবার সময়। তখন কংগ্রেস কর্মীরা দলে দলে আইন অমান্য করে সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করে কারাবরণ করবে। ফলে জেলগুলো সব ভর্তি হয়ে যাবে অল্পদিনের মধ্যে। সেখানে আর তিল ধারণের স্থান থাকবে না। আর তখনই আসবে আন্দোলনের শেষ পর্যায় অর্থাৎ করবন্ধ।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন সুভাষ। কিন্তু পরের দুটি প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রসঙ্গে সুভাষ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মনে করেন, বিদেশী কাপড় বর্জনের ফলে ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে এমন সংকট সৃষ্টি হবে যে ভারতের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীসভাতে চাপ দেয়া হবে?

গান্ধীজী বললেন, না আমি তা মনে করি না।

কিন্তু তিনি কি মনে করেন তা খুলে বললেন না। সুভাষের মনে হলো, গান্ধীজী হয়ত বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয়ের পরিবর্তন আশা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ক্রমাগত এইসব অহিংস আন্দোলনের ফলে সরকার ভারতের জাতীয় দাবীগুলি মেনে নেবেন।

তাঁর তৃতীয় প্রশ্নটির ঠিকমত জবাব পেলেন না সুভাষ। গান্ধীজী পরিষ্কারভাবে বললেন না, কি ভাবে ভারত এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ পাবে।

যাই হোক ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর বেরিয়ে এলেন সুভাষ।

তাঁর বিদায় নেবার সময় গান্ধীজীই বলে দিলেন, কলকাতায় গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করবে। তিনিই তোমায় পথ বলে দেবেন।

কলকাতায় এসে সুভাষ দেখলেন, এখানেও অসহযোগ আন্দোলনের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে ত্রিবিধ বর্জনের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্কুল কলেজ বয়কট, সরকারী অফিস আদালত বয়কট ও বিদেশী কাপড় ও পণ্য বর্জন—এই ত্রিবিধ বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী উপাধি ত্যাগের কথাও ছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থাকতেন তাঁর রসা রোডের বাড়িতে। তাঁর মনের কথা পর পর দুখানি চিঠিতে এর আগেই জানিয়ে দিয়েছেন সুভাষ। তাঁর নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছেন। এখন বাকি শুধু সামনা সামনি একবার দেখা হওয়া আর প্রত্যক্ষভাবে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা।

একদিন সকালে দেশবন্ধুর রসা রোডের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন সুভাষ, দেশবন্ধু বাড়ি নেই। দূর গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের কাজে গেছেন, এখন ফিরতে কিছুদিন দেরী হবে।

হতাশ হয়ে ফিরে এসে প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রইলেন। তারপর একদিন শুনলেন, দেশবন্ধু এসে গেছেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ছুটে গেলেন সুভাষ। দেশবন্ধুর সুযোগ্য সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী পরম স্নেহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন সুভাষকে, সুভাষ যেন তাঁদের কতকালের চেনা, যেন কত আপন জন।

এর আগে দেশবন্ধুর কাছে আর একবার এসেছিলেন সুভাষ। এসেছিলেন আইনের পরামর্শ নিতে। সে অনেক দিনের কথা। সুভাষ তখন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কৃত হয়েছেন। আর দেশবন্ধু তখন ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের সবচেয়ে নামকরা ব্যারিষ্টার যিনি প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা রোজগার করতেন এবং খরচ

ও দান করতেন প্রচুর। কিন্তু এখন আর সে চিত্তরঞ্জন দাশ নেই। এখন তিনি হয়েছেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এখন তিনি আর সেই বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ও বিলাসী বাবু নেই; এখন তিনি অসহ-যোগ আন্দোলনের একজন নেতা। দেশের কাজে নিবেদিতপ্রাণ এক ত্যাগী কর্মী।

এখন আইন ব্যবসায় ছেড়েছেন। রাজ ঐশ্চর্য ত্যাগ করেছেন। এখন সমস্ত সম্পত্তি জাতিকে দান করে রাজনৈতিক কাজে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দেবার জন্য উদ্যত হয়েছেন।

সুভাষকে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে স্নেহের সঙ্গে কাছে বসিয়ে সব কথার উত্তর দিলেন। এক নজরে সুভাষের অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড কর্মশক্তির পরিমাণ বুঝে নিলেন। এদিকে দেশবন্ধুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ দেখে সমুদ্রের উদ্বেল বুকের মত সুভাষের সমস্ত হৃদয় লাফিয়ে উঠল আনন্দে। যে নেতাকে এতদিন তাঁর মনপ্রাণের সমস্ত আকুলতা দিয়ে খুঁজে চলেছিলেন তিনি এই সর্বত্যাগী মহান পুরুষই হচ্ছে সেই নেতা।

তখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে দেশের বহু ছাত্র স্কুল কলেজ বয়কট করেছিল। তাদের পড়াশুনোর জন্য দেশের নানা জায়গায় কলেজ ও বিদ্যালয় খোলা হচ্ছিল। পাঞ্জাবে এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন লালা লাজপৎ রায়। বাংলা দেশেও এই ধরণের এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা মনে মনে ভাবছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সুভাষের জ্ঞানের গভীরতা ও কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁরই উপর এ কাজের ভার দিলেন চিত্তরঞ্জন। এ কাজ করতে গিয়ে ছাত্র ও যুবকদের এক সংস্থা গড়ে তুললেন সুভাষ।

মদ, বিদেশী কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ বর্জনের জন্য কংগ্রেস-সেবীরা সারা দেশময় প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। জনগণও বেশ সাড়া দিয়েছিল সে প্রচারে। ১৯২১ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে

লোকমান্য তিলকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিদেশী কাপড় পোড়ানোর এক বিরাট উৎসব চলল সারা দেশে।

কংগ্রেসের নেতারা বললেন, বিদেশী কাপড় পোড়ানোর ব্যাপারটা প্রতীক মাত্র। আসলে আমরা পোড়াচ্ছি আমাদের জাতীয় চরিত্রের যত সব দুর্বলতা আর কলুষ।

এই আন্দোলনকে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ও সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি থেকেই ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের ব্যাপারে বৃটিশের উপর রেগে ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেবে মিত্রশক্তি, এই ছিল তাঁদের ভয়। তাঁরা আরও ভয় করেছিলেন তুরস্কের সুলতান যিনি ইসলাম ধর্মের গুরু খলিফা তাঁকে এশিয়া ও ইউরোপের রাজ্যগুলি হতে বঞ্চিত করা হবে এবং ইসলামের তীর্থস্থানগুলি অমুসলমানদের হাতে চলে যাবে। এইসব কারণে ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফৎ কমিটি করে আন্দোলন করতে থাকেন। তাঁদের দাবী ছিল, এসিয়া মাইনর ও থ্রেস তুরস্ককে ফিরিয়ে দিতে হবে, তীর্থস্থানগুলিতে সুলতানের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে হবে এবং মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীকে তুরস্কের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ করতে হবে।

এইসব দাবীর জন্য খিলাফৎ কমিটি বৃটিশ সরকারের মাধ্যমে বৃটিশ মন্ত্রীসভার উপর যখন চাপ দিতে থাকে তখন মহাত্মা গান্ধী তাঁদের সমর্থন করেন। ফলে এই সমর্থনের প্রতিদানস্বরূপ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনেও অকুণ্ঠভাবে যোগদান করেন ভারতীয় মুসলমানরা।

এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুটি ঘটনা হলো, বাংলা-আসাম রেল ধর্মঘট ও মেদিনীপুর জেলার করবন্ধ। এই দুটি ধর্মঘটই পরিচালিত হয় বাংলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে। এই রেল ধর্মঘট বাংলা ও আসামের সর্বত্র রেল ও ষ্টীমার চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেয়। এই ধর্মঘটের নেতৃত্বদান করতে

গিয়ে কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

এই সময় একই সঙ্গে চলতে থাকে মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন এ্যাডভোকেট বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। ১৯১৯ সালে বাংলা গভর্ণরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য স্যার সত্যপ্রসন্ন সিং (পরে যিনি লর্ড উপাধি পান) বাংলায় গ্রাম অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আইন পাশ করেন। এর ফলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। এই বোর্ডের সদস্যরা হবেন গ্রাম্য জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি।

কিন্তু এই আইনের উদ্দেশ্য যাই থাক, ফল কিন্তু ভাল হলো না। কারণ আসল ক্ষমতা রইল জেলা কর্তৃপক্ষ ও তার প্রতিনিধি সার্কেল অফিসারের হাতে। তাছাড়া এইসব বোর্ডের খরচপত্র চালাবার জন্য গ্রামবাসীদের উপর বসল অতিরিক্ত করের বোঝা। মেদিনীপুর জেলার জনগণ রুখে দাঁড়াল এই করের প্রতিবাদে। বাড়ি ও সম্পত্তি ক্রোক, গ্রেপ্তার, বিচার, পুলিশ ও সৈন্যদের অত্যাচার সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে সমস্ত জেলার লোক চালিয়ে যেতে লাগল এই আন্দোলন। অবশেষে ১৯২২ সালে সরকার বাধ্য হয় এই আইন প্রত্যাহার করতে।

এমন সময় একটি সরকারী ঘোষণায় জানা গেল যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত ভ্রমণে আসছেন ২১শে নভেম্বর। প্রথমে তিনি এসে উঠবেন বোম্বাই-এ। পরে তিনি দিল্লী ও কলকাতা যাবেন। তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য নাকি প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীদের বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য ভারতবাসীদের ধন্যবাদ জানানো।

কিন্তু এ সংবাদে বিন্দুমাত্র খুশি হলো না ভারতবাসী। গান্ধীজী বললেন, প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান ও সহযোগিতার জন্য পুরস্কার আমরা জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক

পেয়েছি। সুতরাং নতুন করে আর ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না।

তিনি ভারতবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন, যুবরাজের এই ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে কোন উৎসবে আমরা কোনরূপ যোগদান তো করবই না বরং ধর্মঘট প্রভৃতির দ্বারা বিরোধিতা করব।

ইংলণ্ডের ভাবী রাজা ও ভারতের সম্রাট বোম্বাই বন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে শুরু হলো ধর্মঘট। দিকে দিকে উড়ল কালো পতাকা। ২৫শে ডিসেম্বর তিনি এলেন কলকাতায়। আগের দিন একটি সরকারী নির্দেশে বলা হলো, সব সরকারী বাড়িগুলিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক উড়বে। কিন্তু পরের দিন সকালে দেখা গেল সর্বত্র উড়ছে কালো পতাকা। দেখা গেল সমস্ত মহানগরী শোকস্তব্ধ।

বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একনিষ্ঠ সহকর্মী সুভাষচন্দ্রও বসে ছিলেন না চুপ করে। এরই মধ্যে তিনি ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন এক বিরাট সেচ্ছাসেবক বাহিনী। তারা সাহসের সঙ্গে দিনরাত কাজ করে বেড়াতে লাগল।

কলকাতার শাসকগোষ্ঠী রেগে গেল দারুণভাবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ও সুভাষ-চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করল। অবৈধ ঘোষণা করল সুভাষের সেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে।

গ্রেপ্তারের সময় এক বিবৃতিতে দেশবন্ধু বললেন, আজ যখন গোটা ভারতবর্ষটাই এক প্রকাণ্ড কারাগারে পরিণত তখন আমি কারাগারের ভিতরে বা বাইরে থাকি, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি তা তোমরা জানতে চেয়োনা। তোমরা শুধু কাজ করে যাবে এবং কংগ্রেসের পতাকা উড়িয়ে রাখবে।

গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিচার হলো সুভাষের। রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হলেন তিনি। বিচারে ছয় মাস জেল হলো। তা শুনে সুভাষ বললেন, মাত্র ছয় মাস! আমি যা কষ্ট করেছি তার তুলনায় এ পুরস্কার খুবই কম।

এই হলো সুভাষের প্রথম কারাবরণ। কথাটা শুনে দুঃখিত হলেন জানকীনাথ। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের দ্বারা সুভাষকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার কোন চেষ্টাই করলেন না। তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন এক মনে। ছোটবেলায় সুভাষ ছিলেন ধর্মভক্ত। তাঁর গোপন যোগসাধনা, তীর্থস্থান ভ্রমণ ও ধর্মগত নানা আতিশয্যের জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ চিন্তায় পড়তে হতো তাঁকে। তবে তখন তাঁর সে চিন্তার একমাত্র কারণ ছিল সুভাষের পড়াশুনোর ক্ষতি। কিন্তু আজ সর্বোচ্চ সম্মানজনক শিক্ষা লাভ করেও সুভাষের এই পরিণতি দেখে দুঃখে মর্মাহত না হয়ে পারলেন না।

যাই হোক শরৎচন্দ্র-বসু সেদিন বাবাকে অনেক করে বোঝালেন। পার্থিব জীবনের সুখ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সুভাষ দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করলেও ভাবনার কিছু নেই। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, একদিন সারা দেশকে নেতৃত্ব দান করবেন তাঁদের সুভাষ। এইভাবে দেশের কাজ করে দেশজোড়া যে বিরাট খ্যাতি অর্জন করবেন সুভাষ, তা কি কোন পিতামাতার পক্ষে কম গৌরবের বস্তু!

অবশেষে শান্ত হলেন জানকীনাথ।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও বিদেশী বর্জন নীতি দেশের সাধারণ মানুষ মেনে নিলেও দেশের বুদ্ধিজীবি উদারপন্থীগণ ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বিরোধিতা করছিলেন দু দিক থেকে। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে শপ্রু, শীতলবাদ, শিবস্বামী আয়ার, যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি যেসব উদারবাদীরা অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশান প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা বরাবর ভারতসচিব মণ্টেগুর সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছিলেন। তাঁরা গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন

ও বিদেশী বর্জন নীতি কোনক্রমেই মানতে পারেননি। তাঁরা বলছিলেন, বিদেশের সব কিছুই খারাপ নয়, বিদেশের যা কিছু ভাল তা আমরা অবশ্যই নেব।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে ফিরে এলে উদারপন্থীরা তাঁকে ঘিরে ধরে। অসহযোগ আন্দোলনের ত্রুটিগুলি, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের কথা তাঁর কাছে তুলে ধরেন। তখন রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির ঐক্য সম্বন্ধে কলকাতায় এক ভাষণ দান করেন। কংগ্রেস রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে জোরাল যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করবার মত লোক খুঁজে পাচ্ছিল না।

এমন সময় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র 'সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দান করে এর জবাব দেন। তিনি বলেন, যদিও সব সংস্কৃতিরই একটা বিশ্বজনীন ভিত্তি আছে তবু প্রত্যেক দেশের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে যা তার জাতীয় প্রতিভার সৃষ্টি। ভারতকে তার নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা ও তার বিকাশ সাধন করতে হবে এবং তা করতে গিয়ে যদি বৃটিশ প্রভাবযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জন করতে হয় তাতে আপত্তির কিছু নেই।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর এর আগেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ যাতে আর বেশী আক্রমণ না করেন এজন্য তাঁর কাছে ছুটে গেলেন গান্ধীজী। কোন রকমে নিরস্ত করলেন তাঁকে।

এ দিকে বিপ্লবীরাও খুশি হন না গান্ধীজীর নীতিতে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হাজার হাজার যে সব বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, ১৯১৯ সালে তাঁদের মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে তাঁরা বলেন, কংগ্রেসের বৃটিশ তোষণনীতির বিরোধিতা করবেন তাঁরা ; আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যাবেন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিপ্লবীদের সঙ্গে গান্ধীজীর এক দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাতে মিটমাট হয় এবং বিপ্লবীরা কথা দেন, তাঁরা বিরোধিতা করবেন না। তখন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারা এই উপলক্ষে কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর বাড়িতে অতিথি হিসাবে বাস করছিলেন। এই সব নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটে সুভাষের। দেশবন্ধু ছাড়া তখন সেখানে ছিলেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায় ও মৌলানা মহম্মদ আলি।

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল বছর। স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল সারা বছরের ক্রমাগত সংগ্রাম। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতিশ্রুত স্বরাজের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। বৃটিশ শাসকদের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন বোঝা গেল না। গান্ধীজী বলেছিলেন, ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ না পেলে তিনি বেঁচে আছেন এটা ধারণাও করতে পারেন না। তিনি চান পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং তা যদি না প্যান তাহলে তিনি তাঁর আশ্রমের উপর বৃটেনের পতাকা ওড়াবেন।

গান্ধীজী তাঁর প্রতিশ্রুতিমত স্বরাজ দেশকে দিতে না পারলেও ১৯২১ সাল গান্ধীজীর অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৯১৯ সালে নাগপুর কংগ্রেসে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে গান্ধীজীকে যে মহাত্মা উপাধি দেয় সে উপাধির উপযুক্ত যোগ্যতার পরিচয় দেশকে এই বছরেই দান করেন গান্ধীজী। এই বছরেই কংগ্রেসকে তিনি একটি নতুন গঠনতন্ত্র ও জাতীয় ভিত্তি দান করেন। কংগ্রেস এর আগে বড় বড় বক্তৃতা ছাড়া কাজের কাজ কিছুই করেনি। গান্ধীজী এবার তাকে বৈপ্লবিক সংগঠনে পরিণত করে তাকে দিয়ে দেশজোড়া এক বিরাট আন্দোলন করিয়ে নেন। এই বছরেই লাল, সবুজ ও সাদা রঙের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা সারা ভারতে

গৃহীত হয়। পরে এই লাল রংটি ত্যাগের প্রতীক হিসাবে হলুদে পরিণত হয়।

॥ পাঁচ ॥

নতুন বছর যখন শুরু হলো সুভাষ তখন জেলে। নতুন বছরে চুপ করে বসে রইলেন না গান্ধীজী। জনগণের কাছে স্বরাজ দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারেননি। তার লজ্জা তিনি ভুলতে পারেননি।

নতুন বছরের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতের নতুন বড়লাট লর্ড রেডিংএর কাছে এক চূড়ান্ত পত্র পাঠালেন। তিনি জানালেন, সাত দিনের মধ্যে বৃটিশ সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তনের কোন লক্ষণ যদি দেখা না যায় তাহলে তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরাঞ্চলে গুজরাটের বারদৌলি মহকুমায় করবন্ধ আন্দোলন শুরু করবেন এবং অবিলম্বে এই আন্দোলন পড়বে সারা ভারতে ছড়িয়ে। জনগণ কোন রকমের কর সরকারকে দেবে না। এর আগে থেকেই বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে করবন্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিল। গুজরাটের বারদৌলিতে একবার আন্দোলন শুরু হলেই জ্বলে উঠবে সারা দেশ।

এক তপ্তনিবিড় উত্তেজনায় প্রহর গুণতে লাগল দেশের প্রতিটি মানুষ। কিন্তু সেই বহু-প্রতিক্ষিত প্রহর আর এল না। অন্য দিকে আর একটি ঘটনা ঘটে সব মাটি করে দিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক এক গাঁয়ের গ্রামবাসীরা রাগের মাথায় থানা আক্রমণ করে কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে এবং থানাটিকে জ্বালিয়ে দেয়।

গান্ধীজী তখন ছিলেন গুজরাটের বারদৌলিতে। এ খবর তাঁর কানে যাওয়ামাত্র মহা ভাবনায় পড়লেন তিনি। তিনি ভাবলেন এভাবে ঘটনাস্রোত এগোতে থাকলে তাঁর অহিংস আন্দোলন সহিংস সংগ্রামে পরিণত হবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভা ডেকে সারা দেশে আইন অমান্য -আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রস্তাবের আকারে পাস করিয়ে নিলেন। দেশের সব কংগ্রেস কর্মীদের শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজে আরও ব্যাপকভাবে যোগদান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। চরকা কাটা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদক দ্রব্য বর্জন অভিযান, শিক্ষাবিস্তার, সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচার প্রভৃতি গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই আপাততঃ তাঁরা করে যাবে দেশের সেবা।

কংগ্রেসের একটি অংশ বিদ্রোহী হয়ে উঠল গান্ধীজীর এই নির্দেশে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন আইন অমান্য আন্দোলনের অনুকূল তখন তিনি এভাবে কেন কণ্ঠরোধ করলেন আন্দোলনের, তা অনেকেই বুঝতে পারলেন না। সুভাষ তখন জেলে ছিলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। গান্ধীজীর সিদ্ধান্তে তিনি মর্মাহত হয়ে এক বিরাট চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায়ও তখন জেলে ছিলেন। তাঁরাও এতে রেগে গেলেন। এদিকে বারদৌলিতে করবন্ধ আন্দোলনও হলো না। সরকার আগের মতই অবাধে কর আদায় করে যেতে লাগল।

এ দেশে বড়লাট হয়ে আসার পর থেকেই গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার কথা ভাবছিলেন লর্ড রেডিং। অহিংস হলেও গান্ধীজীর সরকারবিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করলে জনগণের প্রতিক্রিয়া কি হবে সেই ভয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারছিলেন না। চৌরিচৌরার ঘটনার পর জনগণের

মনে গান্ধীজীর প্রভাব অনেকখানি কমে এসেছে ভেবে রেডিং ১০ই মার্চ গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন। বিচারে ছয় বছরের কারাদণ্ড হলো গান্ধীজীর।

সুভাষ তখন ছিলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সাধারণতঃ তখন কংগ্রেসকর্মীরা বৃটিশ আদালত বর্জন করায় গ্রেপ্তারের পর কোন উকিল দিয়ে মামলা চালাতেন না। ফলে অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিচার হয়ে যেত। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বিচারে দুই মাস দেরি করেন। পরে তাঁদের একই সঙ্গে ছয় মাস করে কারাদণ্ড হয়। তবে রায় দেবার আগে দেশবন্ধুকে বলা হয় যদি তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বারদৌলি প্রস্তাব মেনে নেন তাহলে মুক্তি দেয়া হবে তাঁকে। কিন্তু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কারাবরণ করে নিলেন দেশবন্ধু।

জেলের মধ্য থেকেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কোন পথে চলবে তা নিয়ে ভাবতে থাকেন দেশবন্ধু। অনেক ভাবার পর একটি পরিকল্পনা করে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই পরিকল্পনা হলো, বাইরের অসহযোগ আন্দোলন কেন্দ্রের ও বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভাগুলিতে ছড়িয়ে দেয়া। দেশবন্ধু দেখলেন অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসীরা আইন সভা বয়কট করায় অযোগ্য অকংগ্রেসীরা আইন সভার আসনগুলি ভর্তি করে সরকারকে অন্ধভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। ফলে সরকার দেশে বিদেশে প্রচার করে বেড়াচ্ছে তাদের দমনমূলক নীতি এই দেশেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সমর্থন করে যাচ্ছে। তাই দেশবন্ধু বললেন, আইন সভাগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও কংগ্রেস প্রতিনিধিরা ক্রমাগত প্রতিটি আইন সভাতে সরকারের সকল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে যাবে। এইভাবে আইন সভার বাইরে জনগণের অসহযোগ আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠবে।

এই বছরেই মে মাসে চট্টগ্রামে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের যে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তার সভানেত্রীরূপে দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তী দেবীও ঐ একই কথা বলেন। কিন্তু এই সময় কংগ্রেসের কোন কোন নেতা বিরোধিতা করতে থাকেন দেশবন্ধুর প্রস্তাবের।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশের পরিস্থিতি আইন অমান্য আন্দোলনের অনুকূল কিনা তা পর্যালোচনার জন্য এক কমিটি গঠন করে এই কমিটির সদস্যরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তাঁদের বিবরণ পেশ করবেন। তাঁরা আরও দেখবেন, কংগ্রেস এখন শুধুমাত্র গান্ধীজী প্রস্তাবিত গঠনমূলক কাজ নিয়েই থাকবে না দেশবন্ধু প্রস্তাবিত নতুন কায়দায় অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

সারা দেশ ঘুরে বিবরণ পেশ করার সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁ, এলাহাবাদের পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও বোম্বাইএর বিঠলভাই প্যাটেল দেশবন্ধুর পরিকল্পনা সমর্থন করলেন। অন্যদিকে দিল্লীর ডাক্তার এম, এ, আন্সারি, মাদ্রাজের কে, আর, আয়েঙ্গার ও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বিরোধিতা করলেন এ প্রস্তাবের।

গয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন বসার আগেই কমিটির বিবরণ প্রকাশ করা হলো।

দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষও জেল থেকে মুক্ত হলেন সেপ্টেম্বর মাসে। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই সুভাষ দেখলেন গোটা উত্তরবঙ্গের চারটি জেলা প্রবল বানে ভেসে গেছে। সারা বাংলা দেশের কংগ্রেসকর্মীরা ত্রাণকার্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে। সুভাষও সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণের কাজে বেরিয়ে পড়লেন। ছাত্র অবস্থায় কটকে থাকাকালে আর্তের সেবা কাজটি নিজে নিজেই শিখেছিলেন তিনি।

নভেম্বর মাসে লাহোরে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু বললেন, তিনি যে

স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করছেন তা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয়, দেশের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের জন্য।

এই মাসেরই শেষের দিকে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন বসল। এর পরের মাসেই গয়ায় বসবে প্লেনারি সেসনের বার্ষিক অধিবেশন। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনেই দেশবন্ধু ও গান্ধীজীর সমর্থকদের মধ্যে চলল এক কঠিন শক্তি পরীক্ষা।

এর পর গয়া অধিবেশনে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বহু বিতর্কের পর ভোটে দেয়া হলো দেশবন্ধুর প্রস্তাবটিকে। বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের বহু সদস্যের উপর দেশবন্ধুর প্রভাব ছিল। কিন্তু ভোটে দেয়ার পর দেখা গেল গান্ধীজীর সমর্থকরাই জিতে গেছেন। মাদ্রাজের আয়েঙ্গার ও রাজাগোপালাচারী প্রমুখ গান্ধীজীর গোঁড়া সমর্থকরা দেশবন্ধুর প্রস্তাবটির সরাসরি বিরোধিতা না করে বললেন, কংগ্রেসসেবীরা আইন সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে আসনগুলি দখল করবে, কিন্তু সভার কোন কাজে যোগ দেবে না। দেশবন্ধু দেখলেন, এটা একরকম তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা। কারণ আইন সভায় নির্বাচিত হয়েও প্রতিনিধিরা যদি সরকারের কাজকর্মের বিরোধিতা করতে না পারে তাহলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কোন অর্থ হয় না।

যাই হোক, গান্ধীজীর সমর্থকরা জয়ী হতেই দমে গেলেন দেশবন্ধু। অথচ সেই গয়া অধিবেশনের তিনিই সভাপতি। সভাপতি হয়েও সরকারী প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের ডেকে কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন দেশবন্ধু।

তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন, আপনি কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ছেড়ে দিন।

পণ্ডিত মতিলাল বললেন, আমরা নতুন পার্টি গড়ে তুলে নতুন ভাবে আন্দোলন শুরু করব।

সেইদিনই অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ঘোষণা করলেন তাঁরা স্বরাজ্য পার্টি গঠন করবেন। দেশবন্ধু কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ করলেন। গান্ধীজীর সমর্থকরা প্রথমে বেশ কিছুটা খুশি হলেও পরে মুষড়ে পড়লেন। দুই নেতার মধ্যে মতভেদ শেষকালে ভাঙ্গন নিয়ে আসবে দলের মধ্যে এটা তাঁরা চাননি, ভাবতেও পারেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোধ করতে পারলেন না এ ভাঙ্গন।

॥ ছয় ॥

তখন ১৯২৩ সাল। সুভাষের বয়স মাত্র পঁচিশ। গয়ার সেই ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশনে জীবনে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা অনুভব করলেন সুভাষ। কংগ্রেসের সদস্যপদ তিনি এর আগে পেলেও গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস অধিবেশনে সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ এই তাঁর প্রথম। অবশ্য দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইংরিজি পত্রিকা 'ফরওয়ার্ড'এর সম্পাদকরূপে এর আগে রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সুভাষ।

গয়া থেকে ফিরে এসে তাঁদের নতুন স্বরাজ্য পার্টি সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন সুভাষ। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমটায় দুর্বলতা অনুভব করলেও কাজের চাপে ভুলে গেলেন সে দুর্বলতার কথা। বাংলা ভাষায় চার পৃষ্ঠার আর একটি দৈনিক পত্রিকা বার করলেন। নাম দিলেন 'বাংলার কথা।' মাদ্রাজে রঙ্গস্বামী আয়ার তামিল দৈনিক 'স্বদেশমিত্রম' বার করলেন। পুণার প্রভাবশালী দৈনিক লোকমান্য তিলক প্রতিষ্ঠিত 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক কেলকারও স্বরাজ্য পার্টির সমর্থনে প্রচার শুরু করলেন।

এইভাবে সারা ভারত জুড়ে স্বরাজ্য পার্টির প্রাথমিক প্রচারের

কাজ শেষ হলেই এলাহাবাদে মার্চ মাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাড়িতে স্বরাজ্য দলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসলো।

এই অধিবেশনে স্বরাজ্য দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি এবং কি ধরনের স্বরাজ এই দল চায় তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। কংগ্রেস তখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। দলের যুবকগোষ্ঠী স্বরাজের সংজ্ঞা সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা চাইল নেতাদের কাছ থেকে। তখন নেতারা বললেন, আপাতত আমরা স্বরাজ বলতে বুঝি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। এতে সব বিতর্কের অবসান হলো।

এই অধিবেশনের পর নেতারা আপন আপন প্রদেশে ফিরে গিয়ে এক নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন। স্বরাজ্য দলের লোকেরা তখনও পর্যন্ত কংগ্রেস দল ত্যাগ করেননি। সুতরাং তাঁরা মাঝে মাঝে কংগ্রেসের তলবী সভা ডেকে কংগ্রেসের পরিবর্তন বিরোধী রক্ষণশীলদের শক্তি যাচাই করে দেখতে লাগলেন।

স্বরাজ্য দলের আদর্শ প্রচারের জন্য দেশবন্ধু এলাহাবাদ থেকে সোজা দক্ষিণ ভারতে চলে গেলেন। তখন মাদ্রাজ ছিল গান্ধীবাদের সব চেয়ে বড় ঘাঁটি। তাই সবচেয়ে আগে মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত গেলেন দেশবন্ধু।

তখন এপ্রিল মাস। দারুণ গরম পড়েছে। তবু সব কষ্ট অগ্রাহ্য করে ঘুরে ঘুরে প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন দেশবন্ধু। যেখানেই গেলেন সেখানেই প্রচুর সাড়া পেলেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এর শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

কলকাতায় ফিরে এসে দেশবন্ধু দেখলেন, সুভাষও চুপ করে বসে নেই। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনেক সাধারণ সদস্যকে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে পেরেছেন। তখন বাংলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি কিন্তু গোঁড়া গান্ধী সমর্থক বলে অটল রইলেন।

বছরের মাঝামাঝি অবস্থা স্বরাজ্য দলের অনুকূলে এল। দিল্লী

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্যপরিষদে গান্ধীবাদীরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়লেন। তবে স্বরাজ্য দলও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তৃতীয় দল এসে মিটমাটের চেষ্টা করতে লাগল। বাংলা দেশের কংগ্রেস কমিটিতেও গান্ধীবাদীরা হেরে গেলেন। কমিটির নতুন সভাপতি হলেন মৌলানা আক্রাম খাঁ। কিন্তু ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ সম্পাদকের পদ ছাড়তে রাজী না হওয়ায় দুটি কমিটিই এক সঙ্গে কাজ করে যেতে লাগল। পরে অবশ্য কার্যনির্বাহক কমিটির মধ্যস্থতায় আক্রাম খাঁর কমিটিই বহাল রইল।

সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজ্যপন্থীরা দেশবন্ধুর পরিকল্পনাটি আবার তুললেন। এই প্রস্তাবের জন্য গয়া কংগ্রেসে পরাজয় ঘটেছিল তাঁদের। দিল্লী অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তিনি সভাপতির ভাষণে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আইনসভার মধ্যে সংগ্রাম চালিয়া যাওয়ার জন্য দেশবন্ধুর নীতি সমর্থন করলেন। এইভাবে ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল দেশবন্ধুর সমর্থকের সংখ্যা। অবশেষে দেশবন্ধুর পরিকল্পনাকে সমর্থন করে এক প্রস্তাব গৃহীত হলো। তাতে আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে আইন সভার মধ্যে অনমনীয় দৃঢ় ও অবিচ্ছিন্নভাবে সরকারের বিরোধিতা করে যাওয়ার জন্য কংগ্রেস সদস্যদের অনুমতি দেয়া হলো।

স্বরাজ্যপন্থীদের জয় হলো। খুশি হয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু হাতে বেশী সময় নেই। নির্বাচনের আর মাত্র দুই মাস বাকি আছে। সভা সমিতি ও কাগজের মাধ্যমে ক্রমাগত নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন সুভাষ।

নির্বাচনের ফল খুবই ভাল হলো। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে নির্বাচিত আসনগুলি স্বরাজ্যপন্থীদের দখলে এল। যুক্ত-

প্রদেশে পণ্ডিত মতিলালের পরিচালনায় স্বরাজ্যপন্থীরা বিশেষ সাফল্য অর্জন করে।

এই বছরেই নাগপুরের এক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধীবাদীরা সফল হন। একবার নাগপুরের জেলা কর্তৃপক্ষ নাগপুর শহরের কোন এক বিশেষ রাস্তা দিয়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বহু লোককে পতাকা নিয়ে সেখানে পাঠানো হলো। এই নিষেধাজ্ঞাকে জাতীয় পতাকার অপমান বলে প্রচার করা হলো। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে দলে দলে অজস্র লোক এসে নিষেধ অমান্য করে কারাবরণ করতে লাগল। অবশেষে এ আদেশ তুলে নিতে বাধ্য হলো কর্তৃপক্ষ।

এই সময় গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বোম্বাইএ ডাঙ্গের নেতৃত্বে একটি সমাজতন্ত্রবাদী দল গড়ে ওঠে। সমাজতন্ত্র প্রচারের জন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকে এই দল। এই দলের লোকেরা বোম্বাইএর শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রের আদর্শে ক্রমশই সংগঠিত করতে থাকে এবং পরে এই দল কমিউনিষ্ট দল নামে পরিচিত হয়ে ওঠে দেশে। বোম্বাইএর দেখাদেখি বাংলা দেশের শ্রমিক ও কৃষক দল নামে সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী এক দল গড়ে ওঠে।

দেশের বুদ্ধিজীবিরা মুস্কিলে পড়লেন। জাতীয়তাবাদ ও সমাজ-বাদের আন্দোলন একই সঙ্গে চলতে পারে না, কারণ সমাজতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিকতা। যাই হোক দেশের বুদ্ধিজীবিরা তখন জাতীয়তাবাদের দিকেই বেশী ঝুঁকলেন। বললেন, আগে জাতীয় স্বাধীনতা তারপর যা হয় হবে। বোম্বাই শিল্পোন্নত অঞ্চল বলে সেখানে শ্রমিক বিক্ষোভ ছিল। তাই সমাজবাদী আন্দোলন সেখানে কিছুটা স্থান করে নিতে পারলেও দেশের সর্বত্র তখন জাতীয়তাবাদের ঢেউ প্রবল থাকায় অন্য কোথাও সুবিধে করতে পারল না সে আন্দোলন।

১৯২০ সালে দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল ও সুভাষের পরিচালনায় স্বরাজ্য দল দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেও এই বছরে কয়েকটি অশুভ ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এই বছরের গোড়ার দিকে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট তাঁর প্রথম বাজেটে লবণকর দ্বিগুণ করে দেন। এমনিতেই লবণ করের জন্য জনগণ অসন্তুষ্ট ছিল। প্রকৃতিদত্ত মাটি আর জল থেকে লবণ তৈরির অধিকার দেশের মানুষের জন্মগত। এই অধিকার হতে জনগণকে বঞ্চিত করার অধিকার কোন সরকারের নেই। তার উপর এই কর দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জনগণ।

এই বছরেই পাঞ্জাবের মূলতানে ও অমৃতসরে হিন্দু-মুসলমানে এক দাঙ্গা হয়। এর পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঞ্জিম ও তবলিঘ নামে এক আন্দোলন গড়ে তুলে মুসলমানদের এক বিশেষ সম্প্রদায়রূপে সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়। অন্য দিকে হিন্দুমহাসভাও হিন্দুদের সংগঠিত করে পাশাপাশি পাল্টা আন্দোলন শুরু করে। এইভাবে এই বছরেই প্রথম সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রথম মাথা তুলে উঠে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তিটাকে আঘাত হানতে শুরু করে।

কিন্তু এ বিরোধ বেশীদূর গড়াতে দিলেন না দেশবন্ধু। অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য হিন্দু-মুসলমান চুক্তির একটি খসড়া তৈরি করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বছর মাদ্রাজের অন্তর্গত কোকনদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন সে খসড়া অনুমোদন করেনি। করলে তার দ্বারা দূরদর্শিতারই পরিচয় দিত কংগ্রেস। দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত।

১৯২৪ সালের প্রথম দিকে কলকাতার পৌরসভার নির্বাচনে স্বরাজ্য দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেয়র ও সুরাবর্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হলেন। কিছু দিনের

মধ্যেই সুভাষচন্দ্র নিযুক্ত হলেন চীফ একজিকিউটিভ অফিসার বা পৌরশাসনের সর্বপ্রধান। সুভাষচন্দ্রের বয়স্ তখন মাত্র সাতাশ।

এত কম বয়সের লোকের হাতে এত বড় একটা গুরু দায়িত্ব দেবার বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি জানাল। কিন্তু সংবিধানগত কোন বাধা না থাকায় সে আপত্তি টিকল না। তাছাড়া দেশবন্ধুর একান্ত ইচ্ছা, এ দায়িত্বভার সুভাষকেই পালন করতে হবে।

ভালই কাজ করতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র। তার উপর দেশবন্ধু মেয়র থাকায় কোন বিষয়ে কোন অসুবিধাই হলো না। তখন পৌরসভার বিভিন্ন বিভাগের বড়কর্তারা ছিল ইংরেজ। তবু কোন অসুবিধা হলো না। তারা সুভাষচন্দ্রের অধীনতা মেনে চলল।

একের পর এক কাজ করে যেতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র। এতদিন পৌরসভা ছিল বিদেশী শাসকদের হাতে। কোন কাজ হয়নি। এখন পৌরসভার কর্তৃত্বভার হাতে পেয়ে সুভাষচন্দ্রের মনে হলো সমস্ত কলকাতাবাসীর সব অসুবিধা দূর করে দেবেন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দাতব্য হাসপাতাল খোলা হলো। বিনা মূল্যে গরীবদের দুধ দেবার জন্য দুধ সরবরাহের কেন্দ্র খোলা হলো। দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের নাম অনুসারে অনেক রাস্তা ও পার্কের নতুন নামকরণ করা হলো।

এতদিনে কলকাতার নাগরিকরা পৌরসভাকে নিজেদের জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলে ভাবতে শিখল। এই সময় শহরের জল নিকাশের সমস্যার সমাধানের জন্য উন্নত ধরনের পয়ঃপ্রনালীর এক পরিকল্পনা করা হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে।

এই বছরের প্রথম থেকেই জেলের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন মহাত্মা গান্ধী। ভারতের আইন সভায় স্বরাজ্য দল ছিল বেশ শক্তিশালী। মহাত্মাজীর মুক্তির দাবী করে স্বরাজ্য দল প্রস্তাবের নোটিশ দেয় আইনসভায়। ১২ই জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর অবস্থা খারাপের দিকে যায় এবং তাঁর উপর অস্ত্রোপচার করা হয়।

খবর পেয়ে ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির জন্য প্রবল দাবী জানাতে থাকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এর কিছুদিন পরেই ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গোপনে মুক্তি দেয়া হয় গান্ধীজীকে।

৮ই ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এক প্রস্তাব আনেন। পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গোল টেবিল বৈঠক আহূত হোক। আর এই শাসনতন্ত্র সংবিধানে রূপ দেয়ার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হোক।

সরকার তাতে রাজী হলো না। বলল, আমরা প্রথমে এক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করে দেখব, বর্তমান শাসনতন্ত্র অর্থাৎ ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে কোন ত্রুটি আছে কিনা।

ভারত সরকার এই তদন্তের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করল তার চেয়ারম্যান হলো তখনকার দিনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান আর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন উদারপন্থী কয়েকজন কংগ্রেস নেতা, যেমন এলাহাবাদের তেজবাহাদুর সপ্রু, মাদ্রাজের স্যার শিবস্বামী আয়ার, বোম্বাইএর মহম্মদ আলি জিন্না ও পুণার ডাক্তার পরাঞ্জপে।

তদন্তের পর কমিটি যে রিপোর্ট দিল তাতে দেখা গেল, কমিটির সদস্যরা সমগ্রভাবে স্বীকার করেছেন, শাসনতন্ত্র ও তার প্রয়োগে ঘোরতর ধরনের ত্রুটি আছে। তাঁরা ছোটখাটো কতকগুলো পরিবর্তনের সুপারিশও করেছিলেন।

স্বরাজ্য দল কিন্তু আইনসভায় মুডিম্যান কমিটির সঙ্গে কোন সহযোগিতা করল না। দলের নেতারা বললেন, এতে কোন কাজের কাজ হবে না। তখন স্বরাজ্য দল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে ক্রমাগত সরকারকে সব বিষয়ে বাধা দান করে যেতে লাগল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাধা দিয়ে বিশেষ কোন ফল হত

না। কারণ সেখানে বড়লাট তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে সভার যে কোন প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারতেন। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যরা সম্পূর্ণরূপে বড়লাটের অধীন ছিল। কিন্তু প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিতে হস্তান্তর বিভাগের মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী থাকায় এই বিভাগের বাজেটগুলি সভার সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাতিল করে দিতে পারতেন। বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে এইভাবে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার কাজ অচল করে দেয়া হয়েছিল। স্বরাজ্যদলের এই সাফল্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল জনগণের মধ্যে।

সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতা কর্পোরেশনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কয়েকটি মাস ধরে দেশের রাজনীতির ব্যাপারে কোন নজর দিতে পারেননি। কলকাতা পৌরসভা ও বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দল তখন সরকারকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চলেছে। এই আঘাত সুদূর বৃটেনে ইণ্ডিয়া হাউসেও গিয়ে পৌঁছেছে। এই সময় ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার বৃটেনে লর্ড সভায় স্বরাজ্যদলের উদ্ভব ও ক্রমোন্নতির কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারে জেনারেল ডায়ারকে সমর্থন করে লর্ড সভায় প্রস্তাব গ্রহণ, ১৯২২ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ কর্তৃক সিভিল সার্ভিসের প্রশংসা এবং ১৯২৩ সালে লবণ করের দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটনাগুলিই স্বরাজ্য দলকে আন্দোলনের পথে এগিয়ে দিয়েছে। এই সব ঘটনায় বৃটিশ শাসকদের অদূরদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু আইনসভার বাইরে তখন কোন আন্দোলন ছিল না। শুধু আইনসভার মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে আন্দোলন করে ইংরেজ সরকারকে তাড়ানো যাবে না। তাই নতুন আন্দোলনের পথ খুঁজছিলেন দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র।

এপ্রিল মাসে তারকেশ্বরের মন্দিরের মোহান্তদের মন্দির সংলগ্ন

স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে দেশজোড়া এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। সরকার মোহান্তদের সাহায্যে পুলিশ পাঠায় ও অনেককে গ্রেপ্তার করে। দেশবন্ধুর পুত্রও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। অবশেষে মন্দিরের মোহান্তরা দেশবন্ধুর সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়।

স্বরাজ্য দলের কাজকর্মে ক্রমশই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল বৃটিশ সরকার। সরকার আশা করেছিল মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে বেরিয়ে এসে নীতিগতভাবে বাধা দেবেন স্বরাজ্যপন্থীদের। উদারপন্থীরা তখন যোগ দেবেন তাঁর সঙ্গে। ফলে বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে স্বরাজ্যপন্থীরা।

কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে মহাত্মা গান্ধী কোন বাধা ত দিলেনই না উপরন্তু স্বরাজ্যদলের সঙ্গে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুললেন। গান্ধীজী ভুলতে পারেননি তাঁর মুক্তির জন্য এই স্বরাজ্যদলই জোর আন্দোলন করে এবং দেশের মধ্যে জন সমর্থনলাভ করে ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সুতরাং এই দলকে বাধা দেয়া দেশের জাতীয় আন্দোলনকেই বাধা দেয়া। তাই তিনি প্রকাশ্যে বললেন, আমার রাজনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে স্বরাজ্যপন্থীদের সামঞ্জস্য আছে। শিশু যেমন তার মাকে জড়িয়ে থাকে আমিও তেমনি স্বরাজ্যদলকে আঁকড়ে থাকব।

তার উপর বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ব্যাপারেও সরকার অত্যন্ত রেগে উঠেন। মাস কতক আগে গোপীনাথ সাহা নামে একজন বিপ্লবী কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ডে নামে একজন ইংরাজকে গুলি করে হত্যা করেন। হাইকোর্টের বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। বিচার চলার সময় এক বিবৃতি দেন গোপীনাথ। বলেন, আমি পুলিশ কমিশনারকেই হত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার জায়গায় অন্য একজনকে হত্যা করে ফেলায় আমি দুঃখিত এবং আমার জীবন দিয়ে সেই জীবনের

মূল্য পরিশোধ করতে পারায় আমি আনন্দিত। আমি আশা করি আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু হতে প্রতিটি ভারতবাসীর ঘরে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হবে।

গোপীনাথের ফাঁসির পর সারা বাংলা দেশে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সভা সমিতিতে বিপ্লবী গোপীনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলা কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ অধিবেশনেও এই ধরনের এক প্রস্তাব পাশ হয়।

আর চুপ করে সহ্য করতে পারল না সরকার। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে বাংলায় স্বরাজ্যপন্থী কংগ্রেসীদের গ্রেপ্তার করার এক পরিকল্পনা করল। বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল আটক রাখার জন্য ১৮১৮ এর ৩ নম্বর ধারা প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করল। এই পুরনো জরুরী আইনটি ২৪শে অক্টোবর রাত্রিতে বড়লাট ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ভোর থেকে কলকাতায় ও বাংলার বিভিন্ন জায়গায় স্বরাজ্যপন্থীদের গ্রেপ্তার শুরু হলো।

সেদিন কলকাতায় তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই তাঁকে খবর দেয়া হলো জনকতক পুলিশ অফিসার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। উপর থেকে নিচে নেমে আসতেই ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সুভাষচন্দ্রকে বললেন, মিষ্টার বোস, আমাকে খুবই একটা অপ্রীতিকর কাজ করতে হবে। ১৮১৮ এর ৩নং ধারা অনুসারে আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

এই কথা বলার পর আর একটি পরোয়ানা বার করে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বাড়ি তল্লাস করতে চাইলেন।

বাড়ি তল্লাস করে কয়েকটি চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। তবু নিজের গাড়িতে উঠিয়ে সুভাষচন্দ্রকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে গেলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। সেখানে গিয়ে সুভাষচন্দ্র দেখলেন আরও অনেককে তার মত গ্রেপ্তার করে

আনা হয়েছে। তখনও পর্যন্ত পৌরসভার চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাই পৌরসভার কাজকর্মের যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য সরকার হুকুম দিলেন ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত জেলে বসেই অফিসের কাজকর্ম করতে পারবেন। তাঁর সেক্রেটারি অফিসের ফাইলপত্র নিয়ে রোজ দেখা করতে পারবেন তাঁর সঙ্গে। তবে এই সময় একজন পুলিশ অফিসার উপস্থিত থাকবেন।

মাঝে মাঝে এক একজন পুলিশ অফিসার খুব অভদ্র ব্যবহার করত। সেজন্য রেগে যেতেন সুভাষচন্দ্র। তাকে তিরস্কার করতেন তীক্ষ্ণ ভাষায়। এজন্য সরকারের কাছে অভিযোগ করল সেই অফিসাররা। ক্রমাগত এই অভিযোগের ফলে সরকার শাস্তিস্বরূপ কলকাতা হতে বহরমপুর জেলে বদলি করল সুভাষচন্দ্রকে। সেখান থেকে নতুন বছরের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে আবার তাঁকে কলকাতায় আনা হলো।

কলকাতার কথা শুনে আশা হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের মনে। ভেবেছিলেন হয়ত বা মুক্তি আর দূরে নয়। সে আশা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। শুনলেন তাঁদের ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে পাঠানো হবে। রাতটা শুধু থাকবেন লালবাজার থানায়।

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। পৌরসভায় একজিকিউটিভ অফিসারের দায়িত্বভার নেবার পর থেকে রাজনৈতিক কোন আন্দোলনে ইচ্ছা থাকলেও যোগ দিতে সময় পাননি তিনি। তাঁকে গ্রেপ্তার ও দূর বিদেশের কারাগারে দীর্ঘদিন আটকের কোন সঙ্গত কারণ নেই। তাঁর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে এক তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়েছিল জনগণ। সরকারের হাতে কোন যুক্তি ছিল না। শুধু কয়েকজন পুলিশ অফিসারের কথামতই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কলকাতা হতে প্রকাশিত 'দি স্টেটসম্যান' ও 'দি ইংলিশম্যান' দুটি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে। এজন্য মানহানির মামলা করা হয় পত্রিকা দুটির বিরুদ্ধে।

ভারত সরকার বিব্রত হয়ে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু তখন ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়ী হওয়ায় নতুন ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারত সরকারকে সমর্থন করেন।

মাত্র একটি রাত। কারও সঙ্গে কোন দেখা সাক্ষাৎ হলো না। উপরন্তু এই বদলির ব্যাপার জনসাধারণ যাতে ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে তার জন্য বরাবর এক কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে যাওয়া হতে লাগল। রাতের অন্ধকার না কাটতেই কয়েকজন গাড়ি করে সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বন্দীদের নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘাটের কাছে বর্মাগামী জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু সামনের দিকে না নিয়ে গিয়ে নৌকো করে নদী দিয়ে খানিকটা ঘুরে জাহাজের পিছন দিক থেকে তাঁদের জাহাজের উপর তোলা হলো। তাঁদের কেবিনের সামনে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হলো।

সকাল নটা নাগাদ জাহাজ ছাড়ল। বাংলা পুলিশের সহকারী ইনস্পেক্টর-জেনারেল লোম্যানের উপর এই সব বন্দীদের বদলি কাজের ভার ছিল। লোম্যান চিনতেন সুভাষচন্দ্রকে। বেশ আলাপী ও মিশুকে লোক ছিলেন লোম্যান। তাঁর ব্যবহার ছিল খুব ভদ্র। সুভাষচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন তিনি। সময়ে সময়ে একসঙ্গে বসে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন।

রেঙ্গুনে গিয়ে জাহাজ থামল। রেঙ্গুন থেকে মান্দালয় কুড়ি ঘণ্টার পথ। কড়া পুলিশ পাহারা দিয়ে ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হলো বন্দীদের। সারারাত ট্রেন চলল।

শেষ স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাজধানী ও দ্বিতীয় বর্মী যুদ্ধের ঘটনাস্থল এই মান্দালয় একটি ঐতিহাসিক স্থান। তাছাড়া এই মান্দালয়ের জেলেই লোকমান্য তিলককে ছয় বছর ও লালা লাজপৎ রায়কে এক বছর আটক রাখা হয়েছিল। দুঃখের মাঝে এই সব কথা ভাবতে ভাল লাগছিল সুভাষচন্দ্রের।

সকাল হতেই মান্দালয় স্টেশন এসে গেল। সামনে নীল আকাশের দিগন্তে ফুটে উঠল মান্দালয় দুর্গের ছবি। দুর্গের ভিতরেই জেলখানা। টিনের চালওয়ালা কাঠের খুঁটি দিয়ে ঘেরা খাঁচার মত সেলগুলো। জেলের সুপারিন্টেডেন্ট ক্যাপ্টেন স্মিথ বন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন। তবে চীফ জেলার লোক বিশেষ সুবিধের নন।

চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি চলতে লাগল। ১৪ই মার্চ তারিখের এক পত্রে তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রকে লেখেন সুভাষচন্দ্র, কাউকে পত্র লেখা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার পক্ষে ; প্রায় একটা দুঃস্বপ্নের মত। দুঃস্বপ্ন বলছি এই কারণে যে, ডেমোক্লিসের তরবারির মত মাথার উপর সর্বদাই সেন্সর ঝুলছে যার স্বেচ্ছাচারিতা ভূতপূর্ব জারকেও সহজেই হার মানায়।

মান্দালয়ের জল হাওয়া কিন্তু মোটেই সহ্য হল না সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বাঙালী বন্দীদের। প্রায়ই হজমের গোলমাল চলতে থাকে। তাছাড়া পড়াশুনো ও নির্জন চিন্তায় ভরা মন্দ লাগে না জেলের দিনগুলো। মে মাসে একখানি চিঠিতে দিলীপকুমার রায়কে লেখেন সুভাষচন্দ্র, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের দেশের আর্টিস্ট ও সাহিত্যিকদের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকত তাহলে আমাদের শিল্প সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হত। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তাঁর জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে।···সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই করে নিয়েছি। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, তাহলে বন্দী হলেও তার কষ্ট নেই।

কিন্তু আমাদের কষ্ট শুধু আধ্যাত্মিক নয় ; শরীরেও কষ্ট এবং আমরা প্রস্তুত থাকলেও দেহ যে সময় সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

লোকমান্য তিলক কারাবাস কালে গীতার সমালোচনা লেখেন এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তিনি মনের দিক থেকে সুখেই কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে তাঁর ছ' বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ। একথা আমাকে বলতে হবেই যে জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় বাধ্য হয়ে মানুষকে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জনতাই তাকে জীবনের সমস্যাগুলি তলিয়ে দেখবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে, আমার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো পরিস্কার হয়ে উঠছে। অন্য কারণে না হলেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হতে পারব।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার কোন খবরাখবর পান না সুভাষচন্দ্র। শুধু মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সংখ্যাগুলো নিয়মিত পেয়ে থাকেন। জেল থেকে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করে। মেজদাকে একদিন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের একটি কপির জন্য লেখেন এবং জানান, যদি আমার জেলে থাকাকালে বঙ্গীয় আইসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আমি উত্তর অথবা দক্ষিণ কলকাতার যে কোন অঞ্চল হতে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। বাস্তব অসুবিধা কিছু কিছু থাকলেও আমার মনে হয় না যে কারাবন্দী হিসাবে জেলাবোর্ড বা আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কোন বাধা আছে।

১৯২৫ সালের এপ্রিল মাস পড়তেই বাংলাদেশের রাজনীতি

আবার ঘোরাল হয়ে উঠল। গত বছরের অক্টোবর মাসে বড়লাট যে জরুরী আইন জারি করে বহু কংগ্রেসীকে গ্রেপ্তার করেন তার মেয়াদ এপ্রিলেই শেষ। এর পরে ঐ আইনগত ক্ষমতার দরকার হলে সরকারকে বিল আনতে হবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়।

দেশবন্ধুর শরীরটা কিছুদিন হতেই খারাপ যাচ্ছিল। তিনি তখন পাটনায় বিশ্রাম করছিলেন কিছুদিনের জন্য। এমন সময় বঙ্গীয় আইনসভার বিশেষ জরুরী আইনের বিল আনে সরকার। এই আইন বলে আবার দমনমূলক অত্যাচার চালিয়ে যাবে সরকার। সুতরাং তা বাধা দিতেই হবে।

শারীরিক অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে পাটনা থেকে ছুটে এসে রোগীর চেয়ারে করে আইনসভায় গিয়ে সমস্ত নির্বাচিত সদস্যদের সংঘবদ্ধ করলেন দেশবন্ধু। বিলটি অগ্রাহ্য হলো। অবশ্য গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাবলে তিনি আইনে পরিণত করলেন বিলটিকে। কিন্তু তাহলেও দেশব্যাপী এক বলিষ্ঠ জনমত গড়ে উঠল সরকারের বিরুদ্ধে। স্বরাজ্যপন্থীদের নেতৃত্বে এক বিরাট আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল তারা।

এর পর ফরিদপুরে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনেও সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু। ডাক্তাররা তাঁকে যোগদান করতে নিষেধ করল। কিন্তু তা শুনলেন না তিনি। বললেন, দেশের পরিস্থিতি বিশেষ সংকটজনক, আমাকে যেতেই হবে। পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে আপাততঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করে তিনি সম্মেলনে যে বিবৃতি দেন, দেশের চরমপন্থীরা তাতে ক্ষুব্ধ হল। অবশ্য সরকার তাতে সন্তুষ্ট হলো। দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে চরমপন্থীরা কোন কথা বলতে পারল না।

সম্মেলন থেকে ফেরার পথে আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল শরীরের অবস্থা। তাঁকে দার্জিলিংএর শৈলাবাসে পাঠানো হলো পূর্ণ

বিশ্রাম পেল না তাঁর মন। দেশের জন্য দিনরাত চিন্তার চাপে নিষ্পেষিত হতে লাগল সে মন। দিনে দিনে দুর্বল হতে লাগল হৃদযন্ত্র।

অবশেষে ১৬ই জুন তারিখে দার্জিলিংএ প্রাণত্যাগ করলেন দেশবন্ধু। এক গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সারা দেশ। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হলো তার পূরনের আর কোন আশা রইল না।

মহাত্মা গান্ধী ছুটে এলেন। স্বরাজ্য দলের তার পণ্ডিত মতিলাল নিজের হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার ভারতের যে মানুষটিকে সবচেয়ে ভয় করত তাঁর মৃত্যুতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দেশবন্ধুর অনমনীয় মনোভাব ও আপোষহীন আন্দোলনের ভয়ে ভারত সচিব বড়লাট লর্ড রেডিংকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন লণ্ডনে। ইচ্ছা ছিল আলাপ আলোচনার পর সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে ভারত সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তাঁরা তেমন কোন গুরুত্ব দিলেন না সে বিষয়ে। দেশবন্ধুর আলোচনার সূত্র ধরে পণ্ডিত মতিলাল তাঁদের দাবী সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু করলেন সরকারের সঙ্গে। কিন্তু কোন আগ্রহ দেখাল না সরকার।

॥ সাত ॥

দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বিহ্বল করে দিল সুভাষচন্দ্রকে। তখনও তিনি মান্দালয় জেলে। একটা বিরাট শূন্যতা বোধ করলেন মনে। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, ভারতের চরম দুর্ভাগ্যের দিন ঘনিয়ে আসছে। স্বরাজ্য দল নিশ্চয়ই দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতে ও ইংলণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি

জোরদার হয়ে উঠবে। সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও বিরোধ আবার মাথা তুলে উঠবে। দেশের অনন্ত দুঃখসমুদ্র হতে মন্থিত সমস্ত গরল আকণ্ঠ পান করে জাতিকে বাঁচাতে আর কেউ পারবে না।

সাম্প্রদায়িক অনৈক্য আবার মাথা তুলে উঠল। যে দেশবন্ধু ছিলেন সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির উৎস, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে ঐক্য ও সম্প্রীতির ধারাটি গেল শুকিয়ে। দেশের হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য দেশবন্ধু নিজের হাতে ১৯২৩ সালে বাংলা চুক্তি নামে যে খসড়াটি করেছিলেন ঐ বছরের ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেস তা অনুমোদন করেনি। কিন্তু তা না করলেও দেশের মুসলমান সম্প্রদায় ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন দেশবন্ধু তাঁদের প্রকৃত এবং পরম বন্ধু। তাঁর হাতে তাঁদের ভবিষ্যতের ভাগ্যকে ছেড়ে দিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেননি তাঁরা।

এবার কেমন যেন শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ল ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনটা। তাছাড়া আর একটা কারণ ছিল। মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ করে তুলতে লাগল তাদের। ১৯২০ সাল থেকে মুসলিম লীগের কোন প্রাধান্য ছিল না। প্রাধান্য ত দূরের কথা, কোন অস্তিত্বই ছিল না তার। তার জায়গা নিয়েছিল খিলাফৎ কমিটি। এই খিলাফৎ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেস সমর্থন করায় বহু মুসলমান কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে তুর্কী নেতা মুস্তাফা কামাল পাশা নিজে মুসলমান জগতের ধর্মগুরু খলিফার পদ তুলে দেবার বিশেষ ব্যবস্থা করলে ভারতবর্ষে খিলাফৎ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে। সঙ্গে সঙ্গে খিলাফৎ কমিটিগুলিও উঠে গেল। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত মুসলীম লীগ নতুন করে মিলিত হয়ে দলকে জোরদার করে তোলার প্রস্তাব নিল। আগের থেকে এই নতুন মুসলিম লীগ অনেক বেশী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে

উঠল। তারা মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজ্য দাবী করে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে বাধা দিয়ে যাবার পরিকল্পনা করল।

দেশের এই দুর্দিনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর সঙ্গে মান্দালয় জেলে আরও কয়েকজন বিপ্লবী বন্দী ছিলেন। তাঁরা সবাই বাঙ্গালী। দেশবন্ধুর মৃত্যুর একমাস পরে তাঁরা সবাই মিলে দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তী দেবীকে একখানি সান্ত্বনাপত্র দিলেন। লিখলেন ঃ

মা, আপনার এই ঘোর বিপদের দিনে আমরা কয়েকজন প্রবাসী কারারুদ্ধ বাঙ্গালী আপনার নিকট সান্ত্বনার বাণী পাঠাচ্ছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আপনার এই দুর্দিনে আমরা আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের পাশে এসে দাঁড়াতে পারলাম না। বিপদের ঘন কুয়াশায় শোকের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করে আমাদের হৃদয়ের বাণী যদি আপনার চরণে পৌঁছায় তাহলে আমরা ধন্য হব।

যিনি গেছেন তিনি আমাদেরও খুব আপনার জন ছিলেন। আজ আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ভারতবাসীই কাঁদছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী কাঁদছে ভারতের তরুণ সম্প্রদায়। অভাগা তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিরা আজ তাঁর জন্য কাঁদছে যাদের জন্য তিনি তাঁর সঞ্চিত ধন ও যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি মুক্তহস্তে বিতরণ করে গেছেন। যাদের সেবার জন্য তিনি তাঁর প্রাণ, মান, স্বাস্থ্য ও আয়ু উৎসর্গ করে গেছেন সেই দেশবাসীরা আজ তাঁর শোকে আচ্ছন্ন। কিন্তু বাংলার যে সব তরুণ প্রাণ তাদের ক্ষুদ্র জীবনে যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ উৎসর্গ করে তাঁর উদ্ধৃত পতাকার তলে সমবেত হয়েছিল, যারা সুখে দুঃখে আঁধারে আলোয় তাঁর আদেশবাণী অনুসরণ করেছে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে যারা কখনও বিজয়গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছে, কখনও বা কারার শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে, নৈরাশ্যের রাত্রিতে অথবা সফলতার সকালে যারা কখনও তাঁর পাশ ছাড়েনি, যারা তাঁর মধ্যে পিতা সখা ও

গুরুর সমাবেশ পেয়েছিল—আজ সেই সব তরুণ প্রাণের অবস্থা কি কথায় বর্ণনা করা যায়?

চিঠিখানিতে সুভাষচন্দ্র ছাড়া আরও আটজন বন্দী সই করলেও চিঠিখানির ভাষা সুভাষচন্দ্রের। নিজের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী বাংলার বিভ্রান্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মনের কথাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি যেন। শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র লিখলেন, আজ আমাদের বাইরে অন্ধকার, অন্তরে শূন্যতা। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মেঘের পর মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে। সে তিমির প্রাচীরের মধ্যে আলোর প্রবেশের তিলার্ধ স্থান নেই।

চিঠিখানির শেষে সই করলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বিপিনবিহারি গাঙ্গুলী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন ভৌমিক, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুভাষচন্দ্র বসু ও হরিকুমার চক্রবর্তী।

দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে। কলকাতায় ধরা পড়ার কিছুদিন পর। তখন সবেমাত্র খবর পাওয়া গেছে, সুভাষচন্দ্রকে বহরমপুর জেলে বদলি করা হবে। কোন কারণ না থাকলেও তখন কেমন যেন প্রায়ই মনে হচ্ছিল, এবার তাঁকে বহুদিন ধরে আটক করে রাখবে সরকার। তাই বিদায়ের সময় দেশবন্ধুর পায়ের ধূলো নিয়ে বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে বোধহয় অনেকদিন দেখা হবে না।

তখন তিনি হেসে বলেছিলেন, না, না আমি তোমাদের বেশীদিন জেলে থাকতে দিচ্ছি না।

তারপর মান্দালয়ের জেলে বসেই দেশবন্ধুর শেষ চিঠি পান সুভাষচন্দ্র। সে চিঠির উত্তরে গত ৬ই জুন তারিখে একখানি চিঠি তাঁর দার্জিলিংএর ঠিকানায় পাঠান সুভাষচন্দ্র। কিন্তু তার কোন উত্তর পাননি। তারপর ২৫শে জুন সব শেষ।

সুদূর মান্দালয়ে বন্দী থাকলেও মনটা পড়ে থাকত সুভাষচন্দ্রের

ভারতে। সব সময়ে দেশের ছবিটা ভাসত তাঁর চোখের সামনে। দেশের কথা ভাবতেন সব সময়ে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর তিন মাস পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের আইনসভায় মুডিম্যান কমিটির রিপোর্ট পেশ করলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান।

তখন ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ছিলেন স্বরাজ্য দলের নেতা। ঐ সভায় মুডিম্যান কমিটি শাসন সংস্কারের জন্য যে রিপোর্ট পেশ করে তার উপর এক সংশোধনী প্রস্তাব আনেন পণ্ডিত মতিলাল এবং সভার সব সদস্য তা সমর্থন করেন। পণ্ডিত মতিলালের এই সংশোধনী প্রস্তাবটিকে জাতীয় দাবী বলা হয়।

এই দাবীতে বলা হয়, বৃটিশ পার্লামেণ্ট অবিলম্বে ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী মেনে নেবে এবং সেই মর্মে এক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকরী করবে। এই শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকরী করে তোলার জন্য ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক গোল টেবিল বৈঠক ডাকতে হবে।

বৃটিশ সরকারের মুখপাত্ররূপে বড়লাট এই জাতীয় দাবী তখন অগ্রাহ্য করেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে স্বরাজ্য দলের বিশেষ ক্ষতি হয়। অবশ্য এই বছরের শেষের দিকে লালা লাজপৎ রায় এই দলের সহকারী নেতা হিসাবে ভারতীয় আইনসভায় যোগদান করেন। কিন্তু এম, আর জয়াকার, এন, সি কেলকার প্রভৃতি দলের নেতারা দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে সহযোগিতাবাদী এক দল গড়ে তোলেন। তাঁদের নীতি ছিল কোন কোন বিষয়ে বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতা করে চলা।

তাছাড়া গত বছরের শেষের দিকে মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হিন্দুমহাসভাও জোরদার হয়ে উঠছিল পাল্টা এক সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে। অনেক হিন্দু কংগ্রেসী কংগ্রেস ছেড়ে হিন্দুমহাসভায় যোগ দিতে লাগল।

হিন্দুমহাসভা ও সহযোগিতাবাদী দলের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, এতদিন ধরে স্বরাজ্য দল ও জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশের সঙ্গে নির্বিচারে বিরোধিতা করে কি করতে পেরেছে, কি সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পেরেছে? কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের জোরদার করে তুলছে আর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের স্বার্থের ক্ষতি করছে।

বছরের শেষে ডিসেম্বরে কানপুরে মহিলা কবি সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। তাতে ঠিক হলো আগামী বছর আইনসভার যে নির্বাচন হবে, সে নির্বাচন পরিচালনার ভার আর স্বরাজ্য দলের উপর ছেড়ে দেয়া হবে না। সে নির্বাচন কংগ্রেসই পরিচালনা করবে।

এই সময় লালা লাজপৎ রায় হঠাৎ স্বরাজ্য দল ছেড়ে দেন। কংগ্রেসের প্রবীণ সদস্য ও প্রাক্তন সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও কংগ্রেস ছেড়ে অন্য একটি দল গড়ে তোলেন লালা লাজপৎ রায়ের সঙ্গে। মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার স্বরাজ্য দলে যোগ দেন।

এই ডিসেম্বর মাসে সরকার ভারতের মিলে তৈরি কাপড়ের উপর ১৮৯৪ সালে চাপানো অন্তঃশুল্কটি উঠিয়ে নেয়। এই মাসেই বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার ব্যাপারে কমনওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া বিলের খসড়াটি বেসরকারী বিল হিসেবে শ্রমিকদলের তৎপরতায় আলোচিত হয়। কিন্তু কোন ফল হলো না। সরকার মেনে নিল না এই বিল।

॥ আট ॥

১৯২৬ সাল পড়তে না পড়তেই ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন সুভাষচন্দ্র, মান্দালয়ের জেলের জলহাওয়া কোনমতেই আর সহ্য হচ্ছিল না তাঁর। হজমের গোলমাল জ্বর সর্দি লেগেই আছে প্রথম থেকে। তার উপর গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে দীর্ঘদিন অনশন ধর্মঘট করার ফলে শরীর আরও ভেঙ্গে গিয়েছিল।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মান্দালয় থেকে রেঙ্গুন পাঠিয়ে দেয়া হলো সুভাষচন্দ্রকে। সেখানে মেডিক্যাল বোর্ড পরীক্ষা করে প্রস্তাব করল, তাঁকে ছেড়ে দেয়া উচিত। কিন্তু সরকার সে প্রস্তাব মানল না। তাঁকে রেঙ্গুন থেকে ইনসিন জেলে বদলি করল। সেখানকার সুপারিণ্টেনডেণ্ট সরকারের কাছে এক কড়া নোট পাঠিয়ে বললেন, সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছে। এখনই তাঁকে মুক্তি দেয়া উচিত বা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

তখন বঙ্গীয় আইনপরিষদে সরকার এক প্রস্তাব এনে বলল, সুভাষচন্দ্র যদি নিজের খরচে সুইজারল্যাণ্ডে চিকিৎসার জন্য যেতে চান তাহলে তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তাঁকে রেঙ্গুন থেকে একটি ইউরোপগামী জাহাজে তুলে দেয়া হবে।

কিন্তু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন সুভাষচন্দ্র।

এদিকে সারা ভারত জুড়ে চলছে তখন নির্বাচনের তোড়জোড়। নির্বাচন হবে নভেম্বর মাসে। এর আগে ১৯২৩ সালে যখন নির্বাচন হয়েছিল, তখন সে নির্বাচন পরিচালনা করেছিল কংগ্রেস। তখন দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে জাতীয়তাবাদীরূপে কাজ করেছেন। কিন্তু এবার মুসলিম লীগ ও

হিন্দুমহাসভার মত দুটি প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক দল মাথা তুলে ওঠায় কংগ্রেসের শক্তি কিছুটা কমে গেল।

তাছাড়া মে ও জুলাই মাসে আর্য সমাজের শোভাযাত্রা নিয়ে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে যাওয়ায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি বেড়ে গেল। নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগের তরফ থেকে প্রচার করা হতে লাগল, হিন্দুরা যদি সরকারের অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যায় তাহলে মুসলমান সম্প্রদায় সে আন্দোলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। উল্টো তারা সরকারের শাসনতন্ত্রকে কার্যকরী করে তোলার জন্য চেষ্টা করে যাবে।

তা সত্ত্বেও অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেসে রয়ে গেলেন। দেশের সব জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসের নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন নির্বাচনে।

যাই হোক নির্বাচনে ফল ভাল হলো। বিহার মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের শক্তি অনেক বাড়ল। তবে বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমান অধিবাসী বেশী থাকায় এই দুটি প্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভাতে ও মধ্যপ্রদেশে সহযোগিতাবাদী দলের উদ্ভব হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না কংগ্রেস দল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও সহযোগিতাবাদী দলের উদ্ভব হলো। সহযোগিতাবাদীরা প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় কংগ্রেস বা স্বরাজ্য দলের সঙ্গে তাদের সব বিষয়েই মতবিরোধ হতে লাগল।

দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হতেই মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত একসঙ্গে তিনটি কাজের ভার গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তাঁকে জাতীয় কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের সভাপতি এবং কলকাতা পৌরসভার মেয়রের পদ গ্রহণ করতে হয়। এই পদগুলি তাঁকে দিয়ে গান্ধীজী বেশীর ভাগ সময় খাদির প্রচার নিয়েই কাটিয়ে

দিতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু খাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আসলে দেশের কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য গড়ে তোলা হলেও নির্বাচনের সময় এরা কংগ্রেসকে সাহায্য করে বিশেষভাবে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা অনেক আগেই জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। এবার কংগ্রেস তাঁকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের জন্য উত্তর কলকাতার একটি আসনে দাঁড় করাল। এই আসনটি আগে দখল করেছিলেন স্বরাজ্য দলের বিরোধী যতীন্দ্রনাথ বসু নামে একজন উদারপন্থী নেতা।

কংগ্রেস ভেবেছিল, জেল থেকে সুভাষচন্দ্র নির্বাচনে জয়ী হলে তাঁকে মুক্তি দেবে সরকার। তাই জোর প্রচারকার্য চালাতে লাগল। বলতে লাগল, তিনি দেশের জন্যই জেলের মধ্যে আছেন দীর্ঘদিন আবদ্ধ।

নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু নির্বাচনের ফল যাই হোক, বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। গান্ধীজীর অনুরোধে কংগ্রেসের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এক বছর কাজ করতে না করতেই বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের বীরেন্দ্র শাসমল তাঁর বিরোধিতা করতে লাগলেন। এই বীরেন্দ্র শাসমলই একদিন মেদিনীপুর জেলার কৃষকদের পক্ষে করবন্ধ আন্দোলনে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব করেছিলেন। কিন্তু এবার দলের সভাপতির বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতায় কোন সংগত যুক্তি না থাকায় পরে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা পৌরসভার নির্বাচনে পরাজিত হন।

নির্বাচনের একমাস পরেই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল গৌহাটিতে। সভাপতিত্ব করলেন মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। মাদ্রাজের আয়েঙ্গারের বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা ছিল। তিনি তাঁর সমস্ত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা কংগ্রেসের কাজে

প্রয়োগ করেন। তাঁরই চেষ্টায় মাদ্রাজের আইন পরিষদে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

গৌহাটি কংগ্রেসের পর সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যান আয়েঙ্গার।

যাই হোক কংগ্রেসের এই দুর্দিনের মাঝে একটা আশার আলো দেখা দিল। এ আলো দেখা দিল দেশজোড়া যুবজাগরণকে কেন্দ্র করে। এই যুবজাগরণ ১৯২৬ সালের ভারতের রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত দলাদলি ও ক্ষমতার লড়াই দেখতে দেখতে অনেক আগে হতেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যুবক সমাজ। তারা চাইছিল সবরকম দলাদলির অবসান আর দেশের স্বার্থে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার। পাঞ্জাবে নওজওয়ান সভার অধীনে যুবক সম্প্রদায় সংগঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরেও যুবকরা অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ নামে এক আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে অস্ত্র আইন বাতিল করতে বাধ্য করা। সরকার সারা দেশে এই মর্মে এক আইন জারি করে যে দেশের কোন লোক বিনা অনুমতিতে কোন অস্ত্র রাখতে বা রাস্তায় বহন করতে পারবে না। আওয়ারি নামে একজন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা এই যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন।

অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ নামে এই আন্দোলন শুরু হলেও এর আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। বাংলা দেশের বহু কর্মী ও নেতাকে সরকার বিনা বিচারে দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল দেশের যুবক সম্প্রদায়। অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তাই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য করা।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। কংগ্রেসের দলগত দুর্বলতার

সুযোগ নিয়ে সরকার অবাধে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে চলতে থাকে। এই বছরের এপ্রিল মাসে লর্ড রেডিংএর পরিবর্তে লর্ড আরউইন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন।

এই বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও পরিষদে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্বাচন পরিচালনা করেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি বোর্ড। এই বোর্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

এর পরই আসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক পরিষদের নির্বাচন। দেশ ও জাতির স্বার্থের কথা বিবেচনা করে মিলে মিশে কাজ করে যাবার জন্য বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান পাঁচজন নেতা। তাঁরা হলেন, শরৎচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসীচরণ গোস্বামী ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি পদের জন্য বাসন্তী দেবীর অনুমতি না নিয়েই তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়। তিনি রাজী না হতে অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বীরেন্দ্র শাসমল হন সম্পাদক।

বীরেন্দ্র শাসমল কার্যনির্বাহক সমিতিতে আসায় অনেকে ক্ষুব্ধ হলেন। সামনেই আসছে পৌরসভার নির্বাচন। তখন শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি পাঁচজন নেতা দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে তারবার্তায় সব কথা জানালেন। ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যস্থতায় যতীন্দ্রমোহন আবার কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। পরে পৌরসভার মেয়রও হন। কিন্তু বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি আগের মতই চলতে থাকে।

১৯২৭ সালের শুরু থেকেই সুভাষচন্দ্রের মুক্তির জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিল সরকারের উপর। মাসকতক আগে রেঙ্গুনে মেডিক্যাল বোর্ডের একজন সদস্য হিসাবে সুভাষচন্দ্রের অন্যতম অগ্রজ ডাক্তার

সুরেশচন্দ্র বসু তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তখনই তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল, সুভাষচন্দ্রের এখন ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া হলেও আর কিছুদিন এই আবহাওয়া থাকলে তাঁর থাইসিস হবেই। এই জন্যই তিনি সুইজারল্যাণ্ডে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সরকার যেভাবে অনুমতি দিয়েছিলেন তা মনোপূতঃ হয়নি সুভাষচন্দ্রের। তাই প্রত্যাখ্যান করলেন সে প্রস্তাব।

এর পর সরকার কিছুদিন চুপ করে থাকার পর একটা নতুন কথা ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিল সুভাষচন্দ্রকে ইসসিন জেল থেকে ভারতের যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আলমোড়ায় বদলি করা হবে।

২৭শে মে তারিখে অতি সন্তর্পণে সুভাষচন্দ্রকে ভারতের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। বিনা কারণে বিনা বিচারে এভাবে কেন তাঁকে সরকার আটক রাখছে, এত রোগ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ সত্ত্বেও সরকার কেন তাঁকে মুক্তি দিচ্ছে না, তা কিছুই বুঝতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র।

যাই হোক চারদিনের দিন সমুদ্র পার হয়ে হুগলি নদীর মোহনার কাছে ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছলেন।

সুভাষচন্দ্রের নৌকো কলকাতা পৌঁছবার আগেই পথে একটি লঞ্চে করে লোম্যান এসে হাজির হলেন। নৌকো থামিয়ে লোম্যান এসে দেখা করলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। লোম্যান তখন সি, আই ডির বড়কর্তা।

লোম্যান বলল, এইখানে আপনাকে একবার নামতে হবে।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভাবলেন, লোম্যান কৌশলে তাঁকে কলকাতার বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাই তিনি জবাবে বললেন, না, আমি কিছুতেই নামব না।

তখন লোম্যান বলল, ছোটলাট সাহেব নিজে একটি লঞ্চ দিয়েছেন। সেই লঞ্চে এক মেডিক্যাল বোর্ড আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁদের সামনে আপনাকে এখনি

তখন আর অমত করলেন না সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র এসে দেখলেন, গভর্ণর দ্বারা নিযুক্ত সেই মেডিক্যাল বোর্ডের মধ্যে রয়েছেন বাংলার দুইজন স্বনামধন্য চিকিৎসক, ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এ ছাড়া ছিলেন কর্ণেল স্যাণ্ডস ও গভর্ণরের নিজস্ব চিকিৎসক হিংস্টন।

বোর্ডের সদস্যরা সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তার বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে গভর্ণরকে দার্জিলিংএ পাঠালেন। গভর্ণর তখন দার্জিলিংএর গ্রীষ্মাবাসে ছিলেন।

সেদিন গোটা দিন ও রাত গভর্ণরের লঞ্চেই কাটালেন সুভাষচন্দ্র। পরদিন সকালে লোম্যান এসে খবর দিল গভর্ণর মুক্তির আদেশ দিয়েছেন তারযোগে।

সেদিন ১৬ই মে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র আদেশ পত্রটিতে দেখলেন ১১ই তারিখের সই রয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে লোম্যান বলল, আলমোড়ায় ছুটির আদেশ ও মুক্তির আদেশ দুটোই সই করা ছিল। ঠিক হয়েছিল মেডিক্যাল বোর্ডের সুপারিশ মত এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন গভর্ণর। তাই তাঁর আদেশ মতই আপনাকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। মেডিক্যাল বোর্ড যখন রিপোর্ট লিখছিলেন তখন পুলিশ অফিসাররা বোর্ডকে সুভাষচন্দ্রের বদলির সুপারিশ দেবার জন্য অনুরোধ করছিল।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পুলিশদের সে অনুরোধ রাখেনি বোর্ড। বোর্ড এ অনুরোধ না রাখলেও অন্য কোন বাংলার গভর্ণর হলে পুলিশদের ইচ্ছাই জয়ী হত অবশেষে। কিন্তু স্ট্যানলি জ্যাকসন অল্পদিন গভর্ণর হয়েই বাঙ্গালী জাতির মনের প্রকৃত অবস্থাটা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর আগের গভর্ণররা নিজেদের কর্তব্য পালন করেননি।

তাঁদের এই ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে আসলে পুলিশ কমিশনাররাই

স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে শাসন করে এসেছে বাংলা দেশকে। কারণে অকারণে পুলিশী নির্যাতনে জর্জরিত হয়েছে বাঙ্গালী জাতি। বারবার পদদলিত হয়েছে তাদের ন্যায় বিচারের দাবী।

কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই পুলিশী অত্যাচার বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন স্ট্যানলি জ্যাকসন।

যাঁর মুক্তির জন্য সারা দেশের বুক জুড়ে এত প্রতীক্ষা এত প্রত্যাশা অবশেষে তিনি মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন দেশের প্রতিটি মানুষ তাদের অন্তরে আসন পেতে তাঁরই পথ চেয়ে বসে আছে। একবাক্যে সবাই যেন বলছে, হে বীর, তোমার শূন্য আসন আজ তুমি পূর্ণ করো।

পথে ঘাটে সভা সমিতিতে মানুষের সে কি স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস। নির্বাচনে কলকাতার জনগণ সুভাষচন্দ্রকে জয়ী করলেও সরকার তাঁকে জোর করে আটকে রেখে জনগণের রায়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে এসেছেন এতদিন। আজ সুভাষচন্দ্রের মুক্তি জনগণের জয়। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কাছে সে যেন একটা বিরাট উৎসবের দিন। বিপ্লবী বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ বীরকে খুঁজে পেয়েছে যেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে।

শরীর তখন অত্যন্ত খারাপ। তাই জেল থেকে বেরিয়ে বেশীদিন বাড়িতে থাকতে পেলেন না। আত্মীয় স্বজনদের অনুরোধে শিলং যেতে হলো শরীর সারাতে। কিন্তু যাবার আগে যে সব রাজনৈতিক বক্তৃতা দিলেন তাতে তাঁর মত ও পথের বেশ একটা আভাস পাওয়া গেল।

সুভাষচন্দ্র আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলাদলি দূর হয়ে গেল। সকলে একযোগে সমর্থন জানাল তাদের অবিসংবাদী নেতাকে। সুভাষচন্দ্র প্রথমে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করলেন। তিনি বললেন, জাতীয় আন্দোলন

সরকারী শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে উঠবে। দেশের সব লোক যখন জেলে যাবার জন্য তৈরী হবে, তখন জেলে লোক ধরবে না, সরকারের মনোবল ভেঙ্গে যাবে।

আর একটা কথা ভাবলেন সুভাষচন্দ্র, যে কথাটা এর আগে অন্য নেতারা খুব স্পষ্ট করে ভাবেননি। ভারতের ভাবী সংবিধান হবে প্রজাতান্ত্রিক। ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করতে তিনি রাজী নন। তাতে করে কোন ফল হবে না শুধু ভারতে বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ চিরদিনের মত কায়েম হবার সুযোগ পাবে। সমাজে ধনগত, বর্ণগত ও শ্রেণীগত সব বৈষম্য ভেঙ্গে ফেলতে হবে। নারীপুরুষের সমান অধিকার থাকবে। নির্বাচনের ভোটে হিন্দু-মুসলমান ভেদ থাকবে না। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে আইন সভায় জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিদেশী শাসনকে টিকিয়ে রাখার এক হীন অপকৌশল ছাড়া কিছুই নয়।

তবে শাসনকাজের জন্য দেশবাসীকেও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। তার জন্য কংগ্রেস সংগঠনকে পাল্টা সরকার হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কংগ্রেসের মধ্যেও শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ খাড়া করে জনগণকে ধীরে ধীরে শাসনকাজে পটু করে তুলতে হবে।

প্রায় মাসখানেক পরে কলকাতা থেকে শিলং রওনা হলেন সুভাষচন্দ্র। ওখানে পৌছলেন, ১২ই জুন তারিখে। শিলংএ তখন দারুণ বর্ষা চলেছে। কয়েকদিন ধরে দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে। এক আধদিনের জন্য আকাশটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

যাই হোক, ওখানে পৌছানোর দিনকতকের মধ্যেই রোগের উপসর্গগুলো বেশ কিছুটা কমল। জ্বরটা একেবারে না গেলেও দৈনিক তাপবৃদ্ধি কমল। বুকের ব্যথা ও কাশি অনেকটা কমে গেল। তবে হজমের গোলমালটা তখনও গেল না।

দাদা সুরেশচন্দ্র ছাড়াও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ব্যবস্থাপত্র মত ওষুধ চলতে লাগল। তবে দেহের বিশ্রাম ও কিছুটা আরোগ্য লাভ করলেও মনের দিক থেকে স্বস্তি পেলেন না সুভাষচন্দ্র। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল দেশের প্রতি জাতির প্রতি বিশেষ করে উত্তর কলকাতার নির্বাচন কেন্দ্রের অধিবাসীদের প্রতি ঠিকমত কর্তব্য পালন করতে পারছেন না। জেলে থাকার সময় ভেবেছিলেন, মুক্তি পেলেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু মুক্তি পাবার পরেও এমন করে দীর্ঘদিন শয্যাগত হয়ে থাকতে হবে তা ভাবতেও পারেননি।

মান্দালয় জেলে থাকার সময় নির্বাচনে জয়লাভের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একখানি নিবেদনপত্র পাঠান।

কিন্তু সরকার সে নিবেদনপত্র সেন্সরে পাস করেনি। এবার শিলংএ হাতে অফুরন্ত অবসর পেয়ে সেই নিবেদন পত্রখানি আবার নতুন করে লিখলেন সুভাষচন্দ্র। ভাবলেন চিঠিখানি লিখে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন। চিঠিখানি ওদের হাতে পৌঁছলে খুব খুশি হবেন।

১০ই আগষ্ট তারিখে সুভাষচন্দ্র লেখেন, গত বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচনের সময় আমি উত্তর কলকাতার অমুসলমান কেন্দ্র হতে সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াই। সেই উপলক্ষে মান্দালয় জেলে থাকাকালে গত বছরের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে আপনাদের যে নিবেদনপত্র পাঠাই তা আপনাদের কাছে পৌঁছায়নি। কর্তৃপক্ষ যে কারণেই হোক সে পত্র যথাস্থানে পাঠানো সমীচীন মনে করেননি। তাঁরা আমার এই সামান্য নিবেদনপত্র কেন আটকালেন তা জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পাইনি। তারপর আমার নির্বাচন সম্পর্কিত ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের কাছে যে পত্র দিই তার মধ্যে অনেকগুলো গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারেনি। আমার কারারুদ্ধ অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে শুনেছি, আমি যাতে জেলখানা

থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কাজকর্ম চালাতে না পারি এই ছিল কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়।

কিন্তু আমার নিবেদনপত্র আপনাদের কাছে না পৌছলেও বোধ হয় আমার নীরব আকুল নিবেদন আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। তাই আপনারা আমার নিবেদন না শুনেই অতিপ্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সত্বেও আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে এত বেশী ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন।

আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতার কারণ এই যে, যে অবস্থায় পড়লে সাধারণতঃ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও চিনতে পারে না, ঠিক সেই অবস্থায় রাজপুরুষদের দ্বারা আমি যখন লাঞ্ছিত—আপনারা আমলাতন্ত্রের ভ্রূকুটিতে বিচলিত না হয়ে আমায় সম্মানের উচ্চ বেদীতে বসিয়েছেন। আমার উপর এই প্রীতি ও বিশ্বাস দেখিয়ে আপনারা যে শুধু আমাকে ধন্য করেছেন তাই নয়, আপনারা সকল রাজবন্দীদের গৌরবমণ্ডিত করেছেন।

কারাবাসী থাকতে আপনাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার ও দেশের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পাইনি। মনে করেছিলাম, যখন মুক্তি পাব তখন এই দুটো কর্তব্য সম্পাদন করতে পারব। মুক্তিলাভের আশা আগে মোটেই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ যেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্ত হলাম সেইদিন আমি ভগ্নস্বাস্থ্য ও শয্যাগত। আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমার যা কর্তব্য আমার মুক্তির পর আজ পর্যন্ত তা করতে পারিনি। অনিচ্ছাসত্বেও আপনাদের সঙ্গে পরিচিত না হয়েই আরোগ্য লাভের আশায় আমাকে এখানে চলে আসতে হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নামতে এখনও দেরি আছে, এইজন্য স্থির করলাম, আপাততঃ পত্রের দ্বারাই আপনাদের কাছে আমার নিবেদন জানাব।

তাঁর আগেকার যে নিবেদনপত্রটি সরকার আটক করে রাখে সেটি লিখেছিলেন, ১৯২৭ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। তাতে তিনি

দুঃখ করে লেখেন—প্রায় দুই বছর হতে চলল আমি বিনা বিচারে ও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বহু অনুরোধ করা সত্বেও আমাকে গভর্ণমেন্টের কোন আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয়নি। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, অপরাধ যদি করে থাকি তা এই যে, পরাধীন জাতির সনাতন গতানুগতিক জীবন ছেড়ে কংগ্রেসের একজন সেবক হিসাবে স্বদেশ সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ করবার প্রয়াস পেয়েছি।

তারপর আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হয়েছি তা নয়। বিশ মাস হলো আমি দেশান্তরিত। বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হতে কতকাল ধরে আমি বঞ্চিত। তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে আমার কারাবাস ব্যর্থ হয়নি। আজ আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে ফুটেছে। এখানে আসবার আগে আমি বাঙ্গলাকে ভারত ভূমিকে ভালবাসতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুণ সোনার বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসতে শিখেছি।

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করে ভারত মাতার চরণে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়ে পূর্ণতর জীবন লাভ করব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পর্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিনি। এইজন্য পরাধীন দেশের স্বদেশ সেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষায় দুঃখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি কৃতকার্য হতে পেরেছি কি না অথবা কতদূর কৃতকার্য হয়েছি—তার বিচার করবেন আমার দেশবাসীগণ।

আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙরে আমি এই সত্য পেয়েছি—পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ—শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম—সবই ব্যর্থ যদি স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়।

উপরের চিঠি দুখানি হতে দেশের জনগণের উপর কী পরিমাণ

আস্থা ছিল সুভাষচন্দ্রের তা বোঝা যায়। তাঁর মূল কথা ছিল, নেতারা নিজেদের সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দেবেন না। দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন এবং তাদের সম্মতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

মান্দালয় জেল থেকে আরও দুখানি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখেন সুভাষচন্দ্র। একখানি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ও আর একখানি দেশবন্ধুর জীবনী রচয়িতা হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে। দুখানি চিঠিতেই দেশবন্ধুর বহুমুখী প্রতিভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান সুভাষচন্দ্র।

দেশবন্ধু কি করে এত বড় হলেন, একাধারে কি করে তিনি বড় ব্যারিস্টার, উদার প্রেমিক, পরম বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্বিজয়ী বীর হলেন তা নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে আলোচনা করে দেখান সুভাষচন্দ্র। মানব চরিত্র সম্বন্ধে এমন গভীর জ্ঞান খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। দেশবন্ধুর চরিত্রকে এতখানি নিবিড়ভাবে আর কেউ দেখেননি। দেশবন্ধুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাঙ্গালী জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যটিকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হয়েছে। রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন সর্বতোমুখী এবং তার জীবন হয়ে উঠেছে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ। আর্যের ধর্মপ্রবণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিভাব এবং মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, তেজস্বিতা ও বাস্তববাদ বাঙ্গালী চরিত্রের মধ্যে এসে মিশেছে ওতপ্রোতভাবে। বাঙ্গালী তাই একই সঙ্গে আদর্শবাদী, বস্তুবাদী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও ভাবুক।

বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র দেখেন, বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে তিনটি ধারা রয়েছে। সে তিনটি ধারা হলো, তন্ত্র, বৈষ্ণব ধর্ম এবং নব্যন্যায় ও রঘুনন্দনের স্মৃতি। ন্যায়

ও স্মৃতির দিক থেকে আর্যাবর্তের সঙ্গে, বৈষ্ণব ধর্মের দিক থেকে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে এবং তন্ত্রের দিক থেকে তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্বন্ধ আছে।

তন্ত্রের সাধনা বাঙ্গালীকে করেছে তেজস্বী নিষ্ঠাবান ও শক্তিসাধক, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তাকে করেছে একই সঙ্গে ত্যাগী ও প্রেমিক এবং ন্যায়ের অনুশীলন তাকে করেছে তার্কিক ও নৈয়ায়িক। দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ লাভ করেছিল আশ্চর্য পরিপূর্ণতার সঙ্গে। তিনি ছিলেন একাধারে তার্কিক, তেজস্বী ও ত্যাগী।

আলিপুরের বোমার মামলায় অভিযুক্ত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে সমর্থন করে দেশবন্ধু আদালতে বলেন, দেশপ্রেমের কবিরূপে জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারূপে, মানবতার পূজারীরূপে পূজিত হবেন শ্রীঅরবিন্দ জনগণের দ্বারা। তাঁর বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে সারা দেশে।

এই বছরের সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো সাইমন কমিশনের নিয়োগ। ১৯২৭ সালের ২৬শে নভেম্বর রাজার পক্ষ থেকে এক আজ্ঞাপত্রে এই কমিশন নিযুক্ত করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন। এ ছাড়া ছিলেন আরও ছয় জন সদস্য। তাঁরা হলেন, বর্নিহ্যাম, লর্ড স্ট্রাথকোনা, এডওয়ার্ড ক্যাডোগান, মিঃ ষ্টিফেন ওয়ালেশ, মেজর এ্যাটলী আর কর্নেল ফক্স। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের ভার পড়ে। বৃটিশ ভারতে শাসনব্যবস্থার কার্যধারা কেমন চলছে, শিক্ষার অগ্রগতি কতখানি হয়েছে, প্রতিনিধিত্বমূলক দলগুলির কাজকর্ম কি, দায়িত্বশীল সরকারগুলি কেমন কাজ করছে—কমিশন তা দেখে রিপোর্ট দেবে।

এ ছাড়া ঐ সময় ইংলণ্ডে হাউস অফ লর্ডস সভায় এই কমিশন নিয়োগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতের জন্য সর্বসম্মত এক শাসনতন্ত্র পেশ করতে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের আহ্বান জানান।

ভারতীয়দের কাউকে কেন এ কমিশনে নেয়া হলো না তার

কারণ ব্যাখ্যা করে বড়লাট বলেন, পক্ষপাতহীন ভাবে ভারতের প্রকৃত অবস্থা কমিশন যাতে পার্লামেন্টের সামনে তুলে ধরতে পারে এই জন্যই কোন ভারতীয়কে নেয়া হয়নি কমিশনে।

সে যাই হোক, কংগ্রেস বিনা দ্বিধায় এ কমিশন বর্জন করল।

শুধু কংগ্রেস নয়, এমন কি দেশের উদারপন্থী নেতারাও এ কমিশন বর্জন করেন। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এলাহাবাদের এক জনসভায় ও পরে বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত লিবারেল ফেডারেশনের দশম অধিবেশনে সাইমন কমিশনকে প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বলেন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের অধিকারকে অস্বীকার করে ইচ্ছা করে অপমান করা হয়েছে ভারতবাসীকে।

এর পর ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে বসল জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। সভাপতি হলেন দিল্লীর জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ডাক্তার এম, এ, আন্সারী।

অনেক আগে হতেই কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী এক যুবকগোষ্ঠি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও কড়া ও চরমপন্থী মতবাদ অবলম্বনের জন্য চাপ দিতে থাকেন নেতাদের উপর। মাদ্রাজ কংগ্রেসেও পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবাসীর লক্ষ্য বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু অধিবেশন শেষ হবার পর মহাত্মা গান্ধী বললেন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কিন্তু এবিষয়ে তাড়াহুড়ো করলে হবে না।

লালা লাজপৎ রায় বলেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন বলতে অনেকেই জাতীয় স্বাধীনতা বুঝায়।

যাই হোক এই অধিবেশনে কার্যনির্বাহক সমিতিতে চরমপন্থীদের কয়েকজনকে নেয়া হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র। এই অধিবেশনে সর্ব ক্ষেত্রে ও সর্ব স্তরে সাইমন কমিশন বর্জনের জন্য ভারতবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়ে

প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া সকল দলের গ্রহণযোগ্য এক শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সকল দলের এক সম্মেলন আহ্বানের জন্য নির্দেশ দেন কার্যনির্বাহক সমিতিকে।

সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর এই হলো প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ। অবশ্য এর আগে হতেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করে আসছিলেন তিনি। কেম্ব্রিজে পড়াশুনো শেষ করে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। কিন্তু ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইন ব্যবসা ত্যাগ করে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করেন। অনেকের মতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে আইনব্যবসা ছেড়ে দিতে তিনিই নাকি রাজী করিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভার ভিতরে ঢুকে সরকারের সঙ্গে সব বিষয়ে অসহযোগিতা করে চলার যে প্রস্তাব দেশবন্ধু উত্থাপন করেন পণ্ডিত জওহরলাল তাতে রাজী হননি। তারপর কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় কংগ্রেস কোন কার্যকরী পরিষদে যোগদান করেননি। এমন সময় তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কমলা নেহেরু গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্ত্রীকে নিয়ে তিনি ইউরোপে চলে যান। ইউরোপে থাকার সময় নেহেরু সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরে ভারতে ফিরে এসে নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলে ঘোষণা করেন। দেশের যুবসমাজ ও কংগ্রেসের বামপন্থীদল তখন তাঁর এই সমাজবাদী মতামত সাদরে গ্রহণ করে। এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

॥ নয় ॥

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস ১৯২১ সালের নভেম্বরের কথা মনে করিয়ে দিল ভারতবাসীকে। সেবার যখন যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারতভ্রমণে এসেছিলেন তখন এক বিরাট বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সারা দেশ। কালো পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিল ভারতের আকাশ।

আজও ঠিক তাই। ফেব্রুয়ারিতে সাইমন কমিশন ভারতের মাটিতে পা দিতেই শুরু হলো হরতাল আর বর্জন আন্দোলন। কমিশন যেখানেই যায় সেইখানেই বজ্র গর্জনে ধ্বনি ওঠে, গো ব্যাক সাইমন, সাইমন ফিরে যাও।

সাইমন অবশ্য একটা আপোষের চেষ্টা করলেন। তিনি বড়লাটকে একখানি চিঠিতে জানালেন কমিশন ভারতীয় আইন সভাগুলির দ্বারা মনোনীত একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করতে চান।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল দলের নেতা দিল্লী থেকে এক ইস্তাহার প্রচার করে ঘোষণা করলেন সাইমন কমিশনের তাঁরা বিরোধিতা করে যাবেন।

কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের সদর দপ্তর এর বেশী কিছু করলেন না। সারা দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উত্তাল হয়ে উঠল আন্দোলনের ঢেউ। তখন ঠিকমত নেতৃত্ব দান করতে পারলেও কংগ্রেসের উচ্চ পর্যায়ের নেতাগণ ঠিকমত পরিচালনা করতে পারলে এই আন্দোলনে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাহায্য পাওয়া যেত এবং এই আন্দোলন এক বিরাট বিপ্লবের রূপ নিতে পারত।

বাংলা দেশ কিন্তু চুপ করে থাকেনি। কারো নির্দেশের

প্রতীক্ষায়ও থাকেনি। বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ঐ সময় বৃটিশ দ্রব্য বর্জনের এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে।

দেশের লোকের বিরোধিতা সত্ত্বেও কমিশনের সাতজন সদস্য যেখানেই যেতে লাগল সেখানেই কালো পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করল জনতা। অবশ্য গান্ধীজীর নির্দেশে এই বর্জন আন্দোলন কড়াকড়িভাবে অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু জায়গায় পুলিশ অন্যায়ভাবে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর অত্যাচার করতে লাগল।

লাহোরে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে কালো পতাকা নিয়ে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিল পথে পথে। এমন সময় অকারণে লাঠিচার্জ করে পুলিশ বেটন দিয়ে নির্মমভাবে মারতে থাকে জনতাকে। গোলমালের মধ্যে লালা লাজপৎ রায় নিজেও গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে সেরে উঠতে থাকেন। কিন্তু আঘাতের ফলে তাঁর হৃৎপিণ্ডে যে স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হয় তা আর সারে না এবং পরে এর থেকেই তাঁর মৃত্যু হয়। পাঞ্জাবের প্রিয় ও অবিসংবাদী নেতার মৃত্যুতে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পাঞ্জাবের জনগণ।

কংগ্রেস নেতারা বললেন, শুধু আন্দোলন করলেই হবে না। সাইমন কমিশনের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। ওরা যাই করুক, ভারতের আদর্শ শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করে ওদের দেখাতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে মার্চ মাসে প্রথমে দিল্লী ও পরে বোম্বাইএ দুটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বাই সম্মেলনে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মূল নীতিগুলি নির্ধারণের জন্য পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। সর্বদলীয় এই কমিটিতে ছিলেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু (চেয়ারম্যান), স্যার আলি ইমাম, তেজবাহাদুর সপ্রু,

এ্যানে, সর্দার মঙ্গল সিং, সাহেব কুরেশী, জি, আর, প্রধান ও সুভাষচন্দ্র বসু।

এই বছরের মে মাসে পুণাতে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতায় বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় জনগণের মধ্যে। সুভাষচন্দ্র জোর দিয়ে বললেন, কংগ্রেসের উচিত সরাসরি শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা এবং ছাত্র ও যুবকদের জন্য পৃথক সংগঠন গড়ে তোলা। পৃথক মহিলা সংগঠনের উপরও জোর দিলেন সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব বিশেষভাবে সাড়া দিল শ্রমিক ও যুবকদের মনকে।

পুণা থেকে বোম্বাই গেলেন সুভাষচন্দ্র। সেখানে গিয়ে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তাঁর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার যুবসমাজ বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ইয়ুথ লীগ প্রতিষ্ঠা করেছে।

আরও দেখলেন সুভাষচন্দ্র গুজরাটের বারদৌলী মহকুমায় আবার শুরু হয়েছে করবন্ধ আন্দোলন। সেখানকার সরকার শতকরা কুড়ি গুণ খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯২২ সালে এই আন্দোলন থামিয়ে দেন মহাত্মা গান্ধী। এখন তা আবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্বলে উঠল। কৃষকদের সাহায্যে এগিয়ে এল বোম্বাই শহরের অধিবাসীরা। মহিলা ও কৃষক সমাজও এগিয়ে এল। কৃষকদের নেতৃত্ব করতে লাগলেন বল্লভভাই প্যাটেল। অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করে কৃষকদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। বল্লভভাই প্যাটেলের বীরোচিত কাজের জন্য গান্ধীজী তাঁকে সর্দার অর্থাৎ নেতা উপাধিতে ভূষিত করেন।

নেহেরু কমিটি রিপোর্ট দাখিল করল আগষ্ট মাসে। সে রিপোর্টে দেখা গেল শাসনতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি কি হবে সে বিষয়ে একমত হতে পারেনি কমিটি। কারণ কয়েকজন সদস্য ঔপনিবেশিক

স্বায়ত্তশাসন কিছুতেই মেনে নেবেন না এবং তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চাপ দিয়েছেন।

এই রিপোর্টে শাসনতন্ত্রের যে খসড়া তৈরি হয় তা শুধু বৃটিশ ভারতের জন্য। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে বলা হয় যতদিন পর্যন্ত না ওরা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ না দেয় ততদিন অপেক্ষা করতে হবে এবং এ সম্পর্কে বৃটিশ নীতিই বলবৎ থাকবে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছিল, কেন্দ্রে ও প্রদেশের মন্ত্রীসভাগুলি আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে। সেনেট ও প্রতিনিধি সভা নিয়ে গঠিত হবে কেন্দ্রীয় আইনসভা। সেনেটের নির্বাচনে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি অংশ গ্রহণ করবে। স্ত্রী ও পুরুষ সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার থাকবে। হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিয়ে যৌথ নির্বাচন হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য মাত্র দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা থাকবে। বাংলা ও পাঞ্জাবে কোন সংরক্ষিত আসন থাকবে না। ভারতের একটি সুপ্রীম কোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের ব্যাপারে মৌলিক বাধানিষেধ থাকবে। সিভিল সার্ভিসকে নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। রিপোর্টে, উনিশটি মৌলিক অধিকারের কথা পর পর উল্লেখ করা হয়। এই মৌলিক অধিকার-গুলিকে সংবিধানে রূপ দিতে হবে।

এই রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য আগষ্ট মাসেই লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় এক সম্মেলন বসে। কমিটির বেশীর ভাগ সদস্য পূর্ণ স্বাধীনতার কথা না বলায় দেশের তরুণ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁরা সম্মেলন পণ্ড করে দেবার মতলব করেছিলেন। তখন সুভাষচন্দ্র ও পণ্ডিত জওহরলাল চরমপন্থীদের এক ঘরোয়া সভা ডেকে মিলিত হন তাঁদের সঙ্গে।

দেশের চরমপন্থী ও যুবক সমাজের উপর তখন সুভাষচন্দ্র ও পণ্ডিত জওহরলালের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাছাড়া তাঁরাও পূর্ণ স্বাধীনতাই চাইতেন। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল দুজনেই চরমপন্থীদের

বুঝিয়ে বললেন, এখন শুধু প্রতিবাদ জানিয়ে ছেড়ে দাও। সর্বদলীয় সভা পণ্ড করে লাভ নেই। আমরা বরং ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গড়ে তুলব ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য।

কোনরকমে শান্ত করা হলো চরমপন্থীদের। এর পর থেকে ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগল বিভিন্ন প্রদেশে। সাইমন কমিশনের সময় যে সব ছাত্র বর্জন আন্দোলনে যোগদান করেছিল তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

এই বছর আগষ্ট মাসে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। এইভাবে সারা বাংলা ও ভারতের সব অন্যান্য প্রদেশে ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে।

ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনও দেখা দেয় সারা দেশ জুড়ে। জামসেদপুরে টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস, বোম্বাইএর সব কাপড়ের কল, লিলুয়ার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কারখানা, বজবজের পেট্রোল ওয়ার্কস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করল। এই সময় কলকাতার আশেপাশের পাটকলগুলির প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করে।

জামসেদপুরে টাটা কোম্পানির শ্রমিকদের অনুরোধে সুভাষচন্দ্র সেখানকার ধর্মঘটের নেতৃত্ব করেন এবং তার ফলে এক সম্মানজনক মীমাংসা সম্ভব হয়। শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা শোনার জন্য সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ে উঠল। এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থীদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। সুভাষচন্দ্র দেখলেন, এই বামপন্থীদের মধ্যে আবার কমিউনিষ্ট দলই সবচেয়ে সুশৃংখল, শক্তিশালী আর সংঘবদ্ধ।

ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইএ নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেসের

আপোষমূলক মনোভাবে যুব কংগ্রেস অনেক দিন থেকেই অসন্তুষ্ট ছিল। এবারকার অধিবেশনে স্পষ্ট ধ্বনিত হলো সেই অসন্তোষের সুর। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রম ও শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রম হতে অহিংসার নামে নিষ্ক্রিয়তাবাদের কথা প্রচার করা হচ্ছিল তার সমালোচনা করেন। গীতার কর্মযোগের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, কিছু না করার থেকে কর্ম করে যাওয়া অনেক ভাল। কর্মযোগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যোগ। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই করে যেতে হবে দেশের ও দশের সেবা।

সুভাষচন্দ্রের এই ধর্মবাদ প্রচারে গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দের অনেক শিষ্য রেগে যান।

কলকাতায় যেমন সর্বদলীয় সম্মেলন। উদ্দেশ্য, নেহেরু কমিটির খসড়া আলোচনা। কিন্তু দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে কমিটির সুপারিশগুলিকে মুশলিম লীগের পক্ষ থেকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করলেন মহম্মদ আলি জিন্না। অথচ এক বছর আগে এই কলকাতায় যখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশন বসেছিল তখন সেখানে এই জিন্নাই জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল মত প্রচার করেছিলেন। এমন কি হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে যৌথ নির্বাচন প্রথাও সমর্থন করেছিলেন।

চোদ্দ দফা দাবী তুললেন জিন্না। আইন সভায় নির্বাচিত আসনের একের তিন ভাগ চাই মুসলমানদের জন্য। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে হিন্দু মহাসভা আবার মুসলমানদের বেশী সুবিধা দেয়া হয়েছে বলে সমালোচনা করতে লাগলেন নেহেরু রিপোর্টের।

আসলে সুভাষচন্দ্র দেখলেন শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করাই ভুল হয়েছে কংগ্রেসের। কেবল ভুল

হয়েছিল গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করা। স্বাধীনতার জন্য যে দল সংগ্রাম চালিয়ে যায় শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার এবং দায়িত্ব তাদেরই। কিন্তু ছোটখাটো যে সব দল দলগত স্বার্থকে দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখে এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলে তাদের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে ডাকাই অন্যায়। গোল টেবিল বৈঠকেও এমন সব দল উপস্থিত ছিল যাদের থাকার কোন অধিকার ছিল না। আসল কথা কোন দেশ দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনের অধীনে থাকলে সেখানকার কিছু লোক ও দল বিদেশী শাসকদের মুঠোর মধ্যে যাবেই।

এর পর কলকাতায় পার্কসার্কাস জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল ডিসেম্বরে। সভাপতিত্ব করলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। কিন্তু এক বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হলো এ অধিবেশনে। এর আগে দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেস কমিটির এক সভায় পণ্ডিত মতিলালের তৎপরতায় চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে এক আপোষ মীমাংসা হয়।

কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী দিল্লী চুক্তি মেনে নিলেন না। বললেন, এ চুক্তি স্ববিরোধী। বামপন্থীরা গান্ধীজীর মনোভাব ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি কি মনে করেন, আপাততঃ পূর্ণ স্বাধীনতা না চেয়ে যদি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন জারী করা হয় তাহলে বৃটিশ কি সঙ্গে সঙ্গে তা দিয়ে যাবে? অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় কি সত্যি সত্যিই গলবে?

কিন্তু তাঁরা তা বুঝুন আর নাই বুঝুন গান্ধীজীর তাতে কিছু গেল এল না। তিনি তাঁর খুশিমত এক প্রস্তাব নিয়ে এলেন। প্রস্তাবে বললেন,

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বা তার আগে বৃটিশ পার্লামেন্ট যদি নেহেরু কমিটির রচিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে তাহলে কংগ্রেস বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাপেক্ষে ঐ শাসনতন্ত্রকে পুরোপুরি ভাবেই গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি ঐ তারিখের মধ্যে

বৃটিশ পার্লামেন্টে তা গ্রহণ না করে অথবা তার আগেই তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে কংগ্রেস দেশকে করদান বন্ধ করতে এবং এই ধরনের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা মেনে চলবার নির্দেশ দিয়ে অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলবে।

বামপন্থীদের পক্ষ থেকে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন সুভাষচন্দ্র। কারণ গান্ধীজীর ঐ মূল প্রস্তাব, অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। সুভাষচন্দ্র তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে বললেন, কংগ্রেস স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না আর এই স্বাধীনতা বলতে বোঝাবে বৃটিশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ। ......স্বাধীনতার আদর্শ সমুজ্জ্বল করে রাখতে হবে। ধোঁয়া বা ধোকা নয়, স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন।

বামপন্থী অনেকের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না এ প্রস্তাব। ৯৭৩-১৩৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু দুই দলের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করলেন কিন্তু বামপন্থীরা বললেন গান্ধীজীর দিল্লীচুক্তি অস্বীকার করা উচিত হয়নি। কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অস্বীকার করা মানেই কংগ্রেসকে অসম্মান করা। সুতরাং কোন আপোষ চলতে পারে না।

অবশেষে অধিবেশন ভেঙে যেতে নেতারা চলে গেলেন। হতাশায় ম্লান হয়ে গেল কলকাতাবাসীদের মুখ। অথচ যেদিন এ অধিবেশন, সেদিন কী বিপুল উদ্দীপনা জনগণের মধ্যে দেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র, কী রাজকীয় সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল সভাপতিকে। সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারলেন না, দেশ যখন বিপ্লবের জন্য মনের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, কেন পিছিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেসের নেতারা। দেশের শ্রমিক ও যুবসমাজ যখন জেগে উঠেছে কেন তখন তাদের নেতৃত্ব দান করছেন না তাঁরা। দশ হাজার শ্রমিকের এক বিরাট শোভাযাত্রা কলকাতা কংগ্রেসের মণ্ডপে এসে হাজির। সুভাষচন্দ্রের নিজের হাতে গড়া ছাত্র

ও যুবকদের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে নেতাদের। তা দেখে গান্ধীজীর সমর্থরাও আশ্চর্য হয়ে যান।

কংগ্রেস নেতারা না চাইলেও ১৯২৯ সাল পড়তেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বৈপ্লবিক আন্দোলনের আগুন। এ আগুন জ্বলে ওঠে পাঞ্জাবে বছরের প্রথম দিকে। এর আগের বছর লাহোরে সাইমন-কমিশন বিরোধী আন্দোলনের সময় লাহোরে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা বার হয় এবং সে শোভাযাত্রা নির্মমভাবে আক্রান্ত হয় পুলিশের দ্বারা। পুলিশের তরফ থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে স্যাণ্ডার্স নামে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর। এই স্যাণ্ডার্সকে মারবার জন্য তখন থেকেই চেষ্টা করছিল পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা। এ বছরের প্রথম দিকে সে চেষ্টা সফল হয়। স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করা হয়।

এই হত্যার জন্য পাঞ্জাবের নওজোয়ান ভারত সভার অনেক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে সর্দার ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত নামে তুজন যুবকের নামে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। নওজোয়ান ভারত সভা যে যুব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল ভগৎ সিং ছিল তার নেতা।

ভগৎ সিংএর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে উঠল পাঞ্জাবের যুবকরা। বিপ্লবী হিসাবে ভগৎ সিংদের পরিবারের নাম ছিল। ভগৎ সিংএর কাকা অজিত সিংও ছিলেন একজন বড় বিপ্লবী এবং একবার তিনি লালা লাজপৎ রায়ের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বহু যুবককে ধরে কারারুদ্ধ করা হয়। বাংলা দেশেও সভা সমিতি শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে যুব আন্দোলনের কাজ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এগিয়ে চলতে থাকে। বাংলার ছাত্র ও যুবকরা পাঞ্জাবের যুব আন্দোলনের কাজকে

অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করে আর সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার দিতে থাকে ইংরেজ সরকারের দমনমূলক নীতিকে।

বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশেও যুব আন্দোলন গড়ে ওঠে।

বাংলা দেশে যুব আন্দোলনের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন যতীন দাস। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে যে বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন সুভাষচন্দ্র তার চীফ অফিসার বা জি, ও, সি ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং মেজর ছিলেন যতীন দাস।

যতীন দাসের বয়স তখন ছিল মাত্র পঁচিশ। কিন্তু এই অল্প বয়সেই স্বেচ্ছাসেবকদের সংঘবদ্ধ করা ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন যতীন দাস।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে পাঞ্জাবের যুবকরা যখন দলে দলে গ্রেপ্তার বরণ করতে লাগলেন তখন সেখানে বাংলার বিপ্লবী যুবকদের পক্ষ থেকে ছুটে গেলেন যতীন দাস। সেখানকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রেপ্তার বরণ করলেন তিনিও। জেলে রাজনৈতিক বন্দীরা সাধারণ অপরাধীদের থেকে ভাল ব্যবহারের দাবীতে অনশন ধর্মঘট করলে তাঁদের সঙ্গে যতীন দাসও অনশন করেন।

লাহোরের জেলে এই অনশন ধর্মঘট করার সময় কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বার হয় ধর্মঘটীদের সমর্থনে। তখন সুভাষচন্দ্র ও অনেক বামপন্থী কংগ্রেস নেতাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই অনশন ধর্মঘটে ১৩ই সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় যতীন দাসের। প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয় সারা দেশে। কিন্তু সারা দেশ এই মৃত্যুতে ব্যথিত হলেও মহাত্মা গান্ধী একটা কথাও বললেন না তাঁর পত্রিকা ইয়ং ইণ্ডিয়ায়, দুঃখপ্রকাশ করে অথবা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটা কথাও লেখা হলো না। এ বিষয়ে গান্ধীজীর একজন ভক্ত ও

যতীন দাসের বন্ধু গান্ধীজীর কাছে কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কিছু লিখলে এর বিরুদ্ধেই লিখতাম। তাই কিছু বলিনি বা লিখিনি।

কিন্তু যতীন দাসের দোষটা কোথায় তা তিনি খুলে বলেননি। যতীন দাসের মৃতদেহ হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছায় বিপুল লোক সমাগম হয়েছিল তখন সেখানে। এক বিরাট বৈপ্লবিক প্রেরণা পেয়েছিল বাংলার যুবকরা।

যুব আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এক বলিষ্ঠ নারী আন্দোলনও গড়ে ওঠে বাংলাদেশে। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় কাজকর্মের জন্য 'নারী কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন দেশবন্ধু। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানটি এক রকম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৮ সালে আবার সুভাষচন্দ্র কলকাতায় 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ' নামে নারীদের এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

সারা বছরটা ধরে বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় যুব সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠল। যুব কংগ্রেসের এক অধিবেশন বিরাট সাফল্য লাভ করল কলকাতায়। পুণায় মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে। আমেদাবাদের যুব সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

পাঞ্জাবে যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য সুভাষচন্দ্র গেলেন লাহোরে। লাহোর থেকে নাগপুর ও পরে বেরারের অমরাবতী।

ঠিক এই সময় বোম্বাইএর সব কাপড়ের কলে ধর্মঘট শুরু হলো। শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিল সারা বোম্বাই জুড়ে। এর নেতৃত্ব করতে লাগল কমিউনিস্ট দল। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের ঔদাসীন্যের ফলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বেড়ে গেল। তাদের কর্মীরা বেশ সুশিক্ষিত ও শৃংখলাবদ্ধ।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের

গ্রেপ্তার করা হতে লাগল। গ্রেপ্তার করে সবাইকে দিল্লীর কাছে মীরাট শহরে নিয়ে আসা হলো। সকলের বিরুদ্ধে এক সাধারণ মামলা রুজু করা হলো। নাম দেয়া হলো মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা। অভিযোগে সরকার পক্ষ থেকে বলা হলো, অভিযুক্তগণ বৃটিশ সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছেন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংঘের সাহায্যে সোভিয়েট ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে বর্তমান কমিউনিস্ট নেতা ডাঙ্গে এবং বহু মেয়ে ছিলেন।

মীরাট ছোট শহর ; তাই সেখানে কোন বিক্ষোভ হবে না বলেই অভিযুক্তদের সেখানে বিচারের জন্য আনা হয়েছিল। এই বিচারের রায় বেরিয়েছিল চার বছর পর। অনেকেরই কারাদণ্ড ও যাবজ্জীবন দীপান্তর পর্যন্ত হয়েছিল।

মীরাট মামলার বিচারের সময় বৃটেনে শ্রমিক দল জয়ী হওয়ায় সেখানকার মন্ত্রীসভা ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা ও তার উন্নতির জন্য এক লেবার কমিশন পাঠায়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন হুইটলি। এই কমিশনে বোম্বাই থেকে এন, এম, যোশী ও লাহোর থেকে চমনলালকে সদস্য হিসাবে নেয়া হয়েছিল। এঁরা দুজনেই ছিলেন দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। কিন্তু এর পর নাগপুরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসল তাতে হুইটলি কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এবং বামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় দক্ষিণ পন্থীরা বেরিয়ে গিয়ে 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' নামে শ্রমিক সংস্থা স্থাপন করলেন।

এই সময় সারা দেশে একই সঙ্গে যুব আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ও নারী আন্দোলন চলতে থাকে ব্যাপকভাবে। বাংলা দেশে গভর্ণরের মন্ত্রীসভা নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যদের কাছে হেরে যেতে থাকে। মে মাসে গভর্ণর আইন পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন

নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেও কংগ্রেস সদস্যরা আরও বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য সরকার ফরওয়ার্ড পত্রিকার বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করে, আদালত তাতে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা করে। ফলে ফরোয়ার্ড পত্রিকা পরের দিন উঠে যায় কিন্তু একই আদর্শ প্রচারের ব্রত নিয়ে সেই দিন থেকেই তার জায়গায় লিবার্টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

২১শে জুলাই তারিখে হুগলিতে জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, হে বাংলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী অতএব তোমরা সমস্ত জাতিকে জাগাবার ভার গ্রহণ করো।

যেদিন হতে ভারত পরাধীন হয়েছে সেদিন হতে ভারত সমষ্টিগত সাধনা ভুলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সব শক্তি নিয়োগ করেছে। ফলে কত শত মহাপুরুষ আমাদের দেশে আবির্ভূত হওয়া সত্বেও জাতি আজ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নেই—একথা আজ সকলকে বুঝতে হবে।··· পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে হলে সমস্ত জাতিকে ক্ষেপে উঠতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত ও অর্থনৈতিক বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠবে কেন?

ভাষণের শেষের দিকে বাংলার যুবকদের কাছে এক জ্বালাময়ী আহ্বান জানিয়ে বললেন, ভ্রাতৃমণ্ডলী! আজ আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করব। সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা মন্ত্র প্রচার করবার জন্য তোমরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়। যাও চীনা ছাত্রদের মত রুশ তরুণদের মত চাষীর পর্ণকুটীরে ও মজুরদের আবর্জনাপূর্ণ ভাঙ্গা ঘরে। তাদের জাগাও। আর যাও মাতৃজাতির সমীপে।

পরে পাঞ্জাবের এক ছাত্র সম্মেলনেও সুভাষচন্দ্র বললেন, আমাদের ঘরের পাশেই চীন দেশ। তার ইতিহাসের একটি যুগ পর্যবেক্ষণ করুন। দেখতে পাবেন মাতৃভূমির জন্য চীনের ছাত্রেরা কি করেছেন। ভারতবর্ষের জন্য আমরা কি সেটুকু করতে পারি না? আধুনিক চীনের নবজাগরণ ত ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। একদিকে তাঁরা গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ও প্রতিটি কারখানায় গিয়ে স্বাধীনতার নতুন বাণী প্রচার করেছেন, অপর দিকে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেশকে সংঘবদ্ধ করেছেন। ভারতবর্ষে আমাদেরও তাই করতে হবে। স্বাধীনতার কোন সহজ নির্বিঘ্ন পথ নেই। স্বাধীনতার পথে যেমন আঘাত আছে বিপদ আছে, তেমনি গৌরব ও অমরত্ব আছে।

স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে অবিনশ্বর গৌরব। আসুন আজ আমরা সম্মিলিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করি। সেই উদ্যমে জীবনপাত করে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী হবার যোগ্য হয়ে উঠি। বন্দেমাতরম!

এদিকে আবার সংকট ঘনিয়ে এল জাতীয় কংগ্রেসের মাঝে। জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি হঠাৎ ভারতের সব আইনসভা হতে কংগ্রেসী সদস্যদের পদত্যাগ করতে নির্দেশ জারি করল। এই নির্দেশ মেনে নিতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র। তিনি বুঝলেন, গান্ধীজীর প্রভাবেই এই নির্দেশ দিয়েছেন পণ্ডিত মতিলাল।

তখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গঠিত হত তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্য নিয়ে। এই সদস্যরা ছিলেন বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি। প্রতি বছর পনের জন সদস্য নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হত। কংগ্রেসের এই কার্যনির্বাহক সমিতির বেশীর ভাগ সদস্যই তখন গান্ধীজীর দ্বারা প্রভাবিত হন।

সামনেই আসছে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন। এ অধিবেশন বসবে লাহোরে জুলাই মাসে। প্রাদেশিক কমিটিগুলির

এক বিরাট অংশ গান্ধীজীকে সভাপতি হতে বলল। কিন্তু গান্ধীজী মনোনীতি করলেন পণ্ডিত জওহরলালকে। ফলে বামপন্থীরা ক্ষুব্ধ হলেন। ভাবলেন, বামপন্থী প্রগতিবাদী জওহরলালকে নিজের মতে ও দলে টেনে আনার এক সুন্দর কৌশল ছাড়লেন গান্ধীজী।

১৯২০ সাল থেকে পণ্ডিত জওহরলাল গান্ধীজীর সমর্থক হয়ে উঠলেও ১৯২৭ সালে ইউরোপ থেকে ফিরে এসেই তিনি নিজেকে সমাজবাদী বলে প্রচার করতে থাকেন এবং সংস্কার বিরোধী প্রবীণ নেতাদের বিপক্ষে কংগ্রেসে বিরোধী বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে থাকেন।

সবাই বলল, কোন বামপন্থী নেতার সভাপতিত্ব করা উচিত হবে না। কারণ তাঁর কোন কথা খাটবে না। গান্ধীজী যা বলবেন তাই হবে। কিন্তু আশ্চর্য! এই কংগ্রেসেই সকলকে অবাক করে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিজেই তুললেন গান্ধীজী। সে প্রস্তাব গৃহীত হলো সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। অথচ এর আগে বরাবরই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এসেছেন গান্ধীজী। সুভাষচন্দ্রকে দূরে সরিয়ে দিয়ে জওহরলালকে কাছে টেনে আনবার জন্যই যেন এটা করলেন গান্ধীজী।

নতুন ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান হলো না সুভাষচন্দ্রের। শুধু তাই নয়, অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যে দুটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন তার কোনটিই গৃহীত হলো না। অথচ দুটি প্রস্তাবই ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর একটিতে সুভাষচন্দ্র বললেন, শুধু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আসবে না। দেশের স্বাধীনতার জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। দেশের মধ্যে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এর জন্য গড়ে তুলতে হবে পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী এক জাতীয় সরকার, যেমন করেছিল আয়ার্ল্যাণ্ড। আর গড়ে তুলতে হবে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

আর একটি প্রস্তাবে বলেছিলেন, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গড়ে তুলতে হবে নির্বাচনের ভিত্তিতে।

ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্রের নামটি রাখবার জন্য অনেকেই অনুরোধ করলেন গান্ধীজীকে। তাঁরা বললেন, অনেক বামপন্থী নেতাকেই বাদ দেওয়া হয়েছে নতুন কমিটিতে। তা হোক, তবে সুভাষের নামটা থাক।

কিন্তু গান্ধীজী কারো কোন কথা শুনলেন না। সমস্ত অধিবেশনটি কার্য্যতঃ তিনিই পরিচালনা করলেন। একজন কুশলী রাজনীতিবিদের মত তিনি ছদিকই বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন দেখলেন, পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সারা দেশ ক্ষেপে উঠেছে তখন তিনি সে প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য দেশ যাতে অহিংস সংগ্রামের দিকে এগিয়ে না যায় তার জন্য দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিলেন তিনি। সমষ্টিগত চাপের সঙ্গে নিজের অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খাপ খাইয়ে নিয়ে কৌশলে জনপ্রিয়তা অর্জনের এ এক অদ্ভুত কৌশল।

একদিন নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী নামে একজন সহকর্মীকে বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র, দেশকে ভালবাসেন গান্ধীজী ঠিক, কিন্তু নিজেকে উনি তার থেকেও বেশী ভালবাসেন।

আর একদিন তিনি বললেন, আমি মনে করি আমার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও মতামত প্রবীণ রাজনীতিবিদদের কাছে বিলিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

গয়া কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একদিন স্বরাজ্য পার্টি গড়ে তুলেছিলেন দেশবন্ধু। আর আজ তাঁরই ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র লাহোর কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে 'কংগ্রেস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' নামে এক নতুন দল গড়ে তুললেন।

মাতৃপ্রতিম বাসন্তী দেবীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে একটি তারবার্তায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, পারিপার্শ্বিকতা আর দলে-

ভারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই এই পৃথক ব্যবস্থার সূচনা হলো, যেমন হয়েছিল গয়ায়। গুরু দেশবন্ধুর শক্তি আর তোমার অমোঘ আশীষ আমাদের সম্বল হোক।

এরপর বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসও দুটি দলে ভাগ হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। এবার সুভাষ বিরোধীরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করালেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে। অনুশীলন সমিতি, বিপিন গাঙ্গুলির আত্মোন্নতি দল, খাদি গোষ্ঠী ও আনন্দবাজার গোষ্ঠী গেল সেনগুপ্তের দলে আর যুগান্তর দল ও কিছু বন্ধুবান্ধব রইল সুভাষচন্দ্রের দলে, দেশবন্ধুর জামাতা সুধীর রায় মিটমাটের চেষ্টা করতে লাগলেন।

শ্রীসেনগুপ্তের এলগিন রোডের বাড়িতে দুই দলের নেতাদের বৈঠক বসল। কিন্তু কোন মিটমাট না হওয়ায় পরে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল এসে মিটিয়ে দিলেন।

॥ দশ ॥

১৯৩০ সালে নতুন বছরের শুরু হতেই সারা দেশ তাকিয়ে রইল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দিকে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কার্যকরী করে তোলার জন্য দেশবাসীকে কি নির্দেশ দেয়, তা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল প্রতিটি কংগ্রেসকর্মী।

মহাত্মা গান্ধী বললেন, দেশে সন্ত্রাসবাদের কাজকর্ম বেড়ে গেছে। তারা একমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া সভা সমিতি প্রস্তাব বক্তৃতা প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ কোন পথই পছন্দ করে না। সুতরাং এখন আইন অমান্য আন্দোলনই দেশকে আসন্ন অরাজকতা হতে রক্ষা করতে পারে।

২৩শে জানুয়ারি বন্দীমুক্তি আন্দোলনের শোভাযাত্রা পরিচালনা

করার সময় গ্রেপ্তার হলেন সুভাষচন্দ্র। বিচারে কারাদণ্ড হলো। সঙ্গে ছিলেন কিরণশংকর রায়, ডাক্তার যতীন দাশগুপ্ত, সত্য গুপ্ত আর বীরেন মুখুয্যে। তার দিনকতক আগে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী ও নৃপেন ব্যানার্জীর এইভাবে কারাদণ্ড হয়েছিল।

আগের বছর সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ অপরাধীদের থেকে পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থার নীতি নেন। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা অনুসারে রাজবন্দীদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী বিভাগ করেন। এই নীতি রাজবন্দীরা মেনে নিতে পারেননি। তাই তখন বিভিন্ন জেলে প্রায়ই অশান্তি হত।

একদিন জেলের ভিতর রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার হতে দেখে সত্যাগ্রহ করেন সুভাষচন্দ্র। তিনি ঘর হতে বেরিয়ে এসে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁকে জেলার এসে ভয় দেখানো সত্ত্বেও তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। জেলার যোমদণ্ড হুকুম দিলেন, গুলি করো।

সুভাষচন্দ্র একটুও ভয় না পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বুকের জামাটা সরিয়ে বললেন, সেই ভাল, করো গুলি।

কিন্তু পল্টনের হাবিলদার গুলি করতে না যাওয়ায় জেলারের হুকুমে কয়েকজন ওয়ার্ডার লাঠি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে দেয় সুভাষচন্দ্রকে।

এদিকে ২৬শে জানুয়ারি তারিখে মহাত্মা গান্ধীর তৈরি স্বাধীনতার এক ইস্তাহার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করে জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করে। ইস্তাহারে স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়েছিল,

আমরা বিশ্বাস করি, অন্য যে কোন জাতির মত আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করবার জন্য স্বাধীন হওয়ার, আপন আপন শ্রমের ফল ভোগ করার ও জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু অর্জনের

অবিচ্ছেদ্য অধিকার ভারতবাসীর আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি, যদি কোন সরকার জাতিকে এইসব অধিকার হতে বঞ্চিত করে এবং তাদের উপর নির্যাতন চালায় তাহলে তাকে পরিবর্তন বা উচ্ছেদ করবার অধিকার সে জাতির আছে।

ভারতে বৃটিশ সরকার কেবল যে ভারতবাসীকে তাদের স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করেছে তা নয়, এ সরকার গড়ে উঠেছে জনগণের শোষণের উপর এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিক হতে ভারতকে ধ্বংস করেছে। অতএব আমাদের বিশ্বাস ভারতকে অবশ্যই বৃটিশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে।

যে শাসন আমাদের দেশে এই চার রকমের বিপর্যয় ঘটিয়েছে তাকে আর মেনে চলা ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই মনে করি। যাই হোক, আমরা স্বীকার করি যে, স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্টতম উপায় হিসাবে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। অতএব বৃটিশ সরকারের সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে সব যোগাযোগ রাখা হয়েছে, যতদূর সম্ভব তা হতে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করব এবং করবন্ধ ও আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হব।

আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, প্ররোচনা সত্ত্বেও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করে আমরা যদি কেবল আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য প্রত্যাহার করে নিয়ে করদান বন্ধ করতে পারি তাহলে এই বর্বর শাসনের অবসান ঘটবেই। অতএব এতদ্দ্বারা আমরা ভাবগম্ভীরভাবে এই সংকল্প গ্রহণ করছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সময়োচিত যে সব নির্দেশ প্রচার করে থাকে সেগুলি আমরা কার্যে রূপদান করব।

বিরাট উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আইন অমান্য আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র তখনও

জেলে। সঙ্গে আরও অনেক কংগ্রেসকর্মী। জেলের একটি ঘরে এক কোণে কাপড় টাঙ্গিয়ে আড়াল করে সেই জায়গায় পড়াশুনা করতেন সুভাষচন্দ্র। পুরো একটি বছর কাটাতে হবে।

এদিকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার আগে তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় তাঁর স্বাধীনতার মর্ম ব্যাখ্যা করে এগার দফা দাবী উত্থাপন করেন। এই দাবীগুলি হলো, মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ, টাকার মূল্য হ্রাস, ভূমিরাজস্ব শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমানো, লবণকর রদ, সামরিক খরচ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমানো, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেতন অর্ধেক কমানো, বিদেশী কাপড়ের উপর শুল্ক ধার্য, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, সি, আই, ডি-র বিলোপসাধন, আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স দান ও ভারতীয় জাহাজের জন্য উপকূল সংরক্ষিত আইন প্রবর্তন।

এই এগার দফা দাবী জানিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখলেন গান্ধীজী। এইভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের মধ্যে আপোষের ফাঁক রেখে দিলেন। গান্ধীজীর এই নীতিতে সন্তুষ্ট হলেন না সুভাষচন্দ্র। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আমি হলাম চরমপন্থী—হয় ষোল আনা না হলে কিছুই নয়—এই আমার নীতি।

ফেব্রুয়ারিতে একেবারে মনস্থির করে ফেললেন গান্ধীজী। দোলায়িত ভাবটা কেটে গেল।

আইন অমান্য চালাবার জন্য কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটি সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করল গান্ধীজীকে। লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে ভারতের সব আইনসভা হতে কংগ্রেস সদস্যরা একযোগে পদত্যাগপত্র পেশ করলেন।

এবার আন্দোলনের শুরুতে আগের থেকে অনেক বেশী দৃঢ়তা, অনমনীয়তা দেখালেন গান্ধীজী। ২৭শে ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা করলেন,

এবার আমাকে গ্রেপ্তার করলে নীরব নিষ্ক্রিয় অহিংসা নয় বরং

সবচেয়ে সক্রিয় ধরণের অহিংসাকে কাজে লাগানো হবে যার ফলে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সংগ্রামের শেষে একজন অহিংস দেশসেবকও জীবিত না থাকেন···আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, যাঁরা আমার আশ্রমের শৃংখলাবিধি মেনে নিয়েছেন এবং আমার কর্মপ্রণালীর কর্ম সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন তাঁদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করাই আমার অভিপ্রায়।

তিনি আরও ঘোষণা করলেন, হিংসাত্মক শক্তিগুলিকে সংযত রাখার জন্য সবরকমের চেষ্টা করা হলেও একবার আইন অমান্য শুরু হলে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আইন অমান্যকারীও মুক্ত বা জীবিত থাকবেন ততক্ষণ এ আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না বা হবে না।

এর আগে অসহযোগ আন্দোলনের সময় উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরিতে ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বারদৌলিতে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে সহসা সব আন্দোলন বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেন গান্ধীজী। তখন সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীরা সমর্থন করতে পারেননি গান্ধীজীকে। এবার তাঁরা খুশি হলেন গান্ধীজীর ঘোষণায়।

গান্ধীজী প্রথমে ঠিক করলেন লবণ আইন অমান্য করে শুরু করবেন আন্দোলন। তারিখ ঠিক হলো ১২ই মার্চ। সমুদ্রের জল থেকে অথবা মাটি থেকে লবণ তৈরি করায় দেশের জনগণের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে ও লবণ-কর ধার্য করে লবণের দাম বাড়িয়ে দিয়ে দেশের জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে সরকার।

২রা মার্চ তারিখে বড়লাটকে এক পত্র লিখে এই আইনের প্রতিবাদ করেন গান্ধীজী, যদি আপনি এর প্রতিকার না করেন এবং আমার পত্র আপনার হৃদয় স্পর্শ না করে তাহলে এই মাসের বারো তারিখে আশ্রমের সহকর্মীদের নিয়ে আমি লবণ আইনের বিধানগুলি অমান্য করবার জন্য এগিয়ে যাব। এই জাতীয় আইনকে আমি সবচেয়ে অন্যায় বলে মনে করি। যেহেতু মূলতঃ দেশের গরীব

মানুষদের জন্যই স্বাধীনতা আন্দোলন, এই অন্যায়ের প্রতিরোধ হতেই সে আন্দোলনের সূচনা হবে।

ভারতের বড়লাট ও বৃটিশ মন্ত্রীসভা পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে না পারায় গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করলেন গান্ধীজী। বড়লাট গান্ধীজীর চরমপত্রের উত্তরে জানালেন, আইন লংঘন করাই যখন গান্ধীজীর অভিপ্রায় তখন আর বলার কিছু নেই।

১২ই মার্চ তারিখে তিন সপ্তাহব্যাপী এক অভিযান শুরু করলেন গান্ধীজী। তাঁর গন্তব্যস্থল হলো সমুদ্র উপকূলবর্তী ডাণ্ডী গ্রাম। পথের দুধারে গ্রামগুলির অধিবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। বললেন, তোমরা সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে করবন্ধ আন্দোলনে যোগ দাও।

৬ই এপ্রিল তারিখে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন গান্ধীজী। তাঁর ডাকে প্রচুর সাড়া পেলেন জনগণের কাছ থেকে। সমুদ্রে স্নান করে সমুদ্রের পারে পড়ে থাকা লবণের টুকরোগুলি কুড়িয়ে আইন অমান্য শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে শুরু হলো বে-আইনী লবণ উৎপাদন, বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে সব রকমের বৃটিশ পণ্য বর্জনের জন্যও তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠল সারা দেশে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ পিকেটিং করে যেতে লাগলেন বিভিন্ন জায়গায়।

সুভাষচন্দ্র ও বাংলা দেশের অনেক বামপন্থী নেতা জেলে থাকলেও জোর আন্দোলন চলতে লাগল কলকাতায়। এক প্রকাশ্য জনসভায় কলকাতা পৌরসভার মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য পাঠ করে আইন অমান্য শুরু করেন।

গান্ধীজীর আহ্বানে দেশের নারীরাও বিশেষভাবে সাড়া দেয়। অনেক নারী স্বেচ্ছায় আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত গোঁড়া ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়েরাও কারাবরণ করবার জন্য এগিয়ে আসেন।

গান্ধীজী বললেন, শুধু কারাবরণ নয়, দৈহিক নির্যাতনও সহ্য করতে হবে এবং এই নির্যাতন ভোগই হবে তাদের গর্বের বস্তু। যদি তাদের নির্যাতন করা হয় তাহলে তার ফলে অবিলম্বে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

সরকার প্রথমে গ্রাহ্য করেনি। পরে আন্দোলনের সাফল্য দেখে একের পর এক দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলো। ২৭শে এপ্রিল এক প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করে দেশের সংবাদপত্রগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে এলো। তারপর শুরু হলো ব্যাপক গ্রেপ্তার। ষাট হাজারেরও বেশী আইন অমান্যকারী সারা দেশে গ্রেপ্তার বরণ করলেন। দেড় হাজারেরও বেশী নারী গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হলেন। দেশের সব জেল প্রায় ভরে গেল।

সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলো। কংগ্রেসীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবারও ব্যবস্থা হলো। আন্দোলন দমন করবার জন্য সৈন্য তলব করা হলো বিভিন্ন জায়গায়। আন্দোলনকারী সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে চুরি, দাঙ্গা হীন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কোন সত্যাগ্রহী আদালতে কখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি।

আইন অমান্য আন্দোলন সবচেয়ে জোরদার হয়ে ওঠে বোম্বাই, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব আর বাংলায়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপ নেয়। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটি অঞ্চলে বন-আইন অমান্য করে লোকে সরকারী নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে গাছ কাটতে থাকে। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলায় চাষীরা কর ও ভূমিরাজস্ব দেয়া বন্ধ করে দেয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফফর খানের নেতৃত্বে করবন্ধের সঙ্গে সরকার বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রবল হয়ে ওঠে। লাল পোষাক পড়া এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করে সম্পূর্ণ

অহিংসভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য গফফর খানকে সীমান্ত গান্ধী নামে অভিহিত করতে থাকে দেশের লোক।

জেলের মধ্যেও রাজবন্দীদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। কলকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতাদের উপরও অত্যাচার করা হয়। বাংলা দেশে চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরে সবচেয়ে প্রবল আকার ধারণ করে আন্দোলন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে ২৩শে এপ্রিল তারিখে একদিনে কয়েকশো লোককে গুলি করে মারা হয়। পেশোয়ারে কয়েকজন নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল জনতা। এমন সময় পিছন থেকে সৈন্যরা আক্রমণ করে। পরে কংগ্রেস থেকে নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, সীমান্ত প্রদেশে গাড়োয়ালী সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাতে রাজী হয়নি। তখন তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সামরিক আদালতে বিচার করা হয় এবং অন্য সৈন্যবাহিনীর উপর গুলি করার হুকুম দেয়া হয়।

শুধু সীমান্ত প্রদেশ নয়, যেখানেই আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার হয় সেইখানেই তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করে রিপোর্ট প্রকাশ করে কংগ্রেস। এই সব রিপোর্ট থেকে ও গান্ধীজীর ইংরেজ শিষ্যা কুমারী ম্যাডেলিন স্লেডের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তখন সরকার সত্যাগ্রহীদের উপর কী ধরনের অত্যাচার করত। সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে মাথায়, বুকে, পেটে লাঠি দিয়ে মারা হত ও গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারা হত। মারার আগে তাদের উলঙ্গ করে ফেলা হত। অচৈতন্য হয়ে না পড়া পর্যন্ত অণ্ডকোষ চেপে ধরে পীড়ন করা হত। তাদের মারতে মারতে হাত পা ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। আহতদের কাঁটা ঝোপে অথবা লবণ জলে ফেলে দেয়া হত। অনেক সময় তাদের উপর ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়া হত, গায়ে আলপিন বা কাঁটা ফুটিয়ে দেয়া হত।

৮ই মে তারিখে বড়লাটের কাছে একখানি পত্রে গান্ধীজী দুঃখের সঙ্গে লেখেন, আমি আশা করেছিলাম, আইন অমান্যকারীদের সঙ্গে সরকার ভদ্রভাবে লড়াই করবেন। তাঁদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার যদি শুধু আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হতেন তাহলে আমার কিছু বলার থাকত না। তা না করে পরিচিত নেতাদের প্রতি যখন কমবেশী আইনসম্মত ব্যবহার করা হয়েছে তখন সাধারণ জনগণের উপর প্রায়ই বর্বরভাবে অশোভনভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। এগুলি যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হত তাহলে এগুলিকে উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু বাংলা, বিহার, উৎকল, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী ও বোম্বাই হতে গুজরাটের অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করে আমার কাছে বহু সংবাদ এসেছে; এবং আমার কাছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। করাচী, পেশোয়ার ও মাদ্রাজে বিনা প্ররোচনাতেই গুলি চালানো হয়েছে এবং তার কোন প্রয়োজন ছিল না।

তাছাড়া লবণ সত্যাগ্রহীদের গায়ের হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। মথুরায় একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট দশ বছরের এক ছেলের কাছ থেকে জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন। জনতার চাপে পড়ে পরে অবশ্য পতাকাটি ফেরৎ দেন।

বাংলা দেশের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন সবচেয়ে গুরুতর রূপ ধারণ করে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে। দুই জায়গাতেই পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী খুব বেশী অত্যাচার করে আন্দোলনকারীদের উপর। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের দল।

এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাই এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। সারা দেশ আশ্চর্য হয়ে গেল। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী যুবক একদিন হঠাৎ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ করেন। প্রহরীদের সব গুলি করে হত্যা করে গোটা অস্ত্রাগারটি দখল করে নেন। যতদূর সম্ভব অস্ত্র নিয়ে বাকি অস্ত্র

নষ্ট করে ফেলেন। শহরের বাইরেই পাহাড়। সেই পাহার সংলগ্ন জংগলে গিয়ে লুকিয়ে থেকে দিনের পর দিন গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান বিপ্লবীরা। দিনকতক সরকারী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ চলার পর প্রথম দলটি গ্রেপ্তার হয়। সারা চট্টগ্রাম শহরে ও জেলায় সামরিক আইন জারি হয়।

দলের নেতা সূর্য সেন ও অনেক সদস্য পালিয়ে গিয়ে অনেক দিন আত্মগোপন করে থাকেন। যাঁরা ধরা পড়েন তাঁদের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। তাঁদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

লবণ উৎপাদনের অধিকার দাবী করে বড়লাটের কাছে আবার চিঠি লেখেন গান্ধীজী। তখন মাসের প্রথম। হঠাৎ ৬ই মে তারিখে সরকার গ্রেপ্তার করল গান্ধীজীকে। বিনাবিচারে জেলে আটক করে রাখল অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এক বিরাট উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সোনারপুর শহর। ওখানকার সব কারখানার শ্রমিকরা আইন অমান্য করে সব বিধিনিষেধ ভেঙ্গে ফেলে। পুলিশদের সঙ্গে যুদ্ধে পুলিশদের হারিয়ে দিয়ে গোটা শহরকে দখল করে নিয়ে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেয় সর্বত্র। পরে বোম্বাই থেকে সৈন্য গিয়ে আবার দখল করে নেয় শহরটাকে। প্রকাশ্যে কেউ খদ্দরের তৈরি গান্ধী টুপি পড়লেই তাকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করতে লাগল।

জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রচারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। লণ্ডনের ডেইলি হেরাল্ডের প্রতিনিধি জর্জ শ্লোকম্বে নামে একজন বৃটিশ সাংবাদিক শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। গান্ধীজী তখন পুণার জেলে। জেলে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন শ্লোকম্বে। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন,

কোন শর্তে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করতে রাজী আছেন।

গান্ধীজী আগে যা বলেছিলেন এখনও তাই বললেন। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সব রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। লবণ কর, মদ, আফিং, বিদেশী কাপড় প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। গান্ধীজী আগে যে সব দাবী তাঁর চিঠিতে বড়লাটকে জানিয়েছিলেন সেবিষয়েও আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। গোল টেবিল বৈঠকের আগে এইসব শর্তগুলি মেনে নিতে হবে সরকারকে।

এরপর কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলেন শ্লোকম্বে। কিন্তু তিনিও তাই বললেন। তবে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ একটি বিবৃতির খসড়া তৈরি করলেন আর সেটি সমর্থন করলেন পণ্ডিত মতিলাল। এই বিবৃতিতে একটা জিনিস স্পষ্ট ছিল, সেটা এই যে বৃটিশ ও ভারতীয় সরকার ভারতের জন্য পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবী সমর্থন করবেন এই মর্মে আশ্বাস দিতে হবে। এই আশ্বাস দিলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।

সুভাষচন্দ্র তখনও জেলে। গান্ধীজীকে তখনও মুক্তি দেয়া হয়নি। ইতিমধ্যে পণ্ডিত মতিলাল ও জওহরলাল নেহেরুকেও গ্রেপ্তার করে এলাহাবাদের কাছে নৈনি জেলে রাখা হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে তখন গান্ধীবাদী উদারপন্থীদের প্রাধান্য চলছিল। তাঁদের মধ্যে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও এম, আর, জয়াকার আপোষের চেষ্টা করতে লাগলেন। পারস্পরিক আলোচনার সুবিধার জন্য পণ্ডিত মতিলাল ও জওহরলালকে নৈনি থেকে বারবেদনার জেলে গান্ধীজীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

১৯৩০ সালের ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে জোর

আলোচনা চলে। সেখানে আপোষকারী তুজন ও পণ্ডিতজীরা ছাড়াও ছিলেন সরোজিনী নাইডু আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। একটি যুক্ত বিবৃতি মারফৎ ঐদিন ঘোষণা করা হয়, ভারতকে স্বেচ্ছায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে আসার অধিকার দিতে হবে; জনগণের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা একটি জাতীয় সরকার গঠনের অধিকার দিতে হবে আর সরকারী ঋণ সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি বসাতে হবে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের এই সব দাবীর একটিও মেনে নিলেন না বড়লাট লর্ড আরউইন। ঠিক এই সময় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গুরুতরভাবে অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। তখন সেপ্টেম্বর মাস। এই মাসের ২৫শে সুভাষচন্দ্রকেও মুক্তি দেয়া হয়।

জেল থেকে বেরিয়ে এসেই পৌরসভার কাজে মন দিলেন সুভাষচন্দ্র। জেলে থাকাকালেই মেয়র নির্বাচিত হন। তখন বাংলা প্রাদেশিক কমিটির সভাপতিও ছিলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে ঝগড়া চলছিল তার জের তখনও মেটেনি। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে নরমপন্থী দল বিরোধিতা করছিলেন সুভাষচন্দ্রের। পৌরসভার নির্বাচনের সময় সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রমোহনকে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রই জয়ী হন।

বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ তবু চলতে থাকে। এই বিরোধ মেটাবার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল বাংলা দেশে ছুটে আসেন তুটি দলকে এক করে প্রদেশ কংগ্রেসের মর্যাদা ও শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর চেষ্টা কিছুটা সফল হয়। কোন রকমে একটা মীমাংসা হয়।

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে গোল টেবিলের প্রথম অধিবেশন বসল লণ্ডনে। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন বৃটিশ

প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। তাতে যোগদান করেন মোট উননব্বই জন সদস্য। বৃটিশ দলগুলো থেকে ষোল, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ষোল এবং সাতান্ন জন প্রতিনিধি যোগদান করেন বৃটিশ ভারত হতে। কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি এ বৈঠকে যোগদান করেননি।

এই সম্মেলনে ঠিক হয় ভারতের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের অর্থাৎ তাতে বৃটিশ ভারতের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে দেশীয় রাজ্যগুলি। আর ঠিক হয়, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থ প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান দপ্তর থাকবে বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীনে।

বৈঠকের শেষের দিকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেই ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হবে। ভারতের উদারপন্থী নেতারা এই সিদ্ধান্ত খুশির সঙ্গে মেনে নিলেন। একমাত্র জাতীয়তাবিরোধী মুসলমান প্রতিনিধিরা বললেন, এতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত তাঁরা মানবেন না। মহম্মদ আলি জিন্না এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলে গোল টেবিল বৈঠক ভেঙ্গে গেল।

॥ এগার ॥

প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত উদারপন্থীরা মেনে নিলেও সুভাষচন্দ্র বা তাঁর দলের কেউ তা মানতে পারলেন না। বিপ্লবী বাংলার সংগ্রামী ঐতিহ্য কোন পথ না পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এ বিহ্বলতা নিতান্তই সাময়িক। বিপ্লবী বাংলার বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র নতুন উদ্যমে প্রস্তুত হয়ে উঠতে লাগলেন নতুন আন্দোলনের জন্য। জেলায় জেলায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। সারা ভারতে স্বদেশী জিনিস প্রচারের জন্য স্বদেশী লীগ গড়ে তুললেন।

দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো দেশের উদারপন্থী নেতারা। দেশীয় রাজন্যবর্গকে খুশি করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে ও কিছু কিছু সংবিধানগত সুযোগ সুবিধা দিয়ে বৃটিশ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তিটাকে পাকা করে যাচ্ছে, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রামী উদ্যমকে নষ্ট করে দিচ্ছে একে একে। অথচ উদারপন্থী নেতারা তা বুঝেও বুঝছে না।

জানুয়ারি মাসের প্রথমেই তিনি বহরমপুরের এক জনসভায় রাজবন্দীদের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন। বহরমপুর থেকে বহু জায়গায় আমন্ত্রিত হলেন। বহরমপুর থেকে প্রথমে গেলেন জিয়াগঞ্জ। তারপর মালদহ। কিন্তু তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে যাবার আগেই সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে সভা সমিতি নিষিদ্ধ করে দিল সেখানে। আলমুরা স্টেশনে সুভাষচন্দ্র নামতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সাতদিন পর মুক্তি পেলেন জেল থেকে।

দেখতে দেখতে ২৬শে জানুয়ারি এসে গেল। সেদিন স্বাধীনতা দিবসের দ্বিতীয় বার্ষিকী। গত বছরে এই দিন পূর্ণ স্বরাজের শপথ নিয়েছিল দেশবাসী। কলকাতা পৌরসভার মেয়র হিসাবে এই দিনটি বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করবার মনস্থ করলেন সুভাষচন্দ্র।

তিনি ঠিক করলেন, মনুমেন্টের পাদদেশে এক বিরাট মিছিল নিয়ে গিয়ে জনসভা করবেন সেখানে।

নির্দিষ্ট সময়ে পৌরসভার অফিস হতে কয়েকজন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা করে বেরিয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলির নেতৃত্বে একটি মহিলাদের মিছিলও এগিয়ে যেতে লাগল মনুমেন্টের দিকে। হঠাৎ একজন পুলিশ অফিসার এসে নিষেধ করলেন সুভাষচন্দ্রকে। বললেন, পুলিশ কমিশনার

নিজে আপনাকে অনুরোধ করেছেন। আপনি এ মিছিল পরিচালনা করবেন না।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র রাগের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আপনার বড়কর্তাকে বলবেন যে আমি আইন অমান্য করবই।

যথাসময়ে, শোভাযাত্রাটি চৌরঙ্গী রোড পার হতেই পুলিশ বাধা দিল সুভাষচন্দ্রকে। তাঁর হাত হতে জোর করে জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে দিল। পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে গিয়ে আহত হলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর দুটি আঙ্গুল ভেঙ্গে গেল। কপাল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। তবু তিনি অবিচল, অনমনীয়।

সেখান থেকে জোর করে তাঁকে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা আটকে রাখা হলো। কিন্তু একটু জল পর্যন্ত তাঁকে খেতে দেয়া হলো না। এক ফোঁটা ওষুধও দিল না। পরের দিন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁকে হাজির করা হলে তিনি বললেন,

একজন অসহযোগী হিসাবে আমি আদালতে কোন উকিলের সাহায্য গ্রহণ করতে চাই না। আমি শুধু বন্দীদের সঙ্গে লালবাজার লকআপে কি ধরনের ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আহত বন্দীদের একটু ওষুধ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। আপনি নিজে সেখানে যান ত দেখবেন সেটা একটা আস্ত নরক।

ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবার্গ বললেন, আপনি আপনার অভিযোগ লিখিতভাবে দিন।

সুভাষচন্দ্র বললেন, আমি লিখতে পারছি না। আমার হাতটি আহত।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, আমি লিখে নিচ্ছি।

বিচারে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হলো সুভাষচন্দ্রের।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও মানতে পারেননি গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি তখন তাঁর এলাহাবাদের বাড়িতে

শয্যাগত। উদারপন্থী নেতারা লণ্ডন থেকে দেশে ফিরবার আগেই তার করে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন গান্ধীজী পণ্ডিত মতিলালকে।

বৈঠক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড আরউইন ঘোষণা করলেন, ভারত বৃটিশ প্রজাতন্ত্রের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পাবে। এই ঘোষণার পরই গান্ধীজী ও অন্যসব নেতাদের ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯৩১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি উদারপন্থী নেতাদের অনুরোধে দিল্লীতে গিয়ে লর্ড আরউইনের সঙ্গে দেখা করলেন গান্ধীজী। একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এই চুক্তিরই নাম গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

এই চুক্তিতে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো, পুলিশী অত্যাচারের তদন্ত করা হবে। অহিংস আন্দোলনে ধৃত রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে এবং বিদেশী পন্যের দোকানের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করতে দেয়া হবে। গান্ধীজী তাঁর পক্ষ থেকে সরকারকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আসন্ন গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধি দল পাঠাবার জন্য করাচী কংগ্রেসকে অনুরোধ করবেন। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবেন।

দেশের ব্যবসায়ী মহলও শান্তি চাইছিল। তারা দেখল, দেশে আন্দোলন বা সংগ্রাম চললে তাদের ব্যবসায়ে লোকসান হবে। দেশের স্বাধীনতার চেয়ে লাভটাই তাদের কাছে বড় কথা। তাই অনেকে বলতে লাগল, গান্ধী-আরউইন চুক্তির পিছনে ব্যবসায়ী মহলেরও হাত আছে। তাঁরা দিল্লীতে গান্ধীজীকে চারদিক থেকে ঘিরে ছিলেন।

চুক্তিতে সই করবার আগে খসড়াটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে পাঠিয়ে দিলেন গান্ধীজী। জওহরলাল নেহেরু তখন সভাপতি। তিনি কোন বাধা দিলেন না। চুক্তিটি কমিটির সভায় অনুমোদন লাভ করল। জওহরলাল স্বীকার করলেন, এই চুক্তির সব শর্ত আমি

মানি না। তবু নেতার একজন অনুগত সৈনিক হিসাবে আমাকে তা মানতেই হবে।

করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশন বসবে মার্চ মাসে। চুক্তির সমর্থকরা জনমত সংগঠনের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। যেমন করে হোক এ চুক্তি বেশীর ভাগ সদস্যকে দিয়ে অনুমোদিত করাতেই হবে।

অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও মুক্তি পেলেন ৮ই মার্চ তারিখে। মুক্তি পেয়েই বোম্বাই চলে গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। দীর্ঘ আলোচনার সময় স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন সুভাষচন্দ্র, যতক্ষণ আপনি আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে চলবেন আপনাকেও আমরা সমর্থন করে যাব। কিন্তু আমাদের এই দাবী থেকে আপনি একটু দূরে সরে গেলেই আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের উচিত বলে মনে করব।

বোম্বাই থেকে ট্রেনে করে একসঙ্গে করাচী গেলেন সুভাষচন্দ্র। প্রতিটি স্টেশনে গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল সংবর্ধনা পেলেন গান্ধীজী। এর দ্বারা বোঝা গেল গান্ধী-আরউইন চুক্তি মেনে নিয়েছে দেশের জনগণ। কিন্তু দিল্লী পৌঁছতেই একটা খবর শুনে মর্মাহত হলেন সুভাষচন্দ্র।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার যে রায় বেরিয়েছে তাতে নাকি সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর দুজন সহকর্মীর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। সারা দেশে নেমে এল বিষাদের ছায়া। সবাই বলাবলি করতে লাগল, গান্ধীজী এ বিষয়ে বড়লাট লর্ড আরউইনকে জোর করে ধরলেই তিনি ফাঁসি বন্ধ করে দেবেন।

গান্ধীজী লর্ড আরউইনের সঙ্গে দেখা করতেই আরউইন বললেন, সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য আমি ফাঁসি স্থগিত রাখছি, ইতিমধ্যে আমি বিবেচনা করে দেখছি।

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন বসতে মাত্র আর দশ দিন বাকী। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ একদিন ফাঁসি হয়ে গেল ভগৎ সিং ও

তাঁর সহকর্মীদের। তাঁদের মৃতদেহগুলি পর্যন্ত ফেরৎ দিল না সরকার।

বাংলাদেশেও তখন চলছে সরিষাবাড়ি বোমা ষড়যন্ত্র মামলা ও ডালহৌসি স্কোয়ার ষড়যন্ত্র মামলার বিচার। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে বিপ্লবীদের পক্ষে ওকালতি করছিলেন জাতীয়তাবাদী এ্যাডভোকেট হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

ভগৎ সিংএর ফাঁসির খবর শুনে ক্ষেপে উঠল বাংলা ও পাঞ্জাবের যুবকরা। তারা ক্ষুব্ধ হলো গান্ধীজীর প্রতি। তাদের দৃঢ় ধারণা, গান্ধীজী যদি বড়লাটকে চাপ দিয়ে বলতেন, এই ফাঁসির হুকুম রদ না করলে আগের চুক্তি তিনি মানবেন না তাহলে বড়লাট নিশ্চয়ই তা মানতেন, ভগবৎ সিংএর জীবন রক্ষা হত।

সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতা হতে করাচীর পথে। পথেই ফাঁসির খবর শুনে মর্মাহত হলেন। করাচীতে নেমে দেখলেন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বহু যুবক। শোকের প্রতীক হিসাবে কালো ফুল আর কালো মালা নিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হলো সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে। কিন্তু মহা ভাবনায় পড়লেন নেতারা। অনেকে ভাবলেন, একেবারে ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে যাবে হয়ত কংগ্রেস। একে সুভাষচন্দ্রের অনুগামী বামপন্থী দল গান্ধী-আরউইন চুক্তি মানেন না ; তার উপর ভগৎ সিংএর হত্যার ব্যাপারে গান্ধীজীর ঔদাসীন্য। সরকারও এই ভাঙ্গনের আশাতেই ভগৎ সিংএর ফাঁসির উপর জোর দিয়েছিল। সরকার আশা করেছিল, এ ব্যাপারে দলের ভাঙ্গন ধরবেই এবং একবার ভাঙ্গন ধরলে শক্তিহীন হয়ে পড়বে দল। নষ্ট হবে দলের মর্যাদা।

কিন্তু তা হতে দিলেন না সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সামনে একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন, কংগ্রেসের বামপন্থী দল গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদন করেন না, কিন্তু দেশের বর্তমান

পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা সভার মধ্যে কোন অনৈক্য সৃষ্টি হতে দেবেন না।

সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতিতে চুক্তির সমর্থক দক্ষিণপন্থীরা খুব খুশি হয়।

এদিকে সভাপতির ভাষণে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বললেন ঃ দেশের কৃষিকার্যের অভাব অভিযোগগুলির কথা তুলে ধরলেন। কিন্তু স্বাধীনতা সম্বন্ধে লাহোরের প্রস্তাবের উপর কোন কথা বললেন না। অনেকে বলতে লাগল, প্যাটেল গান্ধীজীর গোঁড়া সমর্থক ; তাই তিনি এমন একটি কথাও বলতে চান না যাতে গান্ধীজী ক্ষুণ্ণ হন।

তবে একটি প্রস্তাবে লাহোর চক্রান্ত মামলার আসামী বিপ্লবী ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করা হলো। কিন্তু সেই সঙ্গে হিংসাত্মক সব কার্যকলাপের নিন্দা করা হয়। ১৯২৪ সালে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলনেও বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার মৃত্যুতেও ঠিক এই ধরনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। করাচী কংগ্রেসে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থন, গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের নির্দেশ দান এবং ভারতীয় জনগণের মৌলিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি।

কংগ্রেসের এই সব প্রস্তাবে যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সন্তুষ্ট হতে পারল না। তারা কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালেই নিখিল ভারত নওজোয়ান সভার একটি অধিবেশন বসাল করাচীতে। তাতে সভাপতিত্ব করলেন সুভাষচন্দ্র। পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের যুবকরা জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র বললেন, দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য দল না

গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যুব কংগ্রেস। এই চুক্তির ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেন সুভাষচন্দ্র। তিনি বলেন, চুক্তিতে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রধান কথা স্বরাজের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি ভারতীয় জনগণ মনোনীত করবে না, করবে বৃটিশ সরকার। সুতরাং তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। ভারতবাসীরা চায় শুধু স্বাধীনতা, কিন্তু চুক্তিতে বৃটিশ যে সব রক্ষাকবচ চেয়েছে তা ভারতে স্বাধীনতা লাভের পরিপন্থী। তাছাড়া চুক্তিতে শুধু অহিংস আন্দোলনকারীদেরই মুক্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্যও যাঁরা গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হয়েছেন তাঁদেরও মুক্তি দিতে হবে। শুধু বাংলা দেশেই আটক আছে এই ধরনের এক হাজার রাজবন্দী।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের এই সমালোচনাগুলি যুবকংগ্রেস অনুমোদন করে এবং চুক্তিকে নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস নেতাদের কাছে প্রশ্ন করলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজ ত দূরের কথা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই বা কবে দেবে সে সম্বন্ধে কোন আশ্বাস আজও পর্যন্ত দিল না বৃটিশ সরকার। তা যদি না দেয় তাহলে আইন অমান্য আন্দোলন কেন বন্ধ হবে বলতে পারেন ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না কোন নেতা।

মার্চ মাসের প্রথম দিকেই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু দীর্ঘ রোগভোগের পর মারা গেলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর পণ্ডিত মতিলাল গান্ধীজীর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়লেও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বিভিন্ন সময়ে গান্ধীজীর ভুল ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতেন। অন্ধভাবে গান্ধীজীর সব নির্দেশ তিনি মেনে

নিতেন না। তাই পণ্ডিত মতিলালের ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি অপূরণীয় ক্ষতি।

এদিকে একের পর এক ভুল করে যাচ্ছিলেন গান্ধীজী। দিল্লী চুক্তিতে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য আর চাপ দিলেন না তিনি। অথচ চাপ দিলেই সরকার সে তদন্তের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত। তা না করে বড়লাটের এক ব্যক্তিগত আবেদনেই সে তদন্তের দাবী ত্যাগ করলেন গান্ধীজী।

রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারেও ভুল করেছিলেন গান্ধীজী। তিনি শুধু অহিংস সত্যাগ্রহী বন্দীদেরই মুক্তি চেয়েছিলেন। বিপ্লবী রাজবন্দীদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি। একমাত্র বাংলা দেশেই এক হাজার বিপ্লবী রাজবন্দী ছিলেন। বহু ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও প্রতিনিধিও জেলে আটক ছিলেন। গান্ধীজীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেন তাঁরা সবাই।

ভারতের বিপ্লবীরা একটি পত্রে বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন, গান্ধীজীর সঙ্গে সরকার পক্ষের চুক্তি হলে তা তাঁরা মানবেন না। সরকার যদি ভারতের সমস্যার সমাধান করতে চান তাহলে বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাদাভাবে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

বাংলার গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মাধ্যমে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আলোচনা করতেও রাজী হলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা বললেন, আলোচনার সময় কোন পুলিশ থাকবে না। এ কথায় গভর্ণর পিছিয়ে যেতে আলোচনা আর হলো না।

এই সব ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও কংগ্রেস সংগঠনের উপর দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল গান্ধীজীর প্রভাব। ২রা এপ্রিল তারিখে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি গান্ধীজীকে লণ্ডনে আসন্ন গোল টেবিল বৈঠকে একমাত্র প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করলেন।

কিন্তু গান্ধীজী হঠাৎ দুটি বিবৃতি দান করে নতুন সমস্যার সৃষ্টি

করলেন। তিনি বললেন, তাঁর গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান নির্ভর করছে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের উপর। তিনি আরও বললেন, মুসলমানরা যদি নতুন শাসনতন্ত্রে যুক্তভাবে প্রতিনিধিত্ব ও পৃথক নির্বাচনের দাবী জানায় তাহলে সে দাবী তিনি মেনে নেবেন।

গোল টেবিল বৈঠকে যাবার আগে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতারা একদিন গান্ধীজীর সঙ্গে দিল্লীতে মিলিত হন। সুভাষচন্দ্র তখন দিল্লীতে ছিলেন। আলোচনার পর সেইদিন সন্ধ্যার সময় তিনি দেখা করতে গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে।

গান্ধীজী বললেন, পৃথক নির্বাচনের দাবীতে তোমার আপত্তি আছে?

সুভাষচন্দ্র বললেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যারা জাতীয়তাবাদী তাদের সঙ্গে মীমাংসার জন্যই কংগ্রেসের চেষ্টা করা উচিত। জাতীয়তা-বিরোধী হিন্দু বা মুসলমানরা কি চায় বা না চায় তা নিয়ে মাথা ঘামানো কংগ্রেসের উচিত নয়। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি জাতীয়তাবাদীদের মূল নীতিবিরোধী। এইরূপ নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তিতে স্বরাজ গ্রহণ করাও উচিত নয়।

কিছুক্ষণ পর কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান দেখা করতে এলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। তাঁরাও সেই কথাই বললেন। তাঁরা বললেন, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমগ্র দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর। এই দাবী মেনে নিলে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তা বিরোধী মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধিতা করব।

অবশেষে গান্ধীজী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, তিনি সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমানদের দাবীগুলি মেনে নিতে পারেন না।

১৮ই এপ্রিল বড়লাট লর্ড আরউইনের কার্যকাল শেষ হলো। আরউইন সত্যি সত্যিই ভারতের জন্য ভাল কিছু করতে চেয়েছিলেন। লর্ড রিপনের পর এত ভাল বড়লাট ভারত আর পায়নি।

তিনি রক্ষণশীল দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য হলেও ভারতের প্রতি শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না তাঁর।

কিন্তু পরবর্তী বড়লাট লর্ড উইলিংডন ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। যেমন কড়া তেমনি হৃদয়হীন। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ও ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি উৎসাহ পেল। সরকারী অফিসাররা আরও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করল।

মে জুন দুটো মাস কেটে গেল। বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ পাওয়া গেল, সরকার গান্ধী-আরউইন চুক্তি ত মানছেই না, উল্টো তা লঙ্ঘন করছে। গান্ধীজী নিজে সিমলায় গিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হাতে এ বিষয়ে একটি অভিযোগপত্র দিলেন।

ইংলণ্ডের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর মত একজন নরমপন্থী নেতাকেই চাইছিলেন। এজন্য বড়লাটকে তাঁরা চাপ দিলেন, গান্ধীজী যাতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে দাও। আগষ্ট মাসে বড়লাটের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো গান্ধীজীর। গান্ধীজীর অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা হবে বলে কথা দিলেন উইলিংডন।

সুভাষচন্দ্র জানতেন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে কোন ফল হবে না। বৈঠকে যে একশো সাত জন বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করেন তাঁরা অল্প বিস্তর সবাই প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং একা তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না গান্ধীজী।

তবু তিনি যাবেন এবং তাঁকে বিব্রত করে লাভ নেই। তাই আর কিছুই বললেন না সুভাষচন্দ্র। লণ্ডন যাবার জন্য ট্রেনে করে বোম্বাই রওনা হলেন গান্ধীজী।

॥ বার ॥

কোমরে এক টুকরো কাপড়, গায়ে একটা চাদর আর পায়ে চটি পরে ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফরাসী দেশের মার্সাই বন্দরে নামলেন গান্ধীজী। পরের দিন পৌঁছলেন লণ্ডনে। ১২ই সেপ্টেম্বর হতে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত একটানা তাঁকে থাকতে হবে সেখানে।

একজন বৃটিশ সাংবাদিক গান্ধীজীকে তাঁর পোষাক সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমি যদি এখানে ইংরাজ নাগরিকরূপে এখানে থেকে কাজ করতে আসতাম তাহলে আমি এদেশের প্রথামত চলতাম। সেই রকম পোষাক পরে আসতাম। কিন্তু আমি এসেছি এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আমার এই কটিবন্ধ পোষাকই ভারতবাসীর পোষাক।

গোল টেবিল বৈঠক উপলক্ষে মোট বারো বার বক্তৃতা দিতে হয় তাঁকে। পূর্ণ অধিবেশনে দুবার, ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটিতে আটবার ও সংখ্যালঘু কমিটিতে দুবার।

গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে গান্ধী যা চাইলেন তা অতি সামান্য। এমন কি লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রস্তাবটির কথাও তুলে ধরলেন না। তিনি এক বক্তৃতায় বললেন, এমন একদিন ছিল যখন আমি নিজেকে বৃটিশের প্রজা বলে গর্ববোধ করতাম। এখন প্রজা বলা ছেড়ে দিয়েছি ; এখন আমায় প্রজা না বলে বিদ্রোহী বলাই ভাল।

কিন্তু পরক্ষণেই বললেন, কিন্তু এখন আমি যা চাইতে এসেছি তা হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে নয়, কমনওয়েলথের ভিতরে থেকে নাগরিকত্ব।

তবে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে যে কিছু হবে না তা দিনকয়েকের মধ্যেই বুঝতে পারলেন গান্ধীজী। প্রতিনিধিদের তালিকা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, যাঁদের আশা উচিত ছিল অর্থাৎ যাঁরা ভারতবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধি তাঁরা আসেননি। যাঁরা এসেছেন তাঁরা জাতির প্রতিনিধি নন, সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি। এর মধ্যে পঁয়ষট্টি জন ছিলেন বৃটিশ ভারতের এবং বাইশ জন ছিলেন দেশীয় রাজ্যের এবং বৃটিশের তিনটি প্রধান দল হতে কুড়ি জন। সংখ্যালঘু কমিটিতে জাতীয়তাবিরোধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী; জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন মাত্র একজন।

মাঝে মাঝে বেশ শক্ত হয়ে উঠতে পারতেন গান্ধীজী। একটা উদ্ধত আপোষহীন শক্তি অনমনীয় দৃঢ়তায় মাথা তুলে উঠত তাঁর মধ্যে। কিন্তু সে দৃঢ়তা স্থায়ী হত না বেশীক্ষণ। কোন এক রহস্যময় দুর্বলতায় পরক্ষণেই গলে যেতেন যেন তিনি।

১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র এই মর্মে এক প্রস্তাব এনেছিলেন যে কংগ্রেসের পাল্টা সরকার গঠন করে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

প্রায় তিন বছর সেই পুরনো কথাটা গোল টেবিল বৈঠকের এক বক্তৃতায় তুললেন গান্ধীজী। তিনি বললেন, আজকের সরকার আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে আমরা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাবে এক পাল্টা সরকার গঠন করেছি। এ অভিযোগ আজ আমি স্বীকার করে নিতে চাই। যদিও আমরা কোন পাল্টা সরকার গঠন করিনি, আমাদের আশা আছে যে কোন না কোনদিন আমরা বর্তমান সরকারকে উৎখাত করবই এবং যথাসময়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে সরকারের ভারও গ্রহণ করব।

আর একটি বক্তৃতায় দৃঢ়তার সঙ্গে গান্ধীজী বললেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলাম আর এই ব্যর্থতার কারণ রয়েছে

প্রতিনিধিদের তালিকা তৈরির মধ্যে। এদিকে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে সংখ্যালঘু কমিটির বৈঠকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি মিলে সরকারের সহযোগিতায় মনগড়া এক চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তিতে শাসনতন্ত্রে সবচেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়ার কথা ছিল। শিখেরা এ চুক্তিতে যোগ দেয়নি। তপশীল সম্প্রদায়ের পক্ষে ছিলেন মনোনীত সদস্য ডক্টর আম্বেদকর। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের আইন সভাগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষিত আসন। তাঁর সে দাবী তখন মেনে নিতে পারেননি গান্ধীজী।

তিনি বললেন, হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে কোন সমাধানই কংগ্রেস মেনে নেবে। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ বা পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা মেনে নিতে পারবে না আমাদের দল।

সৈন্যবাহিনী ও বৈদেশিক ব্যাপারে কংগ্রেসের মনোভাব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন গান্ধীজী। বিদেশী শাসনের উত্তরাধিকারীরূপে ভারতকে যদি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয় তাহলে সৈন্যবাহিনী ভারতীয় বা বৃটিশ যাই হোক না কেন আমাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসা উচিত।

তিনি আরও বললেন, যদি বৃটিশ জাতি মনে করেন এর জন্য আমাদের একশো বছর সময় লাগবে, তাহলে এই একশো বছরই কংগ্রেস কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং দরকার হলে বা ঈশ্বর চাইলে গুলিবর্ষণেরও সম্মুখীন হবে।

এস, এস, রাজপুতানা জাহাজে করে লণ্ডন যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের কাছে তিনি আশা পোষণ করেছিলেন বৈঠক সম্বন্ধে। কিন্তু বৈঠক যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল ততই হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। তিনি বললেন, কংগ্রেস শুধু বৃটিশ ভারত নয়, সমগ্র ভারতের শতকরা পঁচাশি ভাগ অধিবাসীর প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু সে প্রতিনিধিত্ব আপনারা স্বীকার করেন না।

তিনি আরও বললেন, আমি কেন্দ্রের সেই দায়িত্ব চাই যা আমাকে সৈন্যবাহিনী ও অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার দেবে।

বৃটিশদের বাণিজ্যিক রক্ষাকবচগুলির বিরোধিতা করে তিনি বলেন, বর্তমানে ও গুলির উপর আইনসম্মত উপায় ছাড়া হস্তক্ষেপ করা হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের জাতীয় সরকারের পক্ষে গরীবদের অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ভারতবাসীর স্বার্থে ধনীদের বঞ্চিত করার প্রয়োজন হতে পারে।

কিন্তু কোন আশাই পূর্ণ হলো না গান্ধীজীর। তাঁর কোন কথাই কেউ শুনল না। বৈঠক শেষে সরকারী নীতি ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যে বিবৃতি দিলেন তাতে কিছুই পাওয়া গেল না।

অবশেষে হতাশ হয়ে সাংবাদিকদের কাছে লণ্ডন ত্যাগ করার আগে বললেন, কিন্তু এই মুহূর্তে সারা দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা সম্ভব নয়। তবে বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে যে সব জরুরী আইন চালু আছে তার বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে।

কিন্তু তার আগে বৃটিশ জাতির কাছে যে সকরুণ মিনতি জানিয়েছিলেন তা ভারতবাসী ও কংগ্রেস দলের পক্ষে সত্যিই অসম্মানজনক ও বেদনাদায়ক। তিনি বলেছিলেন, আমি এখানে যতদিন প্রয়োজন থাকব কারণ আমি এখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করতে চাই না।

তারপর আরও বলেছিলেন, দোহাই আপনাদের বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ এই ক্ষীণ মানুষটিকে একবার সুযোগ দিন। যে প্রতিষ্ঠানের সে প্রতিনিধিত্ব করে তাকে দাঁড়াবার একটু ঠাঁই দিন।

একটি সংগ্রামশীল প্রগতিবাদী জাতির প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজীর কণ্ঠস্বর আরও দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। বৈঠকে শেষ পর্যন্ত না থেকে বেরিয়ে এসে ইউরোপে ভারতের দাবী সম্বন্ধে জনমত

সৃষ্টি করতে পারতেন। লণ্ডনে থাকাকালে অবসর সময়ে তিনি ইংলণ্ডের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তিনি তাঁর অহিংসা মন্ত্রের প্রচার করে বেড়াতেন। ফলে একজন রাজনীতিবিদের চেয়ে বিশ্বপ্রেম ও অহিংসা মন্ত্রের প্রচারক হিসাবেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল বেশী।

সুভাষচন্দ্রের মতে এটা ছিল বৈঠকে গান্ধীজীর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

ফিরবার পথে প্যারিস ও জেনেভা হয়ে সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী লেখক ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরম বন্ধু রোমা রোলাঁর সঙ্গে দিনকতক কাটান। পরে ইটালি গিয়ে মুসোলিনীর সঙ্গেও দেখা করেন।

যাবার সময়কার মত ফিরবার সময়েও জাহাজে সামান্য ডেকযাত্রী-রূপে এলেন গান্ধীজী। বোম্বাইয়ে নামলেন ২৮শে ডিসেম্বর। বোম্বাই কংগ্রেস কমিটি এক বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করল তাঁর জন্য। দেখে মনে হতে লাগল গোল টেবিল বৈঠক সব দিক দিয়ে সফল হয়েছে যেন গান্ধীজীর যোগদান।

সুভাষচন্দ্র বুঝে উঠতে পারলেন না কংগ্রেস প্রচারের মাধ্যমে কেন দেশজোড়া এই ভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। তিনি বুঝতে পারলেন না, বৈঠকের এই শোচনীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও কেন হতাশ হয়নি কংগ্রেস। কেবলমাত্র ডক্টর আম্বেদকর ও তাঁর কিছু লোকজন আর স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। কিন্তু তা কোন রেখাপাত করতে পারেনি কারো মনে।

পরদিনই কার্যনির্বাহক সমিতির এক বৈঠক বসল। সমিতি এই বৈঠকে যোগদানের জন্য সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্তপ্রদেশে জরুরী আইন বলবৎ ও ব্যাপক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করবার জন্য গান্ধীজীকে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার ক্ষমতা দিল।

৩১শে ডিসেম্বর বড়লাট তাঁর জবাবে জানালেন, ও সব নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনার জন্য আমি প্রস্তুত নই।

॥ তের ॥

গত বছরের শেষের দিক থেকেই মেঘ জমতে শুরু করেছিল। নতুন বছর পড়তে না পড়তেই সেই মেঘ হয়ে উঠল আরও ঘন আরও কালো। দিকে দিকে প্রকট হয়ে উঠল আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ। দিল্লী চুক্তির ব্যর্থতার কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে দিকে দিকে।

গান্ধীজী যখন লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনা করছিলেন, তখনই চরমে ওঠে তাঁর দিল্লী চুক্তির ব্যর্থতা। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্তপ্রদেশে জরুরী আইনের মাধ্যমে পুলিশী অত্যাচারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও বেড়ে যায়। চুক্তি অনুসারে পুলিশী অত্যাচারের তদন্ত না হওয়ায় জনগণ বাধ্য হয়ে প্রতিশোধমূলক সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

গত বছরে কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে করাচীর যুব কংগ্রেস ও কলকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দিল্লী চুক্তির নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। বাংলা দেশের বিপ্লবী রাজবন্দীদের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তাঁরাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

১৯৩০ সালের এপ্রিলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকেই সরকারী দমননীতি ভয়ানক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামে যে জরুরী আইন বলবৎ করা হলো সামরিক আইনের চেয়েও তা কঠোর। যখন তখন যেখানে সেখানে কারফিউ জারি করা হতে লাগল। জনগণকে সব সময় পরিচয়পত্র কাছে রাখতে হত। যুবকদের সাইকেলে চাপা নিষিদ্ধ করা হলো। সন্দেহভাজন লোকদের বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হলো। যে সব গাঁয়ে বিপ্লবীরা আনাগোণা করতেন সেখানে পাইকারী হারে জরিমানা ধার্য করা

হলো। মাঝে মাঝে এক একটি গাঁয়ের মধ্য দিয়ে সৈন্যবাহিনী মার্চ করে যেত এবং তাদের অভ্যর্থনা করতে গ্রামবাসীদের বাধ্য করা হত।

পরে মেদিনীপুর ও ঢাকা জেলাতেও এই ধরণের আইন জারি করা হলো। অকারণে বহু যুবককে ধরা হলো। জেলের মধ্যে রাজবন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হতে লাগল। আগে এই ধরণের অত্যাচারের কোন তদন্ত না হওয়ায় পুলিশ ও সরকারী অফিসারদের দুঃসাহস বেড়ে গেল।

এই সব অত্যাচার অবিচারের জন্যই ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রধান মিস্টার লোম্যান গুরুতরভাবে আহত হন। এই বছরের শেষের দিকে কলকাতায় জেল বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেল সিম্পসনকে তাঁর অফিসে হত্যা করা হয়।

মেদিনীপুর জেলায় করবন্ধ আন্দোলনের সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডি যে অত্যাচার করেন তার জন্য ১৯৩১ সালে পেডি ও তাঁর দুজন উত্তরাধিকারীকে পর পর হত্যা করা হয়। মেদিনীপুর জেলার জনগণের উপর যে অত্যাচার চলছিল তার জন্য কলকাতার জনসাধারণ একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটি সরকারের কাছে সব কিছু জানিয়ে রিপোর্ট দেয়। কিন্তু সরকার কোন প্রতিকার না করায় উৎপীড়িত জনগণ প্রতিশোধের ও প্রতিহিংসার পথ গ্রহণ করে।

চট্টগ্রামে খুব বাড়াবাড়ি করায় একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে শহরে সরকারের পক্ষ থেকে বহু গুণ্ডা ছেড়ে দেয়া হয়। তারা ইচ্ছামত প্রকাশ্যে দিনের বেলায় লুটপাট করে। পুলিশ কিছুই করে না। বিপ্লবীদের যাতে শহরের জনসাধারণ সাহায্য না করে তার জন্য শহরবাসীদের ভয় দেখানোই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য।

এর কিছুদিন পর ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটকেও হত্যার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। সেইদিন রাত্রিবেলায় পুলিশের চারটি বড় দল শহরবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। ঘর তল্লাসী করতে গিয়ে অনেক ধনী লোকের বাড়ি থেকে দামী জিনিসপত্র নিয়ে আসে থানায়।

হিজলি জেলের মধ্যে রাজবন্দীদের উপর সশস্ত্র প্রহরীরা নির্মমভাবে আক্রমণ চালায়। প্রহরীদের একটা সামান্য কথা কাটাকাটি নিয়ে এই ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। পরে নির্বিচারে গুলি চালানো হয় এবং রাইফেলের বেয়োনেট দিয়ে বন্দীদের খুঁচিয়ে মারা হয়। গুলি চালনার ফলে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নামে দুজন রাজবন্দী মারা যান এবং কুড়ি জন আহত হন। সরকারী তদন্ত কমিটিও রায় দেয়, গুলিচালনা সংগত হয়নি।

ঢাকার পুলিশী অত্যাচারের ব্যাপারে তদন্তের জন্য কলকাতা হতে যে বেসরকারী তদন্ত কমিটি যায়, সুভাষচন্দ্র ছিলেন তার একজন সদস্য। তাঁরা পৌঁছানোর আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে ছেড়ে দিলে তদন্ত কার্য চলে।

১৯৩১ সালের মার্চ মাসে দিল্লী চুক্তি সম্পাদিত হলেও সরকারী অত্যাচার কমার পরিবর্তে ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। একের পর এক করে বিপ্লবীদের ফাঁসি দিয়ে যেতে লাগল সরকার। তার প্রতিশোধে পদস্থ রাজকর্মচারিদের হত্যা করা হতে লাগল। এই বছরের ডিসেম্বরে কুমিল্লায় শান্তি ও সুনীতি নামে দুটি স্কুলের ছাত্রী কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রিভলবার দিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

এই সময় কলকাতায় বিপ্লবী বন্দী দীনেশ গুপ্তের বিচারে ফাঁসি হয়। এই ফাঁসিতে দুঃখ প্রকাশ করে কলকাতা পৌরসভা এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে সরকার ও পৌরসভার ইংরেজ কর্মচারিরা রেগে যায়।

বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও সরকারের উপরে মোটেই সন্তুষ্ট

ছিল না। ডিসেম্বর মাসে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের এক অধিবেশন বসল। তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, সরকার দিল্লী চুক্তি কার্যতঃ লঙ্ঘন করেছে। এখন কংগ্রেসের উচিত সরকারকে যথাবিধি নোটিশ দিয়ে আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা। তখন বাংলা কংগ্রেস কমিটিতে সুভাষচন্দ্র ও অনুগামীদের প্রাধান্য ছিল।

গান্ধীজী যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশেও দারুণ অশান্তি দেখা দেয়। সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফফর খানের অহিংস লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকদের সৈন্য পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় ও সংগঠনকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হয়।

যুক্তপ্রদেশে বহুদিন হতেই খাজনা বন্ধ আন্দোলন চলছিল। সেখানে চাষের কোন উন্নতি না হওয়ায় চাষীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই আন্দোলনে। এর আগে গান্ধীজী শতকরা পঞ্চাশ ভাগ খাজনা দেবার অনুরোধ করেন। কিন্তু চাষীরা তাও দিতে না পারায় আন্দোলন চলতে থাকে। সরকার তখন এই আন্দোলন জোর করে বন্ধ করবার জন্য দমননীতি চালাতে থাকে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এলাহাবাদ হতে গান্ধীজীর সম্বর্ধনার জন্য বোম্বাই যাবার সময় গ্রেপ্তার হন। আরও বহু কর্মী ও নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে ইউরোপ থেকে দেশে ফিরেই এই সব দেখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গান্ধীজী। মর্মে মর্মে অনুভব করলেন তাঁর দিল্লী চুক্তির ব্যর্থতা। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলেন, কংগ্রেস কমিটির অনুরোধে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে পত্র দিলেন। কিন্তু বড়লাট তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই প্রস্তাবে সরকার কিছু না

করায় জাতিকে আইন অমান্য শুরু করার জন্য আহ্বান জানানো হলো।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কুমারী বীণা দাস নামে এক স্নাতকোত্তর ছাত্রী গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে ধরা পড়েন। গভর্ণর বেঁচে যান। বিচারে বীণা দাসের নয় বছর জেল হয়।

তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখলেন গান্ধীজী। বড়লাট যাতে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে দেখেন তার জন্য একখানি চিঠি পাঠালেন। তার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রস্তাবটিও পাঠিয়ে দিলেন।

বড়লাট তার পরের দিনই জবাব দিলেন, আইন অমান্যের ভয় দেখানোর মধ্যে সাক্ষাৎকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

গান্ধীজী উত্তরে জানালেন, অকপট এই মতপ্রকাশকে ভয় দেখানো বলে বর্ণনা করা নিশ্চয়ই ভুল।

তিনি আরও জানালেন, আইন অমান্য চলাকালেই চুক্তি হয়েছিল। সেজন্য আইন অমান্য বন্ধ রাখা হয়েছিল, পরিত্যাগ করা হয়নি।

কিন্তু সরকার সে চুক্তি না মানায় তাঁরা আবার শুরু করতে চান আইন অমান্য আন্দোলন। তবে একটা আশ্বাস সরকারকে দিতে পারেন। তিনি বললেন, আমি সরকারকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, বিদ্বেষপরায়ণ না হয়ে পুরোপুরি অহিংসভাবে ঐ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেস সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে।

গান্ধীজীর একথায় কোন কান দিলেন না বড়লাট। উল্টো আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার আগেই বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন। তিরিশ হাজারেরও বেশী কংগ্রেস কর্মী ও নেতা গ্রেপ্তার হলেন।

তখন আর গ্রেপ্তার না করে অন্যান্য দমনমূলক নীতি গ্রহণ করলেন। প্রথমে কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা

হলো। সভা, শোভাযাত্রা, জাতীয়তাবাদী পত্র পত্রিকা ও সাহিত্য - নিষিদ্ধ করা হলো। জমির খাজনা না দিলে জমি ক্রোক করা হতে লাগল।

অন্যদিকে কংগ্রেসকর্মীগণও এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এই সব নিষিদ্ধ কাজগুলি একের পর এক করে যেতে লাগল। সরকারী বাড়িগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, লবণ উৎপাদন ও করবন্ধ ছাড়াও সভা সমিতি করতে লাগল।

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মরণে ৬ই এপ্রিল হতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় সভা ও শোভাযাত্রা হয়। ৮ই এপ্রিল তারিখে এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বিধবা স্ত্রী একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। হঠাৎ পুলিশ এসে শোভাযাত্রাটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শ্রীমতী নেহেরু সমেত কয়েকজন আহত হন। ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা যায় তাঁর গায়ে ছয় জায়গায় ক্ষত চিহ্ন ছিল; লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে ভীষণ রক্ত পড়ে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে পথে গ্রেপ্তার করা হলেও যথাসময়ে সভা শুরু হয়। সভার প্রস্তাবগুলি আগেই ছাপা ছিল। তাড়াতাড়ি সভার কাজ সেরে সেই ছাপা প্রস্তাবগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়।

দিল্লী কংগ্রেসের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদেশ, জেলা ও মহকুমা সম্মেলনগুলিও অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সংগঠন অবৈধ ঘোষণা করলে আইন বাঁচিয়ে ভারতীয় জিনিস কিনুন নামে বহু সংঘ গড়ে তোলা হয়। ১৫ই মে তারিখে ওয়াদালায় লবণ ডিপো অভিযান করা হয়। ২৯শে মে স্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার জন্য স্বদেশী দিবস পালন করা হয়। ৪ঠা জুলাই সারা ভারত কর্মী দিবস পালন করা হয়।

প্রায় আশী হাজারেরও বেশী লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তার মধ্যে অনেক নারী ও শিশু ছিল। তারপর রাজবন্দীদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হয়। করাচী ও সীমান্ত প্রদেশের হরিপুর জেলে রাজবন্দীদের বেত মারা হয়। বাংলা দেশের সিউড়ী জেলে নারী বন্দীরা অনশন করেন এই সব অত্যাচারের প্রতিবাদে। রাজশাহী জেলার রাজবন্দীদের পায়ে বেড়ী ও হাতে হাতকড়া পড়ানো হয়। মধ্যপ্রদেশ ও আজমীরের জেলেও প্রহরীরা লাঠি মারে বন্দীদের মাথায়।

আন্দোলনের প্রথম দিকে বাংলা দেশে অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের দিনকতক আগে বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে একখানি চিঠিতে লেখেন, মুক্তির আনন্দ আর স্বাধীনতার আস্বাদ চাও? তবে তার মূল্য দাও। এবং এই মুক্তির মূল্য হলো দুঃখভোগ আর আত্মত্যাগ।

এই সময় কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা এ্যাডভোকেট পৌরসভার অল্ডারম্যান ও কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ইনি আন্দোলনে অর্থ সাহায্যও করলেন।

১৯২১, ১৯২২ ও ১৯৩০ সালের আন্দোলনগুলির সঙ্গে ১৯৩২ সালের আন্দোলনের একটা পার্থক্য ছিল, এর আগের আন্দোলনগুলি ছিল মোটের উপর আক্রমণাত্মক এবং তখন সরকারের ভূমিকা ছিল আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু এবার সরকারই প্রথম আক্রমণ করেন এবং কংগ্রেস আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করে। আগের আন্দোলনগুলিতে বোম্বাই ও গুজরাট অনেক কাজ করেছিল। যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জনগণ। এবার মে মাসে হঠাৎ বোম্বাইএ হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা লাগায় গুজরাট ও বোম্বাইএর জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারল না।

১৭ই আগষ্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করলেন এই বাঁটোয়ারা অনুযায়ী ঠিক হয় প্রাদেশিক আইন

সভাগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা থাকবে এবং এই আসনগুলি পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্ণ করা হবে। এছাড়া সাধারণভাবে হিন্দুদের সঙ্গে নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকারও অনুন্নত শ্রেণীদের দেয়া হয়।

গান্ধীজী এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করে বললেন, এ কখনই হতে পারে না। এর দ্বারা হিন্দুদের প্রধান শাখা হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হচ্ছে অনুন্নত শ্রেণীদের। এতে আমি বাধা দেব এবং আমরণ অনশন করব।

অনশনের দিনও ঠিক করে ফেললেন। ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা। দিন ক্ষণ ঠিক করে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন গান্ধীজী। আরও জানালেন, তাঁদের এই সব চিঠিপত্রগুলি যেন প্রকাশ করা হয়।

৮ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী দুঃখের সঙ্গে জানালেন বাঁটোয়ারার শর্তগুলি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

গান্ধীজীও জানিয়ে দিলেন, তিনি তাঁর সংকল্প অনুসারে ঐ তারিখ হতে আমরণ অনশন শুরু করবেন।

গান্ধীজী তখনও পুণার জেলে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন মাদ্রাজের জেলে। সারা দেশের নেতারা জীবন রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁকে বিরত করার জন্য সকলে আবেদন জানালেন। সকলেই ভাবলেন অসুস্থ অবস্থায় গান্ধীজী যদি অনশন শুরু করেন এবং রক্ষণশীল বৃটিশ সরকার যদি তাঁর দাবী মেনে না নেয় তাহলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য।

সরকার কয়েকটি শর্তে মুক্তি দিতে চাইলেন গান্ধীজীকে। কিন্তু কোন শর্তে মুক্তি নিতে চাইলেন না তিনি।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আহ্বানে ১৯শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইএ হিন্দু নেতাদের এক সম্মেলন বসল। বহু আলোচনার পর সবাই একমত হয়ে গান্ধীজীর জীবন রক্ষার জন্য অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য

পৃথক নির্বাচন রদ করলেন। হিন্দু মহাসভাও তা সমর্থন করলো। পরে সরকারও মেনে নেয়।

কিন্তু পুণা চুক্তিতে ফল যাই হোক অনেকে বলতে লাগল সামান্য একটি কারণে গান্ধীজীর আমরণ অনশন করতে যাওয়া ঠিক হয়নি। তাছাড়া এতে পৃথক নির্বাচন একেবারে রদ হয়নি। ইউরোপে অনেকে প্রচার করতে থাকে, যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করেন গান্ধীজী। তাদের কতকগুলি অধিকার দানের বিরুদ্ধে নিজেই অনশন করছেন।

যাই হোক, গান্ধীজীর অনশনের ফলে আইন অমান্য আন্দোলনটা চাপা পড়ে গেল। সারা দেশের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরে গেল। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন গান্ধীজী সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের। ২৬শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে সারা দেশের সব মন্দির অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দেয়া হয়। অবশ্য বহু মন্দিরের অছিগণ অস্পৃশ্যদের ঢুকতে দিতে রাজী হননি। তাঁরা আইনের আশ্রয় নেন। আইনগত বাধাগুলি দূর করার জন্য আইন পাসে সরকার রাজী হলো না।

২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মীমাংসার জন্যও এক আবেদন করেন গান্ধীজী।

এর আগের আগষ্ট মাসে কানাডার রাজধানী অটোয়া শহরে এক অর্থনৈতিক সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধিগণ একটি অন্যায় চুক্তি ভারতের উপর চাপিয়ে দেয়। এই চুক্তির বলে ভারতকে তার মোট আমদানির ছাব্বিশ ভাগ বৃটেন হতে করতে হবে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা যায় সারা দেশে। কিন্তু আইনসভায় জাতীয় সদস্য না থাকায় সহজেই পাস হয়ে গেল। গান্ধীজীও কোন জোর প্রতিবাদ করলেন না।

আগষ্ট মাসে লণ্ডন হতে ইণ্ডিয়া লীগের চার জন সভ্য ভারত ভ্রমণে আসেন। ঐ দলে ছিলেন মিস উইলকিনসন, মিস মনিকা হোয়েটলি, মিস্টার নিওনার্ভ ম্যাটার্স ও কৃষ্ণ মেনন। তাঁরা এদেশে

যতদিন ছিলেন প্রকাশ্যে কোন ভাষণ দেননি। শুধু গান্ধীজীর অনশনের সিদ্ধান্ত শুনে বলেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর না থাকার অর্থ বৃটেনের প্রতি সহনশীলতা, শান্তি ও সৌহার্দের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ যে শক্তিটি কাজ করে চলেছে তার অপসারণ।

এই বছর ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় অপরাধ আইনের সংশোধন হয়। এতে ঠিক হয় হত্যার চেষ্টা করলেই প্রাণদণ্ড হবে। গ্রামবাসীদের উপর পাইকারী হারে জরিমানা ধার্য করা হয়। পুলিশী অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসাবে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস ও কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি জেলাতেই সৈন্য মোতায়েন করা হয়।

নভেম্বরের মাঝামাঝি আবার তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক বসে লণ্ডনে। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির এক ছোট আকারের প্রতিনিধিদল যোগদান করে তাতে। বৃটিশ ভারত হতে যায় শুধু উদারপন্থীরা। তাতে ঠিক হয় ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন চালু হলে তার আইনসভায় মোট সদস্যসংখ্যার তিনভাগের এক ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকবেন। প্রতিরক্ষা বাজেট ভোটে দেয়া চলবে না। ভারতরক্ষার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারতের বাইরে পাঠানো হবে।

সুভাষচন্দ্রের মতে ১৯৩২ সালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ভারত হতে ইংলণ্ডে সোনা চালান। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে স্বর্ণমান হ্রাস পাওয়ায় ভারত হতে সেখানে সোনা চালান বেড়ে যায়। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একশো পাঁচ কোটি টাকার উপর দামের সোনা চালান হয়। ফলে ভারতের স্বর্ণভাণ্ডার কমে যায়। ১৭৫২.৬ মিলিয়ন টাকার নোটের তুলনায় মাত্র ১১২.৩ মিলিয়ন টাকার স্বর্ণভাণ্ডার অবশিষ্ট থাকে। চেম্বার অফ কমার্স ও দেশের নেতারা এই সোনা চালান বন্ধ করার জন্য বার বার আবেদন জানান সরকারের কাছে। কিন্তু ফল হয় না।

বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলের ভিতর সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে আসতে থাকে। তখন তিনি ছিলেন মাদ্রাজ জেলে। মান্দালয় জেলে থাকার সময় যে সব রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল এবার তাই দেখা যেতে লাগল। তখন একেবারে সেরে উঠলেও ক্রমাগত কয়েকবছর পরিশ্রম করে এই ভয়ঙ্কর স্বাস্থ্যহানির দিকে ঠেলে দিয়েছেন নিজেকে।

আগষ্ট মাসের শেষে মাদ্রাজ জেল থেকে মেজবৌদিকে একখানি চিঠিতে জানাল সুভাষচন্দ্র, নীলরতনবাবু ও বিধানবাবু পরীক্ষা করে দেখে ফিরে গেছেন। তাঁদের কাছে বিস্তৃত সংবাদ পাবেন। তাঁদের সঙ্গে আরও দুজন ডাক্তার ছিলেন। সকলে একমত হয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন। সংক্ষেপে তাঁদের মত এই যে, যক্ষার লক্ষণ পাওয়া গেছে, পেটের মধ্যে গোলমাল আছে—হয়ত এ্যাপিণ্ডিসাইটিস। অবিলম্বে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠানো উচিত। সুইজারল্যাণ্ডে অথবা ভারতে ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়ামে রেখে চিকিৎসা করতে হবে। জেলে থাকলে রোগের প্রকোপ আরও বাড়বে।···এখন আবার সরকার বাহাদুরের আদেশের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে।

॥ চোদ্দ ॥

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন একরকম ব্যর্থ হলেও বিরাট উদ্দীপনা দেখা গেল নতুন বছরের স্বাধীনতা দিবসে। গত দুবছর হতে ২৬শে জানুয়ারি তারিখটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রথম শপথ নেয়া হয় এই দিনটিতে। এই দিন সারা দেশের কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বার করে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করে আসছে সেই থেকে।

সেবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সবচেয়ে উৎসাহ দেখা দিল বাংলা

দেশে আর গুজরাটে। সুভাষচন্দ্র জেলে আটক থাকলেও বিক্ষোভ মিছিল বার হলো বাংলার জেলায় জেলায়। বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের কাজকর্ম বাংলাদেশেই বরাবর বেশী। সরকার তাই বাংলার জন্যই সবচেয়ে বেশী চিন্তিত। দমনমূলক অত্যাচারের দরকার হয় বাংলাতেই বেশী।

অন্যবারকার মত সেবারও কলকাতার পথে পথে বিক্ষোভ মিছিলের ছড়াছড়ি। সে মিছিল ছত্রভঙ্গ করবার জন্য সরকারও উঠে পড়ে লেগে গেল। একের পর এক করে চলল লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, তারপর গ্রেপ্তার। সারা কলকাতায় তিনশো লোককে গ্রেপ্তার করা হলো।

এ বছরে স্বাধীনতা দিবসের পক্ষে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রায় ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা বিপ্লবীদের নায়ক সূর্য সেনের গ্রেপ্তার। তিন বছর গ্রেপ্তার এড়িয়ে ঘুরে বেড়ান সূর্য সেন। কিন্তু আর পারলেন না। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ আদালতে বিচার হলো তাঁর। বিচারে তাঁর ও তাঁর একজন সঙ্গীর ফাঁসি হলো।

শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল বাঙ্গালী জাতি।

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় বদনগঞ্জে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি চালাল সরকারী কর্তৃপক্ষ।

এর দিনকতক পর ৭ই ফেব্রুয়ারি গুজরাটের বোরসাদ নামক জায়গায় একটি মহিলা শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় গান্ধীজীর স্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী গ্রেপ্তার হন। বিচারে ছয় মাস জেল হয় তাঁর।

এদিকে সুভাষচন্দ্রের কারাবাসের চোদ্দ মাস পূর্ণ হলো। রোগের লক্ষণগুলি তখনও পর্যন্ত একটুও কমেনি। বরং বেড়েই চলছিল। লক্ষ্ণৌএর একজন সরকারী ডাক্তার কর্ণেল বাকলে তাঁকে দেখতেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসার জন্য ইউরোপে বদলির সুপারিশ

করেন। তখন ইউরোপ যাবার অনুমতি দেয় সরকার। ব্যয়ভার সরকারই বহন করবে।

২২শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান সুভাষচন্দ্র। অবশেষে ভিয়েনা যাবার ঠিক হয়। বোম্বাই থেকে ভিয়েনা যাত্রা করলেন মার্চ মাসের প্রথম দিকে। ১১ই মার্চ ভিয়েনায় ডাক্তার ফুর্থএর স্বাস্থ্য নিবাসে ভর্তি হলেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ভয় পেয়ে গেলেন ডাক্তাররা। বহুদিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। তখন কংগ্রেস নেতা বিঠলভাই প্যাটেলও ছিলেন ভিয়েনায়। নিজের চিকিৎসা চলাকালেই একদিন তাঁর সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করলেন সুভাষচন্দ্র। দেশের অবস্থা নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা চলল দুজনে।

ভারতে তখন দ্রুত আর অনিবার্যভাবে বয়ে চলছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর স্রোত। সে স্রোত নিয়ন্ত্রিত করার মত কেউ নেই। নেতারা অসহায়, কর্মীরা দিশেহারা, জনগণ বিমূঢ়। সকলেই ভেসে চলেছে সেই সব অবাঞ্ছিত ঘটনার স্রোতে। তবু উপায় নেই।

১৭ই মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্রের সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি সরকারী প্রস্তাব সমেত একটি শ্বেতপত্র ঘোষিত হয়। শ্বেতপত্রের এই সরকারী প্রস্তাব আলোচনা করে দেখার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশন ডাকা হয় কলকাতায়। সভাপতি নির্বাচিত হন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

সভা সমিতি ডাকা তখনও নিষিদ্ধ কলকাতায়। তবু সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে নেতা ও প্রতিনিধিরা এসে জড়ো হলেন ১১ই এপ্রিল তারিখে। আসার সঙ্গে সঙ্গেই নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। প্রধান প্রধান নেতাদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মালব্য, পণ্ডিত মতিলালের স্ত্রী শ্রীমতী নেহেরু, মধ্যপ্রদেশের শ্রীমতী এ্যানে, পাঞ্জাবের ডাঃ আলম, বিহারে ডাঃ সৈয়দ মামুদ। শ্রীমতী নেহেরু ছাড়া এঁরা

সকলেই ছিলেন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। পণ্ডিত জওহরলাল ছিলেন জেলে।

তবু নেতারা ঘোষণা করলেন, অধিবেশন বসবেই। কোন শক্তি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা প্রায় আড়াই হাজার কংগ্রেস কর্মীকে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির. হলেন। স্বল্পকালীন অধিবেশনে শ্বেতপত্রের প্রস্তাবগুলির নিন্দা করা হলো। স্বাধীনতার লক্ষ্য, ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আইন অমান্যের কার্যকারিতা, বিদেশী কাপড় ও বৃটিশ পণ্য বর্জনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হলো।

শ্বেতপত্রের সবচেয়ে প্রধান প্রস্তাব হলো, বৃটিশ ভারতের এগারোটি প্রদেশ ও যোগদানেচ্ছু দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হবেন ; কিন্তু দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ হতেন সরকারের মনোনীত। এর ফলে শাসনযন্ত্রে সরকারের হাতই আরও বলিষ্ঠ হবে। সরকার ও দেশীয় রাজাদের যোগসাজসে একটি রক্ষণশীল শক্তি গড়ে উঠবে শাসনযন্ত্রে। তাছাড়া এই যুক্তরাষ্ট্র কখন হবে তার ঠিক নেই, অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখাও যেতে পারে। এই শ্বেতপত্রে বড়লাট ও গভর্ণর জেনারেল পদটিও দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একই লোক থাকবেন দুটি পদে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের প্রধান হবেন গভর্ণর জেনারেল এবং বৃটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে সাম্রাজ্যের স্বার্থ দেখবেন বড়লাট বা 'ভাইসরয়।'

শ্বেতপত্রের আর একটি দোষ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতি। এই নীতি অনুসারে আইনসভাগুলিতে শিখ, মুসলমান, ভারতীয় খৃষ্টান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়দের জন্য আসন সংরক্ষিত হয় এবং পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় তাদের জন্য। এর ফলে ভারতকে আরও ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা হয়। সব প্রদেশ মুসলমান সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দিয়ে তাদের

লাভবান করে তোলা হয়। কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবে যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু সেখানে তাদের অনুরূপ প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়নি।

এ শ্বেতপত্র কোন দিক দিয়েই মানতে পারা যায় না। কংগ্রেস তা মানতে পারেনি। কলকাতা কংগ্রেসের সভা শেষ না হতেই জোর করে ভেঙ্গে দিল পুলিশ। সভানেত্রী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সঙ্গে চল্লিশ জন নারী ও আড়াইশো জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলো। সরকারী দমননীতির কঠোরতায় পণ্ডিত মালব্যের মত প্রবীণ নরমপন্থী নেতারাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

সরকারী দমননীতির কঠোরতার জবাব দেবার জন্য জনগণ যখন আইন অমান্য আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলার জন্য তৈরি হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় জেল থেকে হঠাৎ ঘোষণা করলেন গান্ধীজী, তিনি আগামী ৮ই মে থেকে তিন সপ্তাহের জন্য অনশন করবেন।

এই অনশনের কারণ কিন্তু কোন সরকারী নীতির প্রতিবাদ নয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ তাঁর নিজের ও সঙ্গীদের অন্তর শুদ্ধিকরণ। গান্ধীজীর অভিযোগ হরিজনদের উন্নতি ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ব্যাপারে কংগ্রেসকর্মীরা মনোযোগ দেননি ঠিকমত।

সরকার দেখল গান্ধীজী যখন নিজের দলের নেতাদের বিরুদ্ধে অনশন করছেন তখন তাঁকে আটকে রেখে লাভ নেই। বরং তাঁকে ছেড়ে দিলে দলের মধ্যে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে ফাটলটা বড় হতে পারে আরও।

গান্ধীজীকে জেল থেকে মুক্তি দেবার পরদিনই গান্ধীজী ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন। আর সেই নির্দেশমত অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীএ্যানে আইন অমান্য বন্ধের আদেশ দিলেন কংগ্রেসকর্মীদের।

অনশন চলতে লাগল। এই অনশন চলাকালেই গান্ধীজী সরকারের কাছে এক আবেদনে জরুরী আইন প্রত্যাহার ও

রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাঁর সে অনুরোধ রাখল না সরকার।

কংগ্রেস দলের মধ্যে একটি বিরাট অংশ গান্ধীজীর এই আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি তখন অনশন করছিলেন বলে কেউ তাঁকে বিরক্ত করল না।

ভিয়েনাতে সুভাষচন্দ্র ও বীঠলভাই প্যাটেল এর প্রতিবাদ করে বললেন, গান্ধীজীর এই অনশন নিছক আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে আইন অমান্যের জন্য তিনি গত বছর জেলে গিয়েছিলেন বিনা কারণে এখন হঠাৎ সে আন্দোলন মুলতুবী রাখলেন।

তবে সুভাষচন্দ্রের মত অতটা উগ্র নন বীঠলভাই। কংগ্রেসের নীতি নিয়ে দুজনের মধ্যে কিছুটা তর্কও হলো। একদিন এক সাংবাদিকের কাছে বীঠলভাই বললেন, আমার তরুণ বন্ধুটি মনে করেন, আক্রমণ হবে ছোরার মত ধারালো আর আমি মনে করি, নিজেদের বাড়িতে আমাদের অতটা বেপরোয়া হলে চলবে না।

সুভাষচন্দ্র বললেন, গান্ধীজী হলেন সেকেলে এক জীর্ণ গৃহসজ্জা। এক সময়ে কাজে লেগেছেন, কিন্তু এখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

প্যাটেল বললেন, সক্রিয় রাজনীতিবিদ হিসাবে হয়ত তাই, কিন্তু তাঁর নামের মূল্য আজও বিরাট এবং কিছুদিন থাকবে।

সুভাষচন্দ্র বললেন, গোল টেবিল বৈঠকে মিথ্যে সময় নষ্ট হলো। আলাপ আলোচনার দ্বারা ইতিহাসে কখনই কোন সত্যিকারের রাজনৈতিক পরিবর্তন আসেনি।

প্যাটেল বললেন, আবার আলোচনা না করা মানে ত যুদ্ধ করতে যাওয়া।

সুভাষচন্দ্র বললেন, আপত্তি কী? স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষ সহজেই রক্ত দিতে পারে। পঁয়ত্রিশ কোটি হতভাগ্য মানুষ মুক্তির পথ চেয়ে বসে আছে।

শেষকালে সুভাষচন্দ্রের যুক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে প্যাটেল

বললেন, নতুন ভারতের মনের কথা হলো এই। কিন্তু মনটা ধারালোও হতে পারে, ভোঁতাও হতে পারে। সৃষ্টিশীল হতে পারে আবার আত্মঘাতীও হতে পারে। তবে দেবতারা যদি নিজেরাই ক্ষুধার্ত হন তাহলে রক্ত না দিয়ে আমাদের উপায় কী ?

সঙ্গে সঙ্গে একটি যুক্ত বিবৃতির খসড়া তৈরি হলো। ১৯৩৩ সালের ৯ই মে তারিখে সই করলেন দুজনে সে খসড়ায়। ১৯২০ সাল থেকে গত তেরো বছরের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমালোচনা করে বিবৃতিতে বলা হলো :

গত তের বছরের ঘটনাবলী এই কথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের দুঃখভোগ হবে সবচেয়ে বেশী আর প্রতিপক্ষের কষ্ট হবে সবচেয়ে কম, এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয় তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু নিজেরা দুঃখ ভোগ করে আর প্রতিপক্ষকে ভালবেসে কোনদিনই আমাদের শাসকদের হৃদয় গলাতে পারব, এ আশা বৃথা। আইন অমান্য বন্ধ রেখে মহাত্মা যা করলেন তাতে কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতির ব্যর্থতাকেই মেনে নেয়া হয়। আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ।

কংগ্রেসের আমূল সংস্কারের কথাও বলা হলো বিবৃতিতে।

সুতরাং নতুন নীতির উপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাবার সময় এসেছে এখন। কংগ্রেসের পুনর্গঠনের জন্য নেতৃত্বের বদল হওয়া দরকার ; কারণ এটা মহাত্মা গান্ধীর কাছে আশা করা যায় না যে, তিনি এমন কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন যা তাঁর সারা জীবনের নীতির সঙ্গে মিলবে না। যদি গোটা কংগ্রেস দলের মধ্যে এই পরিবর্তন আসে ত ভালই। যদি তা না হয় তাহলে আমূল সংস্কার যারা চায় তাদের নিয়ে কংগ্রেসের ভিতরেই একটি নতুন দল গড়ে তুলতে হবে। অসহযোগ ত্যাগ করা যেতে পারে না, তবে তার রূপটাকে পাল্টে জঙ্গী ধরনের করে তুলতে হবে

এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম যেন দেশের সব দিকে সব স্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে এই বিবৃতিতে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাবে না ভারতে, সেকথা দুজনেই জানতেন। দুজনেই তখন ভাবলেন, এখন বিদেশে থেকে পরাধীন ভারত সম্পর্কে বিশ্বের জনমত সৃষ্টি করতে পারলে কাজ হবে। পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলি ধিক্কার ও লজ্জা দেবে বৃটিশকে।

✓ রাশিয়া আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য সুভাষচন্দ্রও উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বীঠলভাই নিষেধ করলেন। ✓

সুভাষচন্দ্র বললেন, আমি কমিউনিজমের কথা বলছি না। ভারতবর্ষের সমস্যা কমিউনিজমে সমাধান হবে না, তবে রাশিয়ার কাছ থেকে বিপ্লবের কলাকৌশল সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখার আছে। বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াইএর ব্যাপারে কিছু সাহায্যও পাওয়া যেতে পারে।

প্যাটেল বললেন, কিন্তু তাতে ভারতে তোমার কাজের ক্ষতি হতে পারে।

যাই হোক রাশিয়া না গিয়ে মে মাসে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ভ্রমণ করার অনুমতি যোগাড় করলেন সুভাষচন্দ্র। তখন তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু বীঠলভাই প্যাটেলের শরীরের কোন উন্নতি দেখা গেল না। সুভাষচন্দ্র একাই বার্লিন, রোম, প্রাগ, ওয়ারশ, ইস্তামবুল, বেলগ্রেড, বুখারেষ্ট প্রভৃতি দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এই সময় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু সংবাদ শুনে অনেকখানি বিচলিত হয়ে পড়েন সুভাষচন্দ্র। বাড়িতে অন্তরীণ থাকার সময় ২৬শে জুলাই হঠাৎ মৃত্যু হয় যতীন্দ্রমোহনের।

এদিকে ভারতে জুলাই মাসে কংগ্রেস নেতাদের এক বেসরকারী

সভা বসল পুণাতে। তাতে একদল আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে চাইল আর একদল আন্দোলন চালিয়ে যেতে চাইল। গান্ধীবাদীদেরই জয় হলো। ঠিক হলো, কংগ্রেস গণ আইন অমান্য আন্দোলন ত্যাগ করে ব্যক্তিগত আইন অমান্য শুরু করবে। আরও ঠিক হলো, সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে চেষ্টা করে যাবেন গান্ধীজী।

বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুমতি চেয়ে পাঠালেন গান্ধীজী। কিন্তু বড়লাট রাজী হলেন না। এই অপমানজনক প্রত্যাখ্যানে রেগে গিয়ে ব্যক্তিগত আইন অমান্য শুরু করলেন গান্ধীজী। আগষ্ট মাসে আবার গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে এক বছরের জেল হলো।

এর আগের বার জেলে থাকার সময় বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনার জন্য কতকগুলি সুযোগ সুবিধা পেতেন গান্ধীজী, যার ফলে জেলে বসেই তিনি অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু এবার সে সব সুবিধা সুযোগ দিতে চাইল না সরকার।

তখন গান্ধীজী আবার অনশনের ভয় দেখালেন সরকারকে।

সরকার বলল, একজন সত্যাগ্রহী হিসেবে জেলের নিয়ম কানুন সব অবাধে মেনে চলা উচিত গান্ধীজীর। কিন্তু এখন তিনি বলছেন উল্টো কথা।

যাই হোক, গান্ধীজীকে ছেড়ে দিল সরকার। কারণ তারা ভাবল ব্যক্তিগত আইন অমান্য করে কিছু করতে পারবেন না গান্ধীজী। বেরিয়ে এসে গান্ধীজী বললেন, আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ এক বছর। আগে ছেড়ে দিলেন সরকার। ঐ মেয়াদ শেষ না হলে আমি কোনি কাজই করব না।

ঠিক এমনি সময়ে দুই বছরের কারাদণ্ড ভোগের পর জেল থেকে বেরিয়ে এলেন পণ্ডিত জওহরলাল। এসেই দেখলেন, গান্ধীজীর

নির্দেশে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি দেশের সব কংগ্রেস সংগঠন ভেঙ্গে দেবার আদেশ দিয়েছেন। গান্ধীজীর অভিযোগ, কংগ্রেস সংগঠনগুলি দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছে। আইন অমান্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত গোপনতা অবলম্বন করেছিল বলেই তা ব্যর্থ হয়েছে।

ফলে বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল কংগ্রেসকর্মীরা। একে সরকার কংগ্রেস সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে, তার উপর নেতারা যদি একেবারে ভেঙ্গে দেন সংগঠনকে, তাহলে কিসের মাধ্যমে আন্দোলন করবে জনগণ কংগ্রেসকর্মীরা তা ভেবে পেলেন না। অনেকে ভাবলেন পণ্ডিত জওহরলাল এবার কংগ্রেস সংগঠনের ভার নিজের হাতে তুলে নেবেন। জনপ্রিয়তায় গান্ধীজীর পরেই যাঁর স্থান, যার চিন্তাধারা মহান এবং বিচারবুদ্ধি স্বচ্ছ, পৃথিবীর সব দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারার কথা যাঁর জানা আছে, তিনি যদি দলের ভার নেন তাহলে নিশ্চয়ই কংগ্রেস আবার নতুন জীবন পাবে।

কিন্তু তা করলেন না পণ্ডিত জওহরলাল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য সম্বন্ধে কিছু লিখলেন, কিন্তু কাজে কিছুই করলেন না। বোম্বাইএর কংগ্রেস নেতা নরীম্যানও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অনেক যুক্তি দেখিয়ে গান্ধীজীর কথা ও কাজের অনেক সমালোচনা করলেন। কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই করলেন না।

২২শে অক্টোবর বীঠলভাই প্যাটেলের হৃদরোগে মৃত্যু হলো জেনেভার কাছে এক সুইস ক্লিনিকে। খবর পেয়ে জেনেভায় ছুটে এলেন সুভাষচন্দ্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বীর যোদ্ধাকে হারাল ভারত। সুভাষচন্দ্র তখনো ইউরোপেই ঘুরে বেড়িয়ে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছিলেন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। কার কাছ থেকে কখন কি সাহায্য পাওয়া যায় বলা যায় না। দেশে ফেরার উপায় নেই। দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার করা হবে।

ভিয়েনাতে এসে দেখলেন সুভাষচন্দ্র, ভারতের কথা বিদেশে

প্রচারের জন্য বীঠলভাই তাঁর প্রচুর টাকার অছি করে গেছেন সুভাষচন্দ্রকে। তাঁর প্রতি স্বর্গত বন্ধুর এই গভীর বিশ্বাস দেখে অভিভূক্ত হয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র। তিনি এইটাই চাইছিলেন। বিদেশে প্রচারের কাজে প্রচুর উৎসাহ পেলেন।

॥ পনের ॥

১৯৩৩ চলে গেল।

কংগ্রেসের অচলাবস্থার জন্য উদ্বেগের অন্ত রইল না সুভাষচন্দ্রের মনে। বিশেষ করে বছরের শেষ কটা মাস কেটেছে নিদারুণ উদ্বেগ আর আশঙ্কার মধ্যে। কিন্তু সুদূর বিদেশে থেকে করার কিছু নেই। তাছাড়া ঠিক এখন দেশে থাকলেও কীই বা করতে পারতেন তিনি। কংগ্রেসের বেশীর ভাগ নেতাই গান্ধীজীর প্রতি মোহগ্রস্ত। এর আগেও যখনই কংগ্রেসের মধ্যে সংকট ঘনিয়ে উঠেছে তখনই কুণ্ঠায় কণ্ঠরোধ হয়ে উঠেছে পণ্ডিত জওহরলালের। একটা কথাও বলতে পারেননি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে। কাজের মত একটা কাজও করতে পারেননি।

নতুন বছর অবশ্য কিছুটা নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে এল। দিল্লীর কংগ্রেস নেতা ডাঃ এম, এ, আনসারী ও বাংলার বিধানচন্দ্র রায় এগিয়ে এলেন কংগ্রেসকে নতুন করে বাঁচাবার জন্য। ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে এক সম্মেলন ডাকা হলো কংগ্রেসের।

দেশের জরুরী আইন তখনও পর্যন্ত বলবৎ থাকায় কংগ্রেস কাজ করতে পারছিল না। কিন্তু সরকার বলল, বিনা শর্তে আইন অমান্য প্রত্যাহার করে না নিলে জরুরী আইন তোলা হবে না।

দিল্লী অধিবেশনে বিশেষ কোন কাজ হলো না। পরের মাসে আবার অধিবেশন বসল রাঁচিতে। তার পরের মাসে পাটনায়। পাটনা

কংগ্রেসে বেশীর ভাগ সময় আলোচনা হয় নির্বাচন নিয়ে। সরকার আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে নভেম্বর মাসে নতুন নির্বাচনের সময় ঠিক করেছে। এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করায় স্বরাজ্য দলের নীতিটিকে গান্ধীজী নিজেই প্রস্তাবের আকারে উত্থাপন করলেন।

পাটনা কংগ্রেসের সভা প্রকাশ্যে বসল। সরকার কোন বাধা দিল না। কারণ এর আগের মাসে ৭ই এপ্রিল তারিখে এক বিবৃতিতে স্বরাজ লাভের উপায় হিসাবে আইন অমান্য বন্ধ রাখবার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আইন অমান্যের সব দায়িত্ব তিনি নিজেই বহন করবেন। তাঁর এই নির্দেশ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মেনে নেয়।

কংগ্রেস কমিটি মেনে নিলেও নবগঠিত সমাজতন্ত্রীদল আইন সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের নীতি মানল না। অন্যদিকে আবার নতুন সমস্যা দেখা দিল কংগ্রেসের মধ্যে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রী এ্যানে বললেন শ্বেতপত্রের মত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারারও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হোক। কিন্তু কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যরা 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি গ্রহণ করার কথা বললেন।

মুসলমান সদস্যদের বিরাগভাজন হবার ভয়ে কংগ্রেস এই নীতিই মেনে নিল।

ফলে পণ্ডিত মালব্য ও শ্রী এ্যানে দলের কার্যনির্বাহক সমিতি ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য পদ ত্যাগ করে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল নামে আলাদা একটি দল গড়লেন। ১৯শে আগষ্ট তারিখে এই দলের প্রথম অধিবেশন বসল কলকাতায়।

সেপ্টেম্বর মাসে ৮ই ৯ই ও ১০ই তারিখে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সভা বসল ওয়ার্ধায়। কংগ্রেসের দুটি দলের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সফল হয়নি সে চেষ্টা। ফলে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়ে রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণের কথা ভাবতে থাকেন গান্ধীজী। তবে বন্ধুদের অনুরোধে বোম্বাই অধিবেশন পর্যন্ত অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত

স্থগিত রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে দুর্নীতির উল্লেখ করে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রে তিনটি সংশোধন আনার প্রস্তাব করেন।

কংগ্রেস যে সব আন্দোলন করবে তার সব ক্ষেত্রেই বৈধ ও শান্তিপূর্ণ কথাদুটির বদলে সত্যাশ্রয়ী ও অহিংস শব্দ দুটির প্রয়োগ করতে হবে। চার আনা চাঁদার বদলে আট হাজার ফিট হাতে-কাটা মিহি সুতো জমা দিতে হবে। ছয় মাস কংগ্রেসের সদস্য না থাকলে এবং নিয়মিত খদ্দর না পরলে কেউ নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার পাবেন না।

বোম্বাই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো ১৯৩৪ সালের ২৬ শে অক্টোবর। ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্ট তখনও প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং তা আলোচনা করে দেখা সম্ভব হলো না। বোম্বাই কংগ্রেসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হলো সংগঠন সম্বন্ধে। প্রস্তাব দুটি গান্ধীজীর নিজের হাতে রচিত বলেই অনেকের ধারণা।

প্রথম প্রস্তাবটিতে কংগ্রেস প্রতিনিধি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেয়া হলো। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে নিখিল ভারত গ্রাম্য শিল্প সমিতি গঠনের কথা বলা হলো।

গান্ধীজী রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের কার্য পরিষদের নামের তালিকা হতে তাঁর নাম বাদ গেল। কিন্তু তাঁরই গোঁড়া সমর্থকদের দ্বারা ভরে রইল কার্য পরিষদ। তাঁর মত না নিয়ে কোন কাজ করবেন না তাঁরা। সাম্প্রদায়িক বঁটোয়ারার প্রশ্নে যারাই একমত হতে পারেননি গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের সকলকেই বাদ দেয়া হলো কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে।

ইউরোপে ঘুরে বেড়ালেও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে। 'দি ইণ্ডিয়ান

স্ট্রাগল' নামে একখানি বই লিখেছিলেন। তার কাজ শেষ হতে নভেম্বরে সেটি প্রকাশিত হলো।

এই বইটিতে একদিকে তিনি দেখালেন ভারতের জাতীয় আন্দোলন কোন পথে চলছে, কোথায় কোথায় তার ত্রুটি; আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখালেন কী ধরণের শাসনতন্ত্র ভারতের পক্ষে দরকার। এই শাসনতন্ত্র হবে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম এর মাঝামাঝি একটি পথ। রোম ও ইস্তামবুলে যা তিনি দেখেছেন তা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে তাঁর মনকে। এক জায়গায় দেখেছেন কড়া পার্টি সংগঠন আর এক জায়গায় দেখেছেন দেশ গঠন। মুস্তাফা কামাল পাশা কিভাবে একা তুর্কীর মত প্রাচ্যের একটি অনুন্নত দেশকে গড়ে তুলছেন সম্পূর্ণ আধুনিক ধাঁচে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান সুভাষচন্দ্র।

তিনি দেখলেন, ভারতের সমাজেও ঐ এক ভাবে দেশগঠনের কাজ হওয়া দরকার এবং দেশশাসনের জন্য চাই একজন ডিক্টেটর। বছর কয়েকের জন্য ডিক্টেটরী ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় সরকার দরকার আর তার সঙ্গে সঙ্গে চাই সামরিক শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি পার্টি। শুধু স্বাধীনতা পেলেই হবে না, সে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে এবং এটাই হলো তার একমাত্র উপায়।

নভেম্বরের শেষের দিকে বাড়ি থেকে হঠাৎ এক তারবার্তা পেলেন সুভাষচন্দ্র। বাবা মৃত্যুশয্যায়।

বিমানযোগে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন। পৌঁছতে একদিন দেরি হয়ে গেল। দমদম বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছে দেখলেন, এক বিরাট পুলিশ বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য দাঁড়িয়ে। তবে এবার আর জেলে নয় নিজের বাড়িতেই অন্তরীণ হয়ে থাকতে হবে যতদিন দেশে থাকবেন।

বাড়ি এসে দেখলেন সব শেষ হয়ে গেছে। শেষ দেখা হলো না বাবার সঙ্গে। মনে বড় ব্যথা পেলেন সুভাষচন্দ্র।

দুঃখের উপর দুঃখ। এতদিন পর দেশে এলেন, তার উপর

এতবড় একটা শোক। অথচ বাড়ি থেকে বেরোবার উপায় নেই। বাইরের লোকের সঙ্গে বেশী কথা বলা চলবে না। বাড়িতে বসেই আলোচনা হয়। অনেকে দেখা করতে আসেন, ভারতের আইন সভার নতুন নির্বাচন নিয়ে কথা হয়। কিন্তু এসবে কী হবে? এতে কোন উৎসাহ অনুভব করেন না সুভাষচন্দ্র। আজকাল একটা কথা তাঁর বারবার মনে হয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র ধারাটি ভুল পথে চলে আসছে এতদিন। প্রতিপক্ষের কাছে কেবল আপোষ আর আত্মসমর্পণ করা হয়েছে।

॥ ষোল ॥

১৯৩৫ সাল

নতুন বছর পড়তেই ১০ই জানুয়ারি আবার ইউরোপেই ফিরে গেলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৫ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস।

কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে এই আইন প্রত্যাখ্যান করল। দেশের জনগণ এর বিরোধিতা করল। তবু সরকার এটিকে বলবৎ করল। সরকার বলল, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংস্কার। স্বায়ত্তশাসনের পথে এটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

কিন্তু দেশের জনগণের এটা বুঝতে বাকি রইল না, সরকারের আসল উদ্দেশ্য হলো ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ, সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল ও বৃটিশ ঘেঁষা শক্তিগুলির সাহায্যে বৃটিশ শাসনের ভিতটাকে শক্ত করা।

১৯৩৫ সালের নতুন শাসনতন্ত্রের দুটি প্রধান দিক হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে সর্বভারতীয় এক কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের কথা বলা হলো তাতে।

একেই বলা হবে যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় থাকবে দুটি কক্ষ। আর এই দুটি কক্ষেই দেশীয় রাজারা যথাক্রমে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ ও তিন ভাগের এক ভাগ সদস্য মনোনীত করবেন।

কেন্দ্রে ও প্রদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির জন্য আসন সংরক্ষিত হলো, আইনসভাগুলির ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করা হলো। বড়লাটের হাতে সৈন্যবাহিনী ও প্রতিরক্ষা, নাকচ বা কোন মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করতে পারবেন। কোন আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে শাসনতন্ত্র স্থগতি রাখার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। এদিকে প্রাদেশিক গভর্ণরও শান্তি ভঙ্গ হলে জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র বলেন, এই বছরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রভাব বৃদ্ধি। কংগ্রেসের মধ্যে যারা তরুণ, চরমপন্থী ও সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী তারা নিজেদের সংহত করতে লাগল এই মতের মধ্যে। ১৯২০ সাল হতে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীবাদীদের যে একচেটিয়া প্রভাব প্রতিদিন চলে আসছিল তার বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আজ সংহত ও সোচ্চার হয়ে উঠল প্রথম।

আসলে এই দলটির উদ্ভব হয়েছিল বছর কতক আগে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু রাশিয়া থেকে ফিরে এসে নিজেকে সমাজবাদী বলে ঘোষণা করলে অনেকে সংগত ভাবেই আশা করেছিলেন, এ দলের নেতৃত্বভার তিনিই তুলে নেবেন নিজের উপর। কিন্তু গান্ধীজীর রক্ষণশীল প্রভাব হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে না পারার জন্য তা পারেননি পণ্ডিত জওহরলাল।

তখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল বৃটিশ সরকার। এই পার্টির সদস্য কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মাধ্যমে নিজেদের দলগত আদর্শ প্রচার করতে থাকে। বিশেষ করে শ্রমিক যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়তে থাকে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রভাব।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তখনও জেলে। প্রকাশ্যে যোগদান না করলেও তিনি তাঁর নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতি।

বর্ষার পর শরৎ আসতেই দেশে খবর এল পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর স্ত্রী শ্রীমতী কমলা নেহেরু ইউরোপের স্বাস্থ্যনিবাসে মৃত্যুশয্যায়। তিনি তাঁর স্বামীকে শেষবারের মত দেখতে চেয়েছেন। এদিকে জওহরলালকে জেল থেকে মুক্তি দিতে চাইল না ভারত সরকার। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপের ফলে জওহরলালকে মুক্তি দেয়া হলো।

জেল থেকে বেরিয়েই সোজা ইউরোপ চলে গেলেন জওহরলাল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর জার্মানীর বাদেনওয়ালাতে কিছুদিন থাকেন। এই সময় তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। জার্মানী থেকে মাঝে মাঝে লণ্ডন প্যারিস প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কিছুকাল পর তাঁর ইউরোপে থাকাকালেই আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হয়। উদারপন্থী ইংরেজদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে বইখানি।

॥ সতের ॥

ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে এলেন জওহরলাল ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে। এসেই শুনলেন আগামী এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌএ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসছে তাতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এ সভার গুরুত্ব অনেক বেশী। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে আগামী বছরে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সে নির্বাচনে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে কি না তা এই অধিবেশনেই ঠিক হবে।

ঠিক এই সময় সুভাষচন্দ্রের অভাবটাকে বিশেষভাবে অনুভব করলেন জওহরলাল। তার কেবলি মনে হতে লাগল আজ সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছে থাকলে অনেক সাহস পেতেন তিনি। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে সরাসরি লিখে দিলেন জওহরলাল, তুমি এখনি দেশে চলে এসো। এবার বৃটিশের সঙ্গে যাতে কোনরকম আপোষ না হয় তার জন্য তোমার থাকা দরকার।

ভিয়েনাতে চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ থেকে ঘোষণা করলেন, আমি দেশে ফিরে যাব।

এদিকে ভিয়েনার বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ভারত সরকারও তাঁকে জানিয়ে দিল, দেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

সুভাষচন্দ্র তার জবাবে জানালেন, আমি সরকারের হুমকি ও চোখ রাঙানিকে ভয় করি না।

৮ই এপ্রিল বোম্বাইএ জাহাজ থেকে নামলেন সুভাষচন্দ্র। দেশের লোক আজ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আজ তাঁকে চায়। তাঁকে দেশে ফিরতেই হবে। তাছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এখনও তাঁর দেবার অনেক কিছু আছে।

জাহাজ থেকে নেমেই অবাক হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র, এক বিপুল জনতা অপেক্ষা করছে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। আবার সদলবলে পুলিশ ফৌজও তৈরি হয়ে আছে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য। কিন্তু আসন্ন কারাবরণের কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হলো না তাঁর। আজ এই যে অসংখ্য দেশবাসী তাঁর প্রতি এক অকৃত্রিম ভালবাসার বিপুল ও উচ্ছ্বসিত আবেগে ফেটে পড়েছে, এর কাছে যে কোন দুঃখ কষ্টই তুচ্ছ। আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র।

পুলিশকে ধরা দিয়ে জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন সুভাষচন্দ্র, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকবে।

চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। জনগণ ক্ষুব্ধ হলো এই

গ্রেপ্তারে। সুভাষচন্দ্র তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইখানিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস নেতাদের সমালোচনা করলেও কংগ্রেস নেতারা একবাক্যে প্রতিবাদ করলেন এই গ্রেপ্তারের। আইন সভায় নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। সুদূর ইংলণ্ডেও ধ্বনিত হলো সে প্রতিবাদ। কিন্তু কোন ফল হলো না। ভারত সরকার বলল, সুভাষচন্দ্র ভারতে আইরীশ কায়দায় বৃটিশের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

ইংলণ্ডে বৃটিশ সরকার বলল, সুভাষচন্দ্র একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লোক; কিন্তু বৃটিশের বিরুদ্ধে হিংসামূলক কাজে লিপ্ত।

নতুন আইন অনুসারে নির্বাচন হবে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে। ঠিক হলো বৃটিশ ভারতের এগারটি প্রদেশের যে যে প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে কংগ্রেস সেখানেই মন্ত্রীসভা গঠন করবে। কিন্তু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও কংগ্রেসের অনেকেই কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন।

কংগ্রেস বলল, নির্বাচনে যোগদান করলে জয়ী হলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা না করলে নির্বাচনে যোগ দেয়ার কোন অর্থ হয় না।

নির্বাচনে আইনসভাগুলিতে কংগ্রেস যাতে জয়ী হতে না পারে তার জন্য অনেক বাধা সৃষ্টি করেছিল বৃটিশ সরকার। কিন্তু সব বাধা সত্বেও এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল কংগ্রেস। এর পর মন্ত্রীত্ব গ্রহণ। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে তখনও আন্দোলন চলছে। সুভাষচন্দ্রকে জেল থেকে ছাড়া হলো মার্চ মাসে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রায় সব রাজবন্দীদেরও ছেড়ে দেয়া হলো। কিন্তু বাংলা ও আন্দামানের রাজবন্দীদের ছাড়া হলো না। কয়েক হাজার বাঙ্গালী রাজবন্দীকে তখনও পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল। আন্দামানের রাজবন্দীরা তখন

হতাশ হয়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সরকার বাধ্য হয়ে তাঁদের দেশের জেলে পাঠিয়ে দেয়।

জুলাই মাসে নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রীসভা গঠন করার স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নেয়। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে যে আন্দোলন চলছিল এ বিষয়ে তা বানচাল হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ও উড়িষ্যা এই আটটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পরে এই সাতটি প্রদেশেই মন্ত্রীসভা গঠন করে। একমাত্র বাংলা দেশেই মন্ত্রীত্ব গঠন সম্ভব হলো না।

সুভাষচন্দ্র তখন দেশের বাইরে। কিন্তু কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠন করার ব্যাপারে চুপচাপ রয়ে গেলেন। হাঁ বা না কিছুই বললেন না। মুক্তি পেয়েছিলেন মার্চে। গ্রীষ্মকালে মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত হওয়ার পরই তিনি তাঁর ধরমবীর নামক একজন বন্ধুর আমন্ত্রণে ডালহৌসির শৈলাবাসে গেলেন। ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত সেখানেই রয়ে গেলেন।

নভেম্বরের প্রথমে গান্ধীজী এলেন কলকাতায়। একদিন শরৎচন্দ্র বসুর উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর মধ্যে। এক সময় গান্ধীজী বললেন, তোমাকে বিপ্লবীদের সংস্রব ছাড়তে হবে।

সুভাষচন্দ্র বললেন, না।

গান্ধীজী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

সুভাষচন্দ্র হাসিমুখে উঠে বললেন, তাহলে ত আপনার সংস্রব সবচেয়ে আগে ত্যাগ করতে হয়।

দুজনেই হাসতে লাগলেন।

গান্ধীজী বললেন, আমি কি বিপ্লবী?

সুভাষচন্দ্র বললেন, সবচেয়ে বেশী আর বিপজ্জনক।

আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন দুজনে।

তারপর ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতা থেকে আবার ইউরোপে। ভারত থেকে সোজা তাঁর প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস অস্ট্রিয়ার বাদগেস্টাইনে।

•

১৯৩৮ সাল শুরু হতেই অস্ট্রিয়া থেকে গেলেন ইংলণ্ডে। জানুয়ারি মাসের প্রথমটা সেখানেই কাটালেন। এবার লণ্ডনে বিরাট সম্বর্ধনা পেলেন সুভাষচন্দ্র। লণ্ডনে মিঃ এ্যাটলী, মিঃ আরনেস্ট বেভিন এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ প্রভৃতি রাজনীতিবিদগণ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। ডরচেস্টারে একটি সম্বর্ধনা সভা হলো।

পরদিন ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান মন্তব্য করল, যেসব ইংরেজ প্রথম তাঁকে দেখল তারা সবাই তাঁর শান্ত মধুর ব্যবহার দেখে ও তাঁর মুখে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনে খুব খুশি হলো।

১৮ই জানুয়ারি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ঘোষণা করলেন, ১৯৩৮ সালের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুভাষচন্দ্র। জাতীয় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের আর দেরি নেই। এবার এ অধিবেশন বসবে গুজরাটের অন্তর্গত তাপ্তী নদীর ধারে হরিপুরায়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর বীঠলভাই প্যাটেলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বীঠলনগর নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে সেখানে।

লণ্ডনে বসেই খবরটা শুনলেন সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেস নিজে থেকে যে গুরুদায়িত্ব তাঁকে দিয়েছে তা পালন করতেই হবে। তাই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে রওনা হলেন। এ বছরের সভাপতি পদের জন্য মোট চারটি নামের প্রস্তাব উঠেছিল। এই চারজন হলেন, সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও খান আবদুল গফফর খাঁ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের

অতুলনীয় ত্যাগ আর কৃতিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত, তিনজন নাম প্রত্যাহার করে নেন। সুতরাং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র।

১৪ই ফেব্রুয়ারি বসল কার্যকরী সমিতির সভা। সুভাষচন্দ্র পৌঁছলেন ১৩ই তারিখে। এর আগে ইংলণ্ড থেকে যেদিন করাচী বিমান বন্দরে নামেন সুভাষচন্দ্র সেদিন দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয় তাঁকে। গান্ধীজী আশীর্বাদ জানান।

১৬ই ফেব্রুয়ারি তখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্য দিয়ে শুরু হলো অধিবেশন। বিদায়ী সভাপতি জওহরলাল সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন সুভাষচন্দ্রকে। প্রকাশ্য অধিবেশন বসবে ১৯শে।

এবার কংগ্রেসের সামনে বিরাট সমস্যা। রাজবন্দী মুক্তির ব্যাপারে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। তাঁরা অন্যান্য প্রদেশের মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন কংগ্রেস নেতাদের উপর। তারপর ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এই আসন্ন মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথাটা নতুনভাবে ভেবে দেখতে হবে কংগ্রেস নেতাদের।

শারীরিক দুর্বলতা সত্বেও কার্যভার গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র। সভাপতির ভাষণে একই সঙ্গে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিলেন।

সভাপতি হওয়ার পরই আসামে ছুটে গেলেন সুভাষচন্দ্র। সেখানে তখন অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সাদুল্লার সাম্প্রদায়িক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে গিয়ে সাদুল্লা মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে এলেন। বাংলা দেশে তখন চলছে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজাদলের মন্ত্রীত্ব। এখানেও ভুল করেছিল

কংগ্রেস। কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করতে রাজী ছিলেন ফজলুল হক। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রাহ্য করেনি সেকথা। যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় দুজন মুসলমান সদস্যকে না নিয়েও ভুল করে কংগ্রেস। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা জওহরলাল তখন রাজনৈতিক দূরদর্শিতার চেয়ে নীরস তত্ত্ব ও যুক্তিকেই বেশী দাম দিয়ে চলতেন।

আসামের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা কয়েকমাস বেশ ভালই চলতে থাকে। কংগ্রেস নেতারা খুশী হলেন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদর্শিতায়। এদিকে ইউরোপে তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ইংলণ্ড যুদ্ধকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু উপায় নেই। যুদ্ধে ইংলণ্ডকে জড়িয়ে পড়তেই হবে।

সুভাষচন্দ্র দেখলেন এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। তিনি প্রকাশ্যে বললেন, জাতির সামনে মহা সুযোগ এগিয়ে আসছে। এর সদ্ব্যবহার করতেই হবে।

গান্ধীজী ভেবেছিলেন সভাপতির পদ পাওয়ার পর অনেকটা নরম হয়ে যাবেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নরম ত হলেনই না; উল্টো বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরও জোরদার করে তোলবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। ফলে মতবিরোধ দেখা দিল গান্ধীজীর সঙ্গে।

দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে গান্ধীবাদ যে বাধা সৃষ্টি করবে একথা আগেই জেনেছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯২৮ সালে কলকাতায় এক যুব সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, এই রকমের একটা অনুভূতি ও মনের ভাব আছে যে, আধুনিকতা খারাপ, বৃহৎ শিল্প উৎপাদন দোষের, চাহিদা বাড়ানো ঠিক নয় এবং জীবনযাত্রার মান বাড়ানোও অন্যায়।···আত্মা জিনিষটা এত দামী যে তার জন্য শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষা তুচ্ছ।

তিনি তখন আরও বলেন, ভারতে মুণিঋষিদের আদর চিরকালই

থাকবে কিন্তু আমরা যদি স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধ নতুন ভারত গড়ে তুলতে চাই তাহলে তাঁদের নির্দেশ আমাদের অনুসরণ করলে চলবে না।···আমাদের বাস করতে হবে আজকের যুগে।

সুভাষচন্দ্র চান দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্যেও তৈরি হতে হবে।

গান্ধীজী বললেন, আগে চাই স্বাধীনতা। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ও সংবিধান রচনা দুদিন পড়ে হলেও চলবে।

সুভাষচন্দ্র বললেন, আমি সমাজতান্ত্রিক ; ভারতের পুনর্গঠনের ব্যাপারটা পুঁজিবাদীদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী নই। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা চাই।

কংগ্রেস সভাপতি হবার পর সুভাষচন্দ্র দেখলেন গান্ধীজীর কাছ থেকে কোন কিছু আশা করা বৃথা। তিনি সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন যেমন চান না, তেমনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রামও চান না। আরও বুঝলেন আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সরকারকে আক্রমণ করার সুযোগও তিনি গ্রহণ করবেন না।

১৯৩৮ সালে কার্যনির্বাহক সমিতির কয়েকটি সভায় এবিষয়ে কথাটা বার বার তোলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু গান্ধী প্রভাবিত নেতারা ঠিক করতে পারলেন না মহাযুদ্ধ বাধলে বৃটিশের প্রতি ভারতের নীতি কি হবে।

গান্ধীজীর দোষগুলি বিশ্লেষণ করে দেখালেন সুভাষচন্দ্র।

গান্ধীজী প্রতিপক্ষকে ঠিকমত বুঝতে পারেন না।

তিনি পরিকল্পনা করে কোন কাজ করেন না।

তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী বলে বৃটিশের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সংগ্রাম আপোষের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃটিশের উপর ভরসা ও বিশ্বাসের অন্ত নেই তাঁর।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে তাকে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন না।

রাজনৈতিক নেতা হওয়ার চেয়ে বিশ্বপ্রেম ও অহিংস নীতির প্রচারক হওয়ার দিকেই ঝোঁক তাঁর বেশী।

সুভাষচন্দ্র আরও দেখলেন নেহেরুর মাধ্যমে গান্ধীজীর বিকল্প নেতৃত্বেরও কোন সম্ভাবনা নেই। নেহেরুর প্রধান দোষ হলো তিনটি—অন্তরের দুর্বলতা, আত্মবিশ্বাস ও বৈপ্লবিক দর্শনের অভাব।

কংগ্রেসের পাল্টা দল হিসাবে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও কমিউনিস্ট দলের যোগ্যতার কথাও একবার ভেবে দেখেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু এই দুটি দলই সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি। সমাজতন্ত্রী দলের কোন বৈপ্লবিক কর্মনীতি ছিল না। কংগ্রেসের ভিতরে থেকে কয়েকটি বিষয়ে ঝগড়া করে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। স্বাধীনতার চেয়ে সমাজবাদের কথাই বেশী বলত তারা।

কমিউনিস্ট দল তখন জাতীয় ফ্রণ্ট নামে কাজ করছিল। শ্রমিক ও ছাত্র দলের উপর কিছু প্রভাব ছিল তাদের। কিন্তু দলটির সদস্যসংখ্যা বেশী ছিল না। তাদের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে দেশের মাটির কোন যোগ ছিল না। তারা রাশিয়ার নির্দেশে চলত। দেশের পরিস্থিতি ও আসল সমস্যার ঠিকমত বিচার করতে পারত না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন অংশ গ্রহণ করত না।

নিজে সভাপতি হয়েও কংগ্রেসের সংগঠনগুলিকে নিজের মনের মত করে পরিচালনা করতে পারছিলেন না সুভাষচন্দ্র। মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে লিখলেন সুভাষচন্দ্র, তুমি আর পণ্ডিচেরী আশ্রমে ফিরে যেও না। দিনরাত আমায় কতকগুলো অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়। তুমি যদি কলকাতায় থাকতে তাহলে জানতাম অন্ততঃ এমন একজন আছে যার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য মনের কথা বলে আসা যায়।

দিলীপকুমার বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে আশ্রমের নির্জন বাসে চলো।

সুভাষচন্দ্র বললেন, তা হয় না। জীবনযুদ্ধে পরাজিত এই বদনাম নিয়ে আমি যোগী হতে পারব না। কিছুদিনের জন্যও নয়। কারণ তাতে মনের মধ্যে যে সংগ্রামের আগুন জ্বলছে সে আগুন নিবিয়ে যাবে, সংগ্রামী মনোভাব ক্ষুণ্ণ হবে।

এই সময় একদিন একটি অটোগ্রাফের খাতায় নিজের মনের কথাটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র, বাঁধা রাস্তার বাইরে আশ্রয়ের সন্ধানে যে অভিযাত্রী জীবন, সেই জীবনই আমায় বেশী করে টানে। সে জীবনে যন্ত্রণা থাকতে পারে, কিন্তু আনন্দও আছে, অন্ধকার প্রহর থাকলেও রাত পোহানো সকালও আছে। আমি আমার দেশবাসীকে ডাকছি এই পথে এসো।

॥ আঠারো ॥

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে প্রথম বছরটা কোনরকমে কাটালেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ১৯৩৯ সালের সভাপতিত্ব নিয়ে। সুভাষচন্দ্রের মত একজন চরমপন্থী নেতাকে কংগ্রেসের গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থীরা কোন মতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। সবচেয়ে গোলযোগ বাধল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিধি সম্পর্কে বৃটিশ প্রস্তাব নিয়ে।

গান্ধীজী আপোষ চান বৃটিশের সঙ্গে এ প্রস্তাব তিনি ও তাঁর অনুগামীরা মেনে নিতে চান। বৃটিশ ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করেছে এতেই তাঁরা খুশি। সুভাষচন্দ্র কিন্তু মোটেই খুশি নন। তিনি স্পষ্ট বললেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিধির

প্রস্তাব যে কোন সংশোধিত আকারেই আসুক না কেন আমি তা মানতে পারব না।

এক বছরের মধ্যেই ভয় পেয়ে গেলেন গান্ধীজী। পরের বছরে সুভাষচন্দ্র যাতে আর সভাপতি না হতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করে যেতে লাগলেন তলায় তলায়। ওয়ার্কিং কমিটির পাঁচ ছয়জন সদস্যও যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে।

কিন্তু মুস্কিল হলো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। তিনি সুভাষের হয়ে গান্ধীজীকে চিঠি দিলেন। জওহরলালকে ডেকে পাঠালেন শান্তিনিকেতনে। গান্ধীজী তার উত্তরে সুভাষ সম্বন্ধে তাঁর আপত্তির কয়েকটি কারণ দেখালেন। প্রথম কারণ, বাংলায় বড় বেশী দুর্নীতি দেখা দিয়েছে এবং সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদের বাইরে না থাকলে কাজ করতে পারবেন না। দ্বিতীয় কারণ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা। গান্ধীজীর ধারণা মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সভাপতি হলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে। তৃতীয় কারণ, সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক পরিকল্পনা যা তাঁর ইউরোপে থাকার সময় তাঁর মাথায় ঢুকেছে এবং যা তাঁর নীতির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না।

গান্ধীজীর আসল রাগ সুভাষচন্দ্রের প্ল্যানিং কমিশনের উপর। শিল্পোন্নতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও সমাজবাদের দিকে বড় বেশী ঝুঁকেছেন সুভাষচন্দ্র। তুচ্ছ হয়ে পড়ছে সেখানে গান্ধীবাদ ও দর্শন।

অথচ যে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে শ্রদ্ধা করতেন গান্ধীজী সেই রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠভাবে মেনে নিলেন সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে। ১৯৩৮ সালে ১৯শে নভেম্বর তিনি জওহরলালকে একখানি চিঠিতে লিখলেন, ভারতের শিল্পোন্নয়নে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সেদিন ডাঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো। আলোচনা খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। আমি এর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। এর দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি ফেরাবার জন্য সুভাষ যে কমিশন গঠন করেছে, জানলাম, তুমি তার সভাপতি হতে

সম্মতি জানিয়েছ। তাই এ সম্বন্ধে তোমার মতামত জানতে ইচ্ছা করছে।

তাঁর একান্ত অনুগত ও ভাবশিষ্য জওহরলালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এ চিঠি ভাল লাগেনি গান্ধীজীর, যেমন ভাল লাগেনি 'রাশিয়ার চিঠি।' গান্ধীজীর মনে হলো, রাজনীতি নিয়ে গুরুদেবের মাথা না ঘামানোই ভাল। রাশিয়াকে এতখানি প্রশংসা করা তাঁর উচিত হয়নি। রাশিয়া না গেলে নাকি একটি তীর্থ পরিক্রমাই বাকি থেকে যেত। হিংসার পথে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদকে প্রতিষ্ঠা কিছুতেই মানতে পারবেন না তিনি। তার চেয়ে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হাতে চালানো গ্রামীণ শিল্পের সাহায্যে ধীরে ধীরে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাই ভাল।

কিন্তু তাঁর এই সমাজবাদের নীতিকে সেকেলে ও অচল বলে উড়িয়ে দেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৮ সালের মে মাসে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলন ডেকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথাটি তুলে ধরেন সুভাষচন্দ্র। বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের শিল্পগঠন, বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস সন্ধান, সম্প্রসারণ ও সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

তিনি আরও বলেন, শিল্পবিপ্লব হয়ত দুর্নীতি ও অশুভ উপসর্গের সৃষ্টি করবে। কিন্তু একে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। এর ত্রুটির দিকটাও ধরে নেবার দায়িত্ব আমাদের। এই বিপ্লবের গতি রাশিয়ার মতই তীব্র করে তুলতে হবে; ইংলণ্ডের মত মন্দায়িত নয়।

জওহরলাল ইউরোপে থাকাকালেই তাঁকে প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি করলেন সুভাষচন্দ্র। জওহরলালও এর গুরুত্ব স্বীকার করে নিলেন। তাঁর 'দি ডিসকভারী অফ ইণ্ডিয়া' বইখানিতে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন তিনি।

এই বছরই আন্দামান থেকে রাজবন্দীদের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা

যায়। বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা নাজিমউদ্দীন জানিয়ে দেন কয়েকটি শর্তে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

খুশি হন সুভাষচন্দ্র। বলেন, মন্দের ভাল, তবু ওরা দেশে ফিরছে। খুশি হন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানান সুভাষচন্দ্রকে। কাছে ডেকে বলেন, সুভাষ আমি বাঙ্গালী কবি, বাংলা দেশের হয়ে আমি তোমাকে দেশ নায়কের পদে বরণ করি।

বছর শেষ হতে না হতেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসল ওয়ার্ধায়। নতুন বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচন করতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা তিনটি নাম প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। সে তিনজন হলেন সুভাষচন্দ্র, মৌলামা আবুলকালাম আজাদ আর পট্টভি সীতারামিয়া।

দুই একদিনের মধ্যে পট্টভি সীতারামিয়ার অনুকূলে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন মৌলানা।

ওয়ার্ধা থেকে সভার কাজ সেরে কলকাতায় ফিরে এসেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। মৌলানা শুধু নিজের নাম প্রত্যাহার করেননি, পট্টভিকে সমর্থন করার জন্য কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

পট্টভির জন্য আবেদন জানালেন ওয়ার্কিং কমিটির আরও ছয়জন সদস্য। তাঁরা হলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়রামদাস দৌলতরাম, শংকররাও দেও ও ভুলাভাই দেশাই।

তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন, পট্টভি সভাপতি পদের সম্পুর্ণ যোগ্য।

সভাপতি সুভাষচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এই জঘন্য ষড়যন্ত্র সত্যি সত্যিই মর্মান্তিক। তবু তাতে কাতর হলেন না সুভাষচন্দ্র। তিনি নির্ভীক ও দৃঢ়সংকল্প। এ নির্বাচন হতে কিছুতেই সরে দাঁড়াবেন না তিনি। আজ তিনি শেষবারের মত দেখতে

চান দুটি পথের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

ওরা অনেক প্রচার করছেন পট্টভির পক্ষে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বিশেষ কিছুই করলেন না। শুধু ছোট একটা বিবৃতি দিলেন খবরের কাগজে। তিনি বললেন,

আগামী বছরে বৃটিশ সরকার আর কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিধির প্রস্তাব নিয়ে একটা বোঝাপড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই একজন বামপন্থীকে সভাপতির পদে নির্বাচিত হতে দেয়া দক্ষিণপন্থীদের অভিপ্রেত নয়। বামপন্থী সভাপতি হলে ওঁদের আলোচনা আর বোঝাপড়ায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে, এই আশঙ্কা জেগেছে ওঁদের মনে।

সভাপতির নির্বাচন হলো ১৯৩৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি। জয়ী হলেন সুভাষচন্দ্র। মোট ভোটসংখ্যার মধ্যে সুভাষচন্দ্র পেলেন ১৫৮০ আর পট্টভি পেলেন ১৩৭৭ অর্থাৎ ২০০ ভোটে জয়লাভ করেছেন সুভাষচন্দ্র।

খবর শুনে গম্ভীরভাবে সুভাষচন্দ্র বললেন, এটা আনন্দোল্লাসের সময় নয়। এটা হচ্ছে আত্মানুসন্ধান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির সময়।

সঙ্গে সঙ্গে মালদহে জেলা সম্মেলনে যোগ দিতে চলে গেলেন।

সুভাষচন্দ্র তখন ছিলেন মালদহে। হঠাৎ একদিন বিকালে খবরের কাগজে গান্ধীজীর একটি বিবৃতি দেখে চমকে উঠলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে দুঃখিত হয়ে গান্ধীজী বলেছেন, 'ডাঃ পট্টভির পরাজয় মানে আমার পরাজয়।...তবু বলব সুভাষ দেশের শত্রু নয়।'

অবাক বিস্ময়ে ও বেদনায় প্রথমে কথা বলতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র। অনেকক্ষণ পর শুধু বললেন, এত অল্পে ওঁর মত মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে, এটা ভাবিনি।

কিছুক্ষণ পর বললেন, মহাত্মাজীকে আমি সমালোচনা করি যতটা, শ্রদ্ধা করি তার চেয়েও বেশী। উনি এতটা নামলেন কি করে ?

গান্ধীজী আরও বলেছেন, আমি অবশ্যই আজ একথা স্বীকার করব যে, প্রথম থেকেই সুভাষের পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমার দৃঢ় অভিমত ছিল। এর কারণ আজ আমি বলতে চাইনে। আমিই ডাঃ পট্টভিকে নির্বাচন ক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়াতে দিইনি। এই কারণেই আমি বলতে বাধ্য যে, এ পরাজয় পট্টভির নয়, এ পরাজয় আমার পরাজয়। নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতি বাদ দিলে আমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আজ একথা স্পষ্ট হলো যে, আমার নীতি ও আদর্শ বেশীর ভাগ কংগ্রেস প্রতিনিধি পছন্দ করেন না। পরাজয়ে তাই আমি খুশি হয়েছি।

ওয়ার্ধা গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন সুভাষচন্দ্র। আলোচনা করে বেশ কিছুটা খুশি হয়ে কলকাতায় ফিরলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনলেন ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা নির্বাচিত সভাপতির সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে পারবেন না। গান্ধীগোষ্ঠির এই বারোজন হলেন, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, ভুলাভাই দেশাই, পট্টভি, হরেকৃষ্ণ মহতাব, আচার্য কৃপালনী, আবদুল গফফর খান, জয়রামদাস দৌলতরাম ও যমুনালাল বাজাজ।

এই বারোজন যে যুক্ত বিবৃতি দিলেন জওহরলাল তাতে সই করলেন না। তিনি ওয়ার্কিং কমিটি হতে পদত্যাগও করলেন না। খবরের কাগজে একটি আলাদা বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রের উপর দোষারোপ করলেন। কমিটিতে থাকবেন অথচ সেই কমিটির সভাপতিকে নিন্দা করবেন, গান্ধীজীকে খুশি করবেন আবার সুভাষচন্দ্রের কাছেও প্রগতিবাদী সাজবেন। এ বিষয়ে সেদিনকার জওহরলালের আচরণের তাৎপর্য অনেকেই বুঝতে পারেননি।

এবার জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসল জব্বলপুরের কাছে ত্রিপুরীতে। বড় মনোরম আর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গা এই ত্রিপুরী। নর্মদা নদীর গা ঘেঁষে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মর্মর পর্বতের পাদদেশে ঘনসবুজ বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে যেন ত্রিপুরী।

মার্চ মাস। সুভাষচন্দ্র তখন ভীষণ অসুস্থ। ডাক্তার নীলরতন সরকার চিকিৎসা করছিলের। তিনি বললেন, এ অবস্থায় যাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র যাবেন। কারও কথা শুনবেন না। অবশেষে ঠিক হলো, মা ও দাদা ডাক্তার সুনীলচন্দ্রও সঙ্গে যাবেন।

অন্যবারকার মত এবারও শুরু হলো কংগ্রেসনগরের পথে সভাপতিকে নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট শোভাযাত্রা। কিন্তু এবার অসুস্থতার জন্য রোগীর গাড়িতে করে যেতে হলো সুভাষচন্দ্রকে। তাঁর পিছনে যেতে লাগল বাহান্নতম অধিবেশনের স্মারকস্বরূপ বাহান্নটি হাতীটানা রথ। সেই রথে সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি। তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অসংখ্য মানুষ।

নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেই সভাপতির ভাষণ লিখলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু নিজে পাঠ করতে পারলেন না। পাঠ করল অন্য একজন। ভাষণে বললেন, আজ স্বরাজের দাবী তোলার সময় হয়েছে। আজ আমাদের এই জাতীয় দাবী উত্থাপন করে বৃটিশ সরকারের কাছে পাঠাতে হবে এক চরমপত্র।...এই চরম আন্তর্জাতিক সংকটের মধ্যে আমাদের শেষ অভিযান শুরু না করলে আর কবে আমরা তা করতে পারব? আমি অচঞ্চল কঠোর বাস্তবপন্থী। বর্তমানে পরিস্থিতির সবটাই আমাদের অনুকূলে। এর পরিপূর্ণ সুযোগ আমাদের নিতে হবে।...আমার গুরু দেশবন্ধুর আশীর্বাদে আর মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হোক, এই আমার আকুল কামনা।

সুভাষচন্দ্র তখন ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া ও প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। একদিকে রোগের আক্রমণ অন্যদিকে গান্ধীবাদী প্রতিপক্ষদের আক্রমণ। প্রতিপক্ষদের অনেকে প্রথমে বললেন, ওটা রোগ নয়। কংগ্রেস কর্মীদের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্য ছলনা করছেন সুভাষচন্দ্র।

পরে ডাক্তারদের বুলেটিন দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। ডাক্তারগণ একবাক্যে বললেন, জব্বলপুরের সদর হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোক। এ অবস্থায় তাঁর শারীরিক বা মানসিক কোন কাজই করা চলবে না।

জওহরলাল এসে অনেক করে বোঝালেন সুভাষচন্দ্রকে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বললেন, আমি এখানে মরব সেও ভাল তবু অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাব না।

গান্ধীজী তখন রাজকোটে অনশন করছেন। জওহরলাল টেলিফোনে সুভাষচন্দ্রের শরীরের অবস্থা তাঁকে জানালেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল।

১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ বসবে সাধারণ অধিবেশন ও প্রকাশ্য সম্মেলন। ঐদিন পন্থের প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হলো।

সবাই ভেবেছিল, সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু তিনি তা করলেন না। দেশ ও জাতির স্বার্থে ঠাণ্ডা মাথায় আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলেন, কাজ করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

গান্ধীবাদীরা বললেন, যাঁরা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে জাহির করেন তাঁরা সমস্ত দায়িত্ব নিজেরাই পালন করে দেখিয়ে দিন কি করতে পারেন। তা না হলে আমাদের ভুলত্রুটির শুধু মুখে সমালোচনা করলেই হবে না।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে গান্ধীজীকে কয়েকটি চিঠি লিখলেন সুভাষচন্দ্র। লিখলেন, আপনি একবার কলকাতায় আসুন। ত্রিপুরী

কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে আমায় সাহায্য করুন।

সুভাষচন্দ্র তখনও ভাবতে থাকেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কংগ্রেসের মধ্যে যে দুটি দল রয়েছে তাদের মিলন সম্ভব।

গান্ধীজী বললেন, তা সম্ভব নয়। কারণ এটা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নয়, এটা আদর্শগত দ্বন্দ্ব। আজ কংগ্রেসের ভালর জন্যই কংগ্রেসের পরিচালনার ভার একটি দলের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত।

১৯৩৯ সালের ৩০শে মার্চ একখানি চিঠিতে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে জানালেন, যাঁরা তোমার নীতিতে বিশ্বাস করেন একমাত্র তাঁদের নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। সভাপতিরূপে তোমায় যদি কাজ করতে হয় তাহলে তোমার হাত পা মুক্ত থাকা উচিত। আমি কারও আত্ম অবদমনের জন্য দায়ী হতে চাই না। তুমি দেশের জন্য যে মত জোরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আছ সেটাকে আমি জোর করে দমিয়ে দিতে চাই না। গান্ধীবাদীদের কথা যদি বলতে চাও, তারা তোমায়ও কোন বিষয়ে বাধা দেবে না। যেখানে পাড়বে তারা তোমায় সাহায্য করবে, আর যে ক্ষেত্রে পারবে না, চুপ করে থাকবে।

সুভাষচন্দ্র তখন ছিলেন মানভূমের জিয়ালগড়ায়। এরপর আরও কতকগুলি চিঠি ও টেলিগ্রাম বিনিময় হয় গান্ধীজীর সঙ্গে। কিন্তু কোন ফল হয় না। গান্ধীজীর সেই এক কথা, তুমি নিজের ইচ্ছামত কমিটি করো।

এর আগে অর্থাৎ ২৮শে মার্চ তারিখে জওহরলালকেও একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন সুভাষচন্দ্র। সাতাশ পাতার এই দীর্ঘ চিঠি এর আগে কাউকে কোনদিন লেখেননি। এই দীর্ঘ চিঠিখানির মধ্যে কয়েকটি কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সুভাষচন্দ্র এক জায়গায় লেখেন, আমার বিরুদ্ধে তোমার একটা অভিযোগ, আমার নাকি দেশীয় বা বৈদেশিক ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট

নীতি নেই। ভুল বা ঠিক যাই হোক, নীতি আমার একটা নিশ্চয়ই আছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমি তা অকুণ্ঠভাবে বলেছি। বৈদেশিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পক্ষে একটিমাত্র করণীয় সমস্যাই রয়েছে বর্তমানে,—বৃটিশের সামনে স্বরাজের দাবীকে উঁচু করে ও স্পষ্ট করে তুলে ধরা। যদি সত্যিই স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামই আমাদের কাম্য হয় এবং যদি সত্যিই মনে করি বর্তমান সময়ে জাতির সামনে একটা সুযোগ দেখা দিয়েছে—আমরা স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে সে কথাটা বলতে পারছি না কেন?

সত্যি কথা বলতে কি দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্বন্ধে তোমার মতামত আমার কাছে একান্তই দুর্বোধ্য। এই সেদিনের কথা, এক বিবৃতিতে তুমি বলে বসলে যে রাজকোট আর জয়পুরের সমস্যা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যাকে ঢেকে ফেলেছে। তোমার মত একজন বিচক্ষণ নেতার মুখে একথা শুনে আমি হতবাক। যে কোন সমস্যা, তা সে যত বড়ই হোক, দেশের মৌল ও প্রধান সমস্যা স্বাধীনতার সমস্যাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে, এ আমার কল্পনারও অতীত।

তোমার বৈদেশিক নীতিও কুয়াশাচ্ছন্ন। বৈদেশিক প্রশ্ন খুবই বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপার। জাতির স্বার্থের দ্বারাই সে প্রশ্ন নিয়ন্ত্রিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখ। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যতই সে কমিউনিজম করুক, বৈদেশিক ব্যাপারে কোন ভাবপ্রবণতাকেই সে প্রশ্রয় দেয় না। তার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের সঙ্গে মিতালি করতেও কুণ্ঠিত হয় না।...এমন কি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্যাক্ট করতেও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

এইবার তোমার বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যাটা শুনতে চাই। বল ত ওর স্বরূপটা কি? সস্তা ভাবপ্রবণতা আর সততার রং ফলানো ভাষায় বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা চলে না। অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের

পক্ষ সমর্থনে সার্থকতা কি বলতে পার? একদিকে তুমি জার্মানী আর ইটালির নিন্দায় পঞ্চমুখ, অন্যদিকে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রশস্তি গাও। বলত, তোমার সত্যিকারের মত কোনটি।

কিছুদিন ধরে তোমাকে এবং মহাত্মা গান্ধী ও আরও অনেককে আমি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছি যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমস্যাকে যাতে ভারতের কল্যাণে কাজে লাগানো যায় আমাদের তা করতেই হবে। চরমপত্রের মাধ্যমে জাতীয় দাবী তুলে ধরতে হবে বৃটিশ সরকারের কাছে। কিন্তু তোমাদের উপর আমি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারিনি, যদিও দেশের বহু লোক আমাকে সমর্থন করতে চায়। সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে বহু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র নিজেদের স্বাক্ষর দিয়ে এক বিবৃতি আমার দাবীর সমর্থনে পাঠিয়েছে।

কমিটির বারো জন সদস্য অকস্মাৎ আর অপ্রত্যাশিতভাবে আমার মুখের উপর পদত্যাগ পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল, এতেও তাদের দোষ তুমি দেখলে না। উল্টো তুমি আমার দোষ দিয়ে বললে, সম্ভবত সভাপতি নিজের ইচ্ছামত প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান, তাই ওয়ার্কিং কমিটির কোন সভা ডাকা হয়নি।

আরও একটা অভিযোগ তুমি এনেছ। সভায় কার্য পরিচালনার ব্যাপারে আমি নাকি পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিনি। অনেকটা এ্যাসেম্বলীর স্পীকারের মত কাজ চালিয়েছি। তুমি সভায় উপস্থিত থাকতে কার সাধ্য সভাপতির কাজ করে যাবে ঠিকমত। ওয়ার্কিং কমিটির সব সময়টা কাটে তোমার একার কথা শুনতে। তোমার মত আর একজন বচনবাগীশ থাকলে আমাদের সব কাজের শেষ হতে আর বেশীদিন লাগত না। তাছাড়া সভাপতির যে কাজ তুমি সর্বদাই সেটা জবর দখল করে বসে থাকতে চাও। বাধা দিতে আমি পারতাম কিন্তু তাহলে ঝগড়া করতে হত। মাঝে মাঝে তোমার আচরণ বকাটে ছেলের মত হয়ে উঠত। কিন্তু তোমার স্বাভাবিক চঞ্চলতা আর উচ্ছলতার ফল কি হয়েছে? ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বকতে

বকতে শেষকালে তুমি ঝিমিয়ে পড়তে। সর্দার প্যাটেলরা কি করে তোমাকে চালাতে হয় তা জানতেন। তাঁরা তোমায় বাধা দিতেন না। সমানে কথা বলতে দিতেন তোমায়। তারপর সময় বুঝে তাঁদের প্রস্তাবের খসড়া করার ভার দিতেন তোমার উপর। এতে তোমার আনন্দের সীমা থাকত না। তুমি আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবের খসড়া করতে লেগে যেতে। সে খসড়ার মধ্যে তোমার বক্তব্য শেষ পর্যন্ত থাকত না। তবু তুমি তাতেই খুশি হতে।

তারপর বাংলাদেশ। আমার বিশ্বাস বাংলা সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই। দুবছর তুমি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলে। এই দুবছরের মধ্যে একটিবারের জন্যও বাংলায় আসার অবকাশ তোমার হয়নি। আর সব প্রদেশের চেয়ে বাংলায় আসা এবং বাংলার সমস্যার দিকে তোমার নজর দেয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কী ভয়ানক অত্যাচারের ঝড় বয়ে গেছে এই প্রদেশের বুকের উপর দিয়ে। হক্ মন্ত্রীত্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এ প্রদেশে কি ঘটেছে তা জানবার চেষ্টা করেছ তুমি?

তুমি কি বুঝতে পার না যে পন্থের মূল প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মাজীকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়া।...বুড়ো পাণ্ডাদের যদি সত্যি সত্যিই আমার সঙ্গে লড়াই করার ইচ্ছা ছিল, সোজাসুজি তা করল না কেন? মহাত্মাজীকে এর মধ্যে টেনে নামালো কেন? তাদের অনুসৃত পথে প্রতারণার চালাকি আছে; কিন্তু সত্য ও অহিংসার সঙ্গে ওটা খাপ খাবে কিনা ভাববার বিষয়।

আমার পুনর্নির্বাচনের সময় সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন যে, দেশের স্বার্থের পক্ষে এ নির্বাচন হবে ক্ষতিকর। এ সম্পর্কে তোমার মতামত আমি জানতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি কোন কথা বলনি।

এইবার তোমার নিজের কথা বলবার জন্য তোমায় অনুরোধ করব। স্পষ্ট করে বলত তুমি কি? ধোঁয়া নয়, ভাসা-ভাসা নয়; স্পষ্ট করে সোজা কথায় বলো, তুমি কি সোস্যালিস্ট?

তুমি কি বামপন্থী ?

তুমি কি মধ্যপন্থী ?

তুমি কি গান্ধীপন্থী ?

তুমি এ সব ছাড়া অন্য কিছু ?

সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে এই দীর্ঘ চিঠিখানি লেখেন মানভূমের জিয়লগড়া থেকে। চিঠিখানি ডাকে পাঠান ৩রা মার্চ। উত্তর এসে যায় এক সপ্তাহের মধ্যেই। জওহরলাল লিখলেন, আমার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছ তুমি। এ বিষয়ে ত্রুটি সত্যিই আমার আছে তাও বুঝতে পারছি। তোমার কথার সত্যতা আমি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করি। মূল্যও দিই যথেষ্ট। তোমার কাছে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞও কম নই। ব্যক্তিগতভাবে পূর্বে এবং এখনও তোমার উপর স্নেহ ও শ্রদ্ধা অপরিসীম, যদিও তুমি যে সব কাজ করো এবং যে ভাবে করো, তার সঙ্গে আমার মতভেদ রয়েছে। আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে কিছুটা পার্থক্য। জীবন সমস্যা আর জীবন দর্শনও সম্ভবত এক নয়।

জওহরলাল নিজে যখন সভাপতি ছিলেন তখন ওয়ার্কিং কমিটির প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে তাঁরও মতভেদ দেখা দিত, সংকট দেখা দিত মাঝে মাঝে একথা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন জওহরলাল। পরে লিখেছেন, কিন্তু আমি দেখলাম, এইভাবে ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তোমার ও আমার পক্ষে উচিত হবে না দেশের স্বার্থে···তাছাড়া এই ধরনের একটা আকস্মিক অবস্থার সামনে দাঁড়াবার মত আমার মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না।

কিন্তু পন্থ-প্রস্তাবের আসল অর্থ ও তাৎপর্যটি কি তা ব্যাখ্যা করলেন না জওহরলাল। গান্ধীজীর মত তিনিও এড়িয়ে গেলেন এ বিষয়ে। এই সময় একের পর এক সবশুদ্ধ উনপঞ্চাশ খানা চিঠি গান্ধীজীকে লেখেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু এর উত্তরে একবারও

গান্ধীজী তাঁর মনের আসল কথাটি খুলে বললেন না। সহযোগিতার আশ্বাসও দিলেন না।

একবার কলকাতায় তাঁর কাছে এসে দেখা ও আলোচনা করার জন্য গান্ধীজীকে অনেক অনুরোধ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু গান্ধীজী সে অনুরোধ রাখেননি।

তারপর জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসল যখন কলকাতায় তখন গান্ধীজী এসে উঠলেন সোদপুরে। জওহরলাল এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন শরৎচন্দ্র বসুর।

অনেকে ভাবল কলকাতা অধিবেশনে সব মতবিরোধের অবসান হবে। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর অনেক দেশই ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এই বিরোধ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল।

অধিবেশনের আয়োজন করা হলো প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসের কাছে ওয়েলিংটন পার্কে। সুভাষচন্দ্র জামাডোবা থেকে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলেন অধিবেশনে যোগদান করার জন্য। এক বিপুল সম্বর্ধনার অপরিমিত উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল সারা কলকাতা শহর। হাওড়া স্টেশন পরিণত হলো লোকারণ্যে।

একখানি খোলা গাড়িতে করে সুভাষচন্দ্র কোনরকমে কলেজ স্ট্রীট হয়ে ওয়েলিংটনে গিয়ে পৌঁছলেন। ফুলের মালা আর তোড়ায় তাঁর কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল।

একজন সহকর্মী গাড়িতে পাশে বসে ছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, এ ফুল নয়, রাষ্ট্রপতির বোঝা।

সুভাষচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, এ বোঝা হালকা হবার দেরি নেই।

পদত্যাগ করার সংকল্প আগে থেকেই করে ফেলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। প্রদেশ কংগ্রেসের অফিসে বসে একটি সাদা কাগজে কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তাফা দেবার জন্য পদত্যাগ রচনা করলেন সুভাষচন্দ্র। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন সভামঞ্চের দিকে।

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আপোষহীন কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে পদত্যাগপত্রটি পাঠ করতে লাগলেন।

প্রথমে ত্রিপুরী কংগ্রেসে গৃহীত পন্থ-প্রস্তাবটি পড়ে শোনালেন। তারপর শুরু করলেন নিজের কথা। বললেন,

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর আজ পর্যন্ত নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু এটা ঘটেছে এমন একটা পারিপার্শ্বিকতার চাপে যাতে আমার কোন হাত ছিল না।

এরপর উল্লেখ করলেন, পন্থ-প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ও আলোচনা আর তার ব্যর্থতার কথা। তারপর বললেন, সমিতির সামনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানকল্পে আমি কি এবং কতটা করতে পারি তা নিয়ে আমি আগে হতেই গভীরভাবে ভেবে আসছি। বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে সভাপতির পদ আঁকড়ে থাকা রাষ্ট্রীয় সমিতির চলার পথে বাধা বা বিপত্তি বলে মনে হতে পারে। সমিতি এমন কমিটি গঠন করতে উন্মুখ হয়ে উঠতে পারেন যাতে আমার অবস্থিতি হবে একান্তই অবাঞ্ছিত। অন্য কাউকে সভাপতি করলে হয়ত সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে, একথাও আমার মনে জেগেছে। বিশেষ চিন্তার পর তাই একান্ত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমার পদত্যাগপত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করলাম। শেষকালে বললেন, বন্ধুগণ, এইবার সমিতির কাজ চালানোর জন্য একজন সভাপতি নির্বাচন করতে আমি আপনাদের অনুরোধ করব।

অধিবেশন থেকে বেরিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্র। সভার কাজ তখনও চলতে লাগল। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিহারের ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

সুভাষচন্দ্র তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে বউবাজারে একটি বাড়িতে গিয়ে উঠলেন, তাঁর নেতৃত্বে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি

নতুন দল প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯৩৯ সালের ২২শে জুন তারিখে। বউবাজারের প্রথম অধিবেশনের পর দলের অধিবেশন বসেছিল ব্রডওয়ে হোটেলে। সর্দার শার্দুল সিং আর নানা শঙ্করলাল থাকতেন ঐ হোটেলে। তাঁদের ঘরেই বৈঠক বসে।

প্রথমেই সম্পূর্ণ নতুন একটি দল গড়তে চাননি সুভাষচন্দ্র। চেয়েছিলেন দেশের বাম ঘেঁষা দলগুলিকে সংহত করে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে। এ বিষয়ে তখনকার দিনের সোস্যালিস্ট দল, কমিউনিস্ট দল ও মানবেন্দ্র রায়ের দল আশ্বাস দেন তাঁকে।

জুলাই মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বোম্বাই অধিবেশনে দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। একটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া যে কোন সত্যাগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যটিতে বলা হয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধাচরণ বা সমালোচনা করতে পারবে না।

এই প্রস্তাব দুটি মানতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র। তিনি বললেন, এতে করে কংগ্রেস সংগঠন নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়বে আর কংগ্রেস সংগঠনের উপর প্রাদেশিক মন্ত্রীদের প্রভাব বেশী পড়বে।

তাই এই দুটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ সভা করতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর কাজে রেগে গিয়ে নতুন কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় একটি প্রস্তাব পাশ করে সুভাষচন্দ্রকে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ও কংগ্রেসের যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে তিন বছরের জন্য বরখাস্ত করলেন।

কিন্তু বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি মানল না এ নির্দেশ। কমিটি সুভাষচন্দ্রকেই বহাল রাখল। এজন্য কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি গোটা বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকেই বাতিল করে দিল।

এবার কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র।

তিনি বলতে লাগলেন, কংগ্রেসের মধ্যে চলছে জঘন্য একনায়কতন্ত্র। হিটলারী ব্যবস্থার সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই।

জাতীয় কংগ্রেসের অসংগত প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে ৯ই জুলাই সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। দেশের অগণিত মানুষ যোগ দিয়েছিল সে প্রতিবাদে। এর জন্য সুভাষচন্দ্রকে শুধু কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে সরানোই হলো না ১৮ই জুলাই এক পত্রে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সভাপতির পদ ছাড়লেও সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছিল দিনে দিনে। এতে সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন কংগ্রেস নেতারা। গান্ধীজী নিজেই একবার মন্তব্য করেছিলেন, সুভাষের জনপ্রিয়তা সভাপতির পদ ত্যাগ করার পর অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের চিঠিখানির উত্তর দেন সুভাষচন্দ্র ৭ই আগস্ট তারিখে। তিনি লিখলেন,

রাঁচি থেকে লেখা আপনার ১৮ই জুলাই এর এ চিঠির উত্তর দিতে দেরি হলো বলে আমি খুবই দুঃখিত। বোম্বাইএর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদে আমি যা করেছি তার কৈফিয়ৎ তলব করেছেন আমার কাছে।

প্রথমেই বলি, কোন প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানানো এবং ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ বা প্রস্তাববিরুদ্ধ কোন কাজ করার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। কিন্তু প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমার মনোভাব জানানো ছাড়া আর কিছুই আমি করিনি।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির গ্রহণ করা কোন প্রস্তাব সম্পর্কে আমার মনোভাব জানানোর আইনসঙ্গত অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি। প্রতিটি অধিবেশন শেষ হবার পর বহু কংগ্রেস সদস্যই চিরদিন অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রকাশ্যে জানিয়ে আসছেন। কংগ্রেস সদস্যদের এ

অধিকার যদি স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে পরে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হবে আইনবিরুদ্ধ, এ কথা বলা সঙ্গত হবে কি? আপনার চিঠি পড়ে আমার এই কথাই মনে হলো যে, বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করাই আপনি বন্ধ করতে চান।

এতদিন আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সব অধিকার আদায় করবার জন্য লড়াই করে এসেছি তাদের মধ্যে নাগরিক অধিকার অন্যতম। বাক্যের স্বাধীনতা এই নাগরিক অধিকারের অন্যতম। কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠদের কথা বা কাজের সমর্থন করতে না পারলে আমাদের সংখ্যালঘুদের বাক্যের এই মৌল অধিকার বা স্বাধীনতার দাবী করার কোন উপায় থাকবে না—আপনার বক্তব্য হতে সেই কথাই মনে হয়।

ইংরেজের কাছ থেকে যে অধিকার জোরের সঙ্গে আমরা দাবী করি, কংগ্রেস বা তার অন্তর্গত কোন সংস্থার কাছ থেকে সে অধিকার পাবার কথা বলা অন্যায় হবে কেন? দেশের পক্ষে অকল্যাণকর বলে যদি রাষ্ট্রীর সমিতির কোন প্রস্তাবের আমরা সমালোচনা করি আর সেই অধিকার থেকে আমাদের যদি বঞ্চিত করা হয় তাহলে তার পরেও কি ডেমোক্র্যাসী অক্ষুণ্ণ থাকবে? আমি আপনাকে গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, গণতন্ত্রের দাবী চিরদিনই কি আমরা উত্থাপন করব কংগ্রেসের বাইরে—ভিতরে নয়?

রাষ্ট্রীয় সমিতি যদি কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে সে প্রস্তাব সমালোচিত, সংশোধিত, পরিবর্তিত, এমন কি পরিত্যক্তও হতে পারে। আর তা করবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের সমিতির সদস্যদের আছে। আমার বিশ্বাস আমার কথার সঙ্গে আপনি একমত হবেন। আমার এ কথার সঙ্গেও সম্ভবত আপনি একমত হবেন যে রাষ্ট্রীয় সমিতির কোন সিদ্ধান্ত যদি আমাদের মনঃপূত না হয়, তাহলে মূল প্রতিষ্ঠান ভারতীয় কংগ্রেসের

প্রকাশ্য অধিবেশনে ঐ সিদ্ধান্ত নাকচ বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করার অধিকারও আছে আমাদের।

শৃঙ্খলা শব্দটির যে ব্যাখ্যা আপনারা করে থাকেন, আমি তা মানতে পারি না। নিজেকে একজন কঠোর নিয়মানুবর্তী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ বলে মনে করা সত্ত্বেও একথা আমি নিশ্চয়ই বলব যে শৃঙ্খলার নামে আপনারা সুস্থ সমালোচনার গতিরোধ করতে চান। শৃঙ্খলা কোন মানুষকে তার স্বাভাবিক ও মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না।

এই প্রসঙ্গে ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসের সময়কার এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না। সেই সময় স্বরাজ্য দল যা করেছিল তা ভুলে না যেতে আমি আপনাকে অনুরোধ করব। একথাও দয়া করে ভুলবেন না যে গয়া কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব সংশোধিত হয়ে গৃহীত হয় পরবর্তী রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে। আর গুজরাট প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সে প্রস্তাব উপেক্ষা করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

—

আগস্ট পার হয়ে সেপ্টেম্বর আসে। যুদ্ধের আশঙ্কায় ঘন কালো হয়ে ওঠে ইউরোপের আকাশ। সুভাষচন্দ্র তখন দক্ষিণ ভারতে। নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রচারকার্য করে বেড়াচ্ছেন অনলস ও অক্লান্তভাবে।

সেদিন ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে একটি বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন সুভাষচন্দ্র। প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছে। সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনছে সুভাষচন্দ্রের বাণী। এত বড় জনসমাবেশে এর আগে কখনও বক্তৃতা দেননি সুভাষচন্দ্র।

সহসা সভামঞ্চের উপর কে একজন একটি সান্ধ্য পত্রিকা সুভাষচন্দ্রের হাতে এগিয়ে দিল। সুভাষচন্দ্র দেখলেন ইউরোপে

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। সেইদিনই বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জার্মানীর বিরুদ্ধে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গে চলে গেলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি জানতেন এ যুদ্ধ হবেই। এ যুদ্ধে বৃটেন জড়িয়ে পড়বেই। তাই ত্রিপুরী কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ছয় মাসের জন্য বৃটেনকে চরমপত্র দেবার জন্য। তিনি বলেছিলেন, বৃটেনের পক্ষে যেটা মহাসংকট, ভারতের পক্ষে সেটাই হবে মহা সুযোগ। কিন্তু কংগ্রেস শোনেনি সেকথা।

৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী দেখা করলেন বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে। তারপর খবরের কাগজে এক বিবৃতি দিয়ে বললেন, বৃটেনের সঙ্গে ভারতের মতপার্থক্য সত্ত্বেও বৃটেনের এই বিপদের দিনে তার সঙ্গে ভারতের সহযোগিতা করে চলা উচিত।

গান্ধীজীর এই বিবৃতির পর গান্ধীবাদীরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগলেন, যদিও তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা চান তথাপি তাঁরা এটাও চান যে বৃটেন এ যুদ্ধে জয়লাভ করুক।

৩রা সেপ্টেম্বর তারিখেই বড়লাট ভারতকে যুদ্ধদেশ বলে ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতর যে কোন বিশৃঙ্খলাকে দমন করবার জন্য এক জরুরী আইন জারি করেন। ১১ই তারিখে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিধি স্থগিত রাখেন আর এক ঘোষণার মাধ্যমে।

আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। আশ্চর্য হয়ে গেল দেশের মানুষ। কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করেই বৃটিশ ভারতকে যুদ্ধদেশ বলে ঘোষণা করল। অথচ তার কোন প্রতিবাদ করলেন না কংগ্রেস নেতারা। উল্টো গান্ধীজী বড়লাটের কাছে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে এলেন বৃটেনের প্রতি।

ফরওয়ার্ড ব্লক তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে বেড়াতে লাগল কংগ্রেসের এই নীতির। দেশবাসীকে জানিয়ে দিল, কংগ্রেস ১৯২৭ সাল থেকে বলে আসছে ইংলণ্ড দ্বিতীয় বার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ভারত আর সহযোগিতা করবে না। প্রথম মহাযুদ্ধে

বৃটেনকে সাহায্য করে যে ফল পেয়েছিল সে কথা ভোলেনি ভারত, ভুলবে না কোনদিন। পেয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড আর রাওলাট আইনের অকথিত অত্যাচার।

কিন্তু কংগ্রেস সেকথা ভুলে গেছে। ভুলে গেছে দেশবাসীর প্রতি তার কর্তব্যের কথা। আজ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে কংগ্রেস। আজ দেশের স্বাধীনতার চেয়ে বৃটেনের যুদ্ধজয়টাই বড় হয়ে উঠল তার কাছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক অকুণ্ঠ ভাষায় বলে বেড়াতে লাগল, যুদ্ধে বৃটিশ পরাজিত না হলে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন না হয়ে পড়লে ভারতের স্বাধীনতা পাবার কোন আশা নেই।

৮ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসল ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর ঘরে। গান্ধীজীর আমন্ত্রণে সে অধিবেশনে যোগ দিতে গেলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি তখন কংগ্রেসের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন না। তবু তাঁকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানান গান্ধীজী। এই অধিবেশনটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইউরোপের যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি কি হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই অধিবেশনেই নেবে ওয়ার্কিং কমিটি।

সুভাষচন্দ্র বললেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার এই হলো উপযুক্ত সময়। এ সুযোগ আর মিলবে না।

তিনি আরও বললেন, এ বিষয়ে কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদ যদি কোন ব্যবস্থা না নেয় তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লক দেশের স্বার্থের জন্য যা ভাল বোঝে করবে।

সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন গান্ধীজী। আশ্রমে চায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ সুভাষচন্দ্র চা খেতে ভালবাসতেন, গান্ধীজী তা জানতেন বলে সুভাষচন্দ্রের জন্য বিশেষভাবে ঘন ঘন চায়ের ব্যবস্থা হয়।

এর আগে ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশনে কংগ্রেস থেকে

নির্বাসিত করা হয় সুভাষচন্দ্রকে সে অধিবেশনে গান্ধীজী ছিলেন না। তিনি তখন ছিলেন সীমান্ত প্রদেশে। অনেকে মনে করেন, সুভাষচন্দ্রের প্রতি দণ্ডাদেশে সায় ছিল না গান্ধীজীর। অবশ্য তার জন্য কোন প্রতিবাদও করেননি তিনি।

যাই হোক, এবার কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সব কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনলেন গান্ধীজী। সুভাষচন্দ্রকে একথা একবারও ভাবতে দিলেন না যে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নন। গান্ধীজী বেশ বুঝতে পারলেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রভাব সারা দেশে তখন ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের বৃটিশবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী প্রচারে জনগণ জেগে উঠেছে। সুতরাং এখন উড়িয়ে দিতে পারা যায় না সুভাষচন্দ্রের কথাগুলোকে।

অবশেষে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক প্রস্তাব গৃহীত হলো ওয়ার্কিং কমিটিতে। কয়েকটি বিশেষ শর্তে বৃটিশকে যুদ্ধে সহযোগিতা করার কথা বলা হলো। বলা হলো, বৃটিশ কেন যুদ্ধ করছে, তার লক্ষ্য কি তা পরিস্কার করে খুলে বলতে হবে। আরও বলা হয় ভারতকে যদি স্বাধীনতা দেয়া হয় তবেই স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে গণতন্ত্রের উপর যে কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

ওয়ার্ধা থেকে বাংলায় ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র বললেন, গান্ধীজীর উপর রাগ যে আমার হয় না, তা নয়। হয় ; কিন্তু সে রাগ আমি বেশীদিন পুষে রাখতে পারি না। হাসি আর স্নেহ দিয়ে মুহূর্তে আমায় ভুলিয়ে ফেললেন।

কিন্তু গান্ধীজীর উপর রাগ করার তাঁর খুব বেশী প্রয়োজনও ছিল না। কারণ ওয়ার্ধার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাঁর অনেকখানি জয় হয়েছে। সুভাষচন্দ্রেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে জওহরলাল সে অধিবেশনে বৃটিশের প্রতি শর্তাধীন সহযোগিতার প্রস্তাব আনেন। আর তা সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়ে

যায়। গান্ধীজীর নিঃশর্ত প্রস্তাব তার ঘনিষ্ঠ অনুগামীরাও সমর্থন করেননি।

গান্ধীজী দুঃখ করে বলেছিলেন, আমার বন্ধুদের অহিংসার উপর বিশ্বাস নেই। আমার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সুভাষচন্দ্র দেখলেন, কংগ্রেস নেতারা এই প্রথম স্বতন্ত্রভাবে একটু ভাবতে চেষ্টা করছেন। এতদিন গান্ধীবাদের প্রভাবে তাঁদের যে স্বাধীন চিন্তা আচ্ছন্ন ছিল আজ তা মুক্ত হতে পেরেছে কিছুটা।

তবে জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের বৃটিশবিরোধী যুদ্ধবিরোধী নীতিটিকেও মানতে পারলেন না। অথচ ১৯২৭ সাল থেকে তিনিই উদ্যোগী হয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবের খসড়া করেছেন। বৃটিশকে শর্তাধীন সহযোগিতা দানের খসড়া করলেও তিনি বললেন,

There were some people, of course, who thought that England's difficulty and peril were India's opportunity. But the leaders of the congress were definitely opposed to any such advantage being taken of a sitution full of diastrous foreboding for England and declared so publicly.

তিনি কংগ্রেস নেতাদের সকলের হয়ে বললেন, কংগ্রেস নেতারা কখনই ইংলণ্ডের এই ঘোর দুর্দিনের সুযোগ নেবে না। জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতেও তাঁর অকুণ্ঠ বৃটিশ প্রীতির পরিচয় দিয়ে বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি ইংলণ্ডের কাছে আমার মানসিকতার জন্য এত বেশী ঋণী যে ইংরেজকে পর ভাবা আমার পক্ষে সত্যিই বেশ একটু কষ্টকর।

এমন কি তিনি যে ইংরেজের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিরোধিতা করেছেন স্বাধীনতার ব্যাপারে সেটাও ঘটেছে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।

১৮ই অক্টোবর বড়লাট জবাব দেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের। শ্বেতপত্ররূপে এই বিবৃতিটি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। বড়লাট সরকার ও ভারতের কিছু প্রতিনিধি নিয়ে একটি আলোচনা সমিতি গড়ে তুলতে চান। এই সমিতির সভ্যরা যুদ্ধ বিষয়ে বড়লাটকে পরামর্শ দেবেন। এই সঙ্গে ভবিষ্যতে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেবার কথাও ঘোষণা করলেন বড়লাট। দশ বছর আগে লর্ড আরউইন একদিন এই ঘোষণাই করেছিলেন।

ঐ ঘোষণা মনঃপূত হলো না ভারতের জনগণের। বৃটিশের কারসাজি বুঝতে আর বাকি রইল না তাদের। একদিকে বৃটিশ ও মিত্রশক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে বলে চেঁচাচ্ছে। অন্যদিকে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বন্ধ রেখে সব শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছে বড়লাটের হাতে। ভারতে সভা সমিতি ও মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিনা বিচারে আটক রাখার জরুরী আইনও জারি হয়।

সুভাষচন্দ্রের মতে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা যদি বৃটিশ বিরোধী নীতি অবলম্বন করতেন এবং এই নীতির প্রচার করতেন সারা দেশে তাহলে ভারতে বৃটিশের অস্ত্র কারখানাগুলির উৎপাদন অনেক ব্যাহত হত, তাহলে ভারতীয় সৈন্যদেরও যেখানে সেখানে পাঠাতে পারত না বৃটিশ সরকার।

কংগ্রেস কোন প্রচারই করল না। তাদের প্রকৃত নীতি কি তা পরিস্কার করে বলল না। বৃটিশকে সহযোগিতা করার জন্য যে সব শর্ত দিল তার একটাও পালন করল না বৃটিশ সরকার, অথচ তার কোন প্রতিবাদ করল না কংগ্রেস।

২৯শে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আবার এক প্রস্তাব পাস করল। তাতে আইন অমান্য আন্দোলনের ভয় দেখানো হলো সরকারকে। তাছাড়া আটটি প্রদেশের সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রীদের

পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হলো। তার আগেই বড়লাট সমস্ত প্রাদেশিক্ সরকারগুলিকে বৃটিশের যুদ্ধনীতি কার্যে রূপায়িত করে তোলার জন্য হুকুমনামা পাঠিয়েছেন। কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ না করলে সে হুকুম তামিল করতে হয়।

ভারতের কিছু লোককে হাত করবার জন্য এই সময় বৃটিশ সরকার ভারতে দুজন উদারপন্থী ইংরেজকে পাঠাল। একজন হলেন লেখক এডওয়ার্ড টমসন আর একজন হলেন রাজনীতিবিদ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্। তাঁরা ভারতে আসেন ডিসেম্বর মাসে। সারা ভারত ঘুরে বৃটিশের হয়ে প্রচার করে বেড়ান।

টমসন ও ক্রিপস্ দুজনেই জওহরলালের বন্ধু। কলকাতা এসে তাঁরা দেখা করতে চাইলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। প্রথমে দেখা করতে চাননি সুভাষচন্দ্র। অবশেষে তিন চার দিন পর দেখা করেন।

একজন সহকর্মীকে এর কারণ সম্বন্ধে বললেন সুভাষচন্দ্র, উনি এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ, ওঁর সঙ্গে কথা বলে কৃতার্থ হব না, এটা ওঁকে বুঝিয়ে দিলুম।

এর আগে অক্টোবরে নাগপুরে ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে এক বিরাট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সব দিক দিয়ে সফল হয়ে ওঠে এ সম্মেলন।

আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র, অসংখ্য ভারতীয় সৈন্য ও ভারত হতে বিপুল অর্থ ও যুদ্ধসম্ভার বৃটিশ সরকার পাঠাচ্ছে দেশ দেশান্তরে। অথচ একজন ভারতীয়ও তার প্রতিবাদ করছে না। যে বৃটিশ গণতন্ত্রের কথা খুব বেশী করে বলে, সেই বৃটিশ চীন, ভারত, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করেছে।

মিশরের একজন প্রতিনিধি ভারতে এসে জওহরলালকে একদিন সরাসরি বলেন, তোমরা শুধু নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়েই খুশি

হওনি, অন্যান্য অনেক দেশকে পরাধীন করার কাজে ইংরেজকে তোমরা সাহায্য করেছ।

পরাধীন ভারতবর্ষের সাহায্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্য, মিশর, সিঙ্গাপুর, চীন, ব্রহ্মদেশ ও আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছে।

বছর শেষ হয়ে আসে। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লক সারা দেশে ঘুরে জনমত গঠন করে বেড়াতে থাকেন। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ক্রমাগত প্রচার কার্য করে বেড়িয়েছেন সুভাষচন্দ্র।

এই সুভাষচন্দ্রকেই ভয় সবচেয়ে বেশী। চিন্তিত হয়ে পড়েন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো। কয়েকজন বাছা বাছা নেতাকে মন্ত্রণার জন্য ডাকেন। গান্ধীজী, জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্যাটেল। সুভাষচন্দ্রকেও আমন্ত্রণ জানালেন। এক সঙ্গে নয়, দেখা হলো একে একে।

প্রথমে দেখা করলেন গান্ধীজী। তারপর জওহরলাল। তারপর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্যাটেল। অবশেষে সুভাষচন্দ্র। আর সবচেয়ে বৃটিশ বিরোধী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেই খুশি হন সব চেয়ে বেশী।

নিজের মুখে স্বীকার করেন বড়লাট, এই একটিমাত্র ভারতীয় নেতার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতামত আমি লক্ষ্য করলাম। বোস কথা বলেন কম; কিন্তু যেটুকু বলেন যথাযথ। গান্ধী বড় বেশী হেঁয়ালিতে ভরা। জওহরলাল বড় বেশী কথা বলেন। বাদবাকি অচল। তবে Bose is conceited.

একমাত্র দাম্ভিকতা আর স্বল্পভাষিতা ছাড়া সেদিন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে অন্য কোন দোষ খুঁজে পাননি বড়লাট।

এই সময় এলাহাবাদে আনন্দ ভবনে একজন ফরাসী মহিলা জওহরলালের অতিথি হয়ে আসেন। তিনি হলেন নামকরা বৈজ্ঞানিক

মাদাম কুরীর মেয়ে মিস ঈভ কুরী। তিনি আনন্দ ভবনে দিনকতক থেকে ও জওহরলালের সঙ্গে মেলামেশা করে জওহরলাল সম্বন্ধে একটি সুন্দর মন্তব্য করেন ঃ

After he had cursed Britain for hours and hours the fact remained that Nehru did belong to the same universe of English men whom I had seen fighting in the British isles and on every continent. This individualist, this fanatic cover of western civilization, this independent thinker could not conceivably live in a world other than the one than Britain with all her faults and the other united nation with all their faults would erect after their hard won victory.

জওহরলাল যেন ইংরেজদেরই একজন। যুদ্ধোত্তর জগতে ইংরেজ ও মিত্রশক্তিরা মিলে যে রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলবে তার বাইরে থাকার কল্পনাও করতে পারবেন না পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্ধ ভক্ত জওহরলাল।

॥ উনিশ ॥

বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে কলকাতায় এসে দেখলেন সুভাষচন্দ্র, জরুরী অবস্থার নাম করে সেখানে সরকারী অত্যাচার চলছে অবাধে। বাংলার এ্যাড হক কংগ্রেস কমিটি একটা কথাও বলেনি তার প্রতিবাদে। একটা সভাও করেনি।

বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির আদেশ অমান্য করে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচন করায় হাই কম্যাণ্ড প্রদেশ

কংগ্রেস কমিটি বাতিল করে দিয়ে কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে এ্যাড হক কমিটি গঠন করেছে।

কলকাতায় পা দিয়েই এক জনসভার আয়োজন করলেন সুভাষচন্দ্র। সব খবরের কাগজে খবর বেরোল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা হবে। সেখানে বর্তমান সমস্যার আলোচনা হবে। বক্তা ও আহ্বায়ক সুভাষচন্দ্র বসু।

সহকর্মীদের অনেকে ভয় পেলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র হেসে তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় নেই, ইংরেজরা এখনি আমায় গ্রেপ্তার করবে না।

কিন্তু কেন ?

সুভাষচন্দ্র বললেন, তার ফলে কংগ্রেসের ভিতরকার বিবাদ যদি মিটে যায় এবং যদি ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস রুখে দাঁড়ায় সরকারের বিরুদ্ধে এই ভয়ে।

পরদিন দুপুর হতেই দেখা গেল শ্রদ্ধানন্দ পার্কের চারিদিকে পুলিশ। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক সুভাষচন্দ্রের চারিদিকে চক্রব্যূহ রচনা করল। তারা প্রাণ থাকতে তাদের নেতাকে ধরতে দেবে না। সেই চক্রের মাঝখানে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রইলেন। এমন সময় মেজবৌদি শ্রীমতী বিভাবতী বসু এগিয়ে এলেন কয়েকজন মহিলা নিয়ে। তাঁরা সুভাষচন্দ্রের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালেন।

সভার প্রধান বক্তা সুভাষচন্দ্র অনেকক্ষণ ধরে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করলেন। অবশেষে বললেন,

সুভাষ বোস একা হোন, নগন্য হোন, দুর্বল হোন, ফরওয়ার্ড ব্লক তুচ্ছ হোক তাতে ক্ষতি নেই। হয়ত সংগ্রামে সুভাষ বোস জয়ী হতে পারবেন না, দুর্বার মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় পিষে, গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন, তবু তাঁর এই পরম সান্ত্বনা থাকবে যে, দেশ ও জাতির শত্রুকে তিনি ক্ষমা করেননি। মুক্তির

আসন্ন মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি বিজৃম্ভণে কালক্ষেপ করতে করেছেন অস্বীকার।

১৯৪০ সাল পড়তেই তুটি সংকল্প দানা বেঁধে ওঠে সুভাষচন্দ্রের মনে। একটি কলকাতার মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠা আর একটি হলো বিহারে রামগড়ে আগামী মার্চ মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের পাল্টা হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলন।

এলগিন রোডের বাড়িতে মহাজাতি সদন কমিটির সভা বসে। সেখানে মহাজাতি সদনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন সুভাষচন্দ্র। এক কথায় মহাজাতি সদন হবে বাংলার মুক্তি সংগ্রামের এক মহা তীর্থক্ষেত্র। তিনি বলেন,

ওখানে থাকবে মুক্তি সংগ্রামের প্রতি যুগের আর প্রতি স্তরের ধারাবাহিক ইতিহাস। শুধু লেখায় নয়—চিত্রেও। আলেখ্য সংগ্রহ করতে হবে আমাদের পূর্বসূরীদের। বাদবাকি এঁকে দেবেন আমাদের শিল্পীরা। প্রতিটি জেলার জন্য একখানা করে ঘর থাকবে। তেতলায় কয়েকখানা ঘরে থাকবে ভিন দেশের আর দেশের অতিথিদের থাকবার স্থান। বিভিন্ন জেলার বিশেষ করে পল্লীর কর্মীদের জন্যও কয়েকখানা ঘর রাখতে হবে। ওখানে বসবে সভা, হবে নাটক, জলসা, নাচ ও গানের রকমারি প্রদর্শনী। এক কথায় ওটা হবে কৃষ্টিঘর ; সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পাঠাগার।

করবার আরও কতই না রয়েছে। দেশের লেখক ও সাহিত্যিকদেরও ডেকে আনতে হবে ওখানে। প্রগতিবাদী সাহিত্য পাশাপাশি গড়ে না উঠলে স্থায়ী রূপ নেবে না আমাদের কোন প্রচেষ্টা। আন্দোলন মূর্তি গড়ে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য। কুড়িটা বছরের গান্ধী আন্দোলন নিয়ে কোন সাহিত্য গড়ে উঠল না অথচ এর তুলনায় কত সামান্যই না ছিল বঙ্গ ভঙ্গ রদের আন্দোলন। গানে, কবিতায়, উপন্যাসে গল্পে ভরে উঠেছিল সাহিত্য।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক বিশাল জনসভায় মহাজাতি সদনের পরিকল্পনা পেশ করে এক লক্ষ টাকার এক আবেদন জানালেন। জনতা একবাক্যে সমর্থন জানাল তাঁর সে দাবীর প্রতি। শুধু তাই নয় সেইদিনই জনগণের পক্ষ থেকে আর এক লক্ষ টাকার একটি তোড়া সুভাষচন্দ্রকে উপহার দেবার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সুভাষচন্দ্র ঠিক করেন এই ভবনের নামকরণ আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন রবীন্দ্রনাথ।

একই সঙ্গে চলতে থাকে মহাজাতি সদন নির্মাণের কাজ আর রামগড় সম্মেলনের প্রস্তুতি। আরও টাকা চাই। চাই অনেক জিনিস। এক একদিন সহকর্মীদের নিয়ে ভিক্ষায় বেরোন সুভাষচন্দ্র। প্রচুর সাড়া ও সহযোগিতা পান জনগণের কাছ থেকে।

তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিস ছিল ধর্মতলার মোড়ে আর সুভাষপন্থী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিস ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে মেডিক্যাল কলেজের সামনে। সেখানে প্রায়ই সভা বসে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে কর্মীরা ছুটে আসেন। আলোচনা হয়। রামগড় সম্মেলনের প্রস্তুতি চলে পূর্ণোদ্যমে।

রামগড় সম্মেলনের পরই অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মরণে শুরু হবে জাতীয় সপ্তাহ।

রামগড়ে সম্মেলন বসে ১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ। সম্মেলনের জায়গার নাম দেয়া হয় কিষাননগর। ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে অরণ্য ঘেরা পাহাড়। এদিকে বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে গড়ে উঠেছে উঁচু বক্তৃতা মঞ্চ আর তার চারপাশে টিনের অসংখ্য চালা ঘর।

তার কিছু দূরে গড়ে উঠেছে কংগ্রেস নগর। কংগ্রেসের টাকার অভাব নেই। সেখানে জাঁকজমকের ছড়াছড়ি।

সম্মেলনের আগের দিন এল কালবৈশাখী ঝড় আর বৃষ্টি। অবশ্য বেশী কিছু ক্ষতি করতে পারেনি।

পরদিন সকাল দশটায় শুরু হলো মিছিল। পুরোভাগে সুভাষচন্দ্র। কাতারে কাতারে লোক আসতে লাগল দূর গ্রাম গ্রামান্তর থেকে। দুপুরে বসল সম্মেলন। সুভাষচন্দ্রের ভাষণ শুরু হতেই শুরু হয় ঘন ঘন হাততালি।

কংগ্রেসের প্রস্তাব আগেই জানা গেছে। পাটনায় ওয়ার্কিং কমিটিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে নতুন কথা কিছু নেই।

সম্মেলনের সভাপতি সুভাষচন্দ্র সরাসরি জনতাকে বললেন, আগামী সংগ্রামে যাঁরা অংশ নিতে চান তাঁরা হাত তুলুন।

সম্মেলনে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন সুভাষচন্দ্র, ইউরোপে এক একটা ঘা খাচ্ছে আর সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের মুঠো আলগা হয়ে আসছে ভারতে। সাম্রাজ্যের সাহায্য কুড়িয়ে বা ভারতের সাহায্য নিয়ে বৃটিশকে রক্ষা করার কথা যেন এখন আর আমরা না বলি। এই ঘোর বিপদের দিনে ভারতের উচিত আগে নিজের কথা ভাবা। ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে এখনি দাবী তোলা দরকার—অস্থায়ী জাতীয় সরকারের মাধ্যমে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দাও। All power to the Indian people.

সম্মেলনে আরও বললেন সুভাষচন্দ্র, কংগ্রেসের দেশ না দেশের জন্যই কংগ্রেস। দেশের আসন্ন মুক্তি সংগ্রামে যে কংগ্রেস নির্বিকার-চিত্তে উদাসীন থাকবে পরম আরামে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত জনতার সামনে বলে যান সুভাষচন্দ্র, সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। প্রয়োজন শুধু সে সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করা, আরও ব্যাপক ও দুর্বার করে তোলা। গান্ধী কিম্বা জওহরলাল কিম্বা আজাদ—দেশ শুধু এঁদের নয়। দেশ আমাদেরও। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর। কে এল বা না এল তার হিসাবের দিন ফুরিয়ে গেছে। যদি আর কেউ না আসে আমি একাই হব আমার মুক্তিকামী দেশবাসীর সংগ্রামী প্রতিনিধি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী

ভারতবর্ষ ইংরেজের প্রভুত্ব অস্বীকার করে যে ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরেছিল নিজের বুকের উপর সেই ঝাণ্ডা বহন করে চলব আমি একা।

নাগপুর সম্মেলনের কাজ শেষ করে ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন সুভাষচন্দ্র। ২০শে জুন সুদীর্ঘ আলোচনা হলো দুজনে। ইউরোপে তখন ফ্রান্সের পতন ঘটেছে। বিজয়ী জার্মান সৈন্য প্যারিসে ঢুকে পড়েছে। ইউরোপে ও ভারতে ক্রমশই হীনবল হয়ে পড়ছে বৃটিশ। ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লক আইন অমান্য আন্দোলন আগে হতেই শুরু করে দিয়েছে।

গান্ধীজীর কাছে আবেদন জানালেন সুভাষচন্দ্র, এই সময় আপনিও অহিংস নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে দিন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটবেই এবং ভারতের পক্ষে এটাই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ।

কিন্তু গান্ধীজী বললেন, দেশ এখনো সংগ্রামের জন্য তৈরী হয়ে ওঠেনি। এখন এই মুহূর্তে আন্দোলন শুরু করলে তাতে দেশের ভাল না হয়ে ক্ষতিই হবে।

এটা হলো মিথ্যা মনগড়া অজুহাত। আসল কারণ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী, বৃটেনের ধ্বংসের বিনিময়ে স্বাধীনতা চায় না ভারত। অহিংসার এই হলো রীতি তার বিশ্বপ্রেমের যূপকাষ্ঠে জাতীয় স্বাধীনতাকে এইভাবে অনেক আগেই বলি দিয়েছেন গান্ধীজী।

জওহরলালও তাঁর বৃটিশ প্রীতির পরিচয় আগেই দিয়েছেন।

২৫শে মে তারিখে নৈনিতাল থেকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখলেন একখানি চিঠিতে জওহরলাল নেহেরুকে, আপনি রাজেন্দ্রবাবুকে একখানি চিঠিতে লিখেছেন, আমরা প্রস্তুত থাকলেও সত্যাগ্রহের নির্দেশ এখনই দেয়া যেতে পারে না। ঠিক এই সময়ে তা ভুল হবে। বৃটেন এখন বিপদগ্রস্ত। তার দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তার গলা টিপে ধরা ঠিক হবে না।

হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন সুভাষচন্দ্র। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, একা হলেও চলতে আমায় হবেই। তাই আপনার আশীর্বাদ চাই।

গান্ধীজীও উঠে দাঁড়ালেন। স্নেহের সঙ্গে বললেন, তোমার এই যাত্রা যদি সফল হয়, তাহলে আমিই তোমায় প্রথম অভ্যর্থনা জানাব।

এরপর মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্না ও হিন্দুমহাসভার সভাপতি সাভারকারের সঙ্গে দেখা করেন সুভাষচন্দ্র। দেশের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামের কথা বললেন। অনেক বোঝালেন। বললেন, সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হলে জিন্নাই হবেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু সে কথা মনে লাগল না জিন্নার। তিনি চান শুধু পাকিস্তান, তাতে ভারত ভাগ হয় হোক। সাভারকরের স্বপ্ন শুধু হিন্দু জাতীয়তাবাদ। বৃটিশ সৈন্যদলে যোগ দিয়ে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে হিন্দুরা কি করে এক বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হবে, তাঁর শুধু এই এক চিন্তা।

নাগপুর থেকে কলকাতা। আবার শুরু হয় সভা সমিতি। চলে ৩রা জুলাইএর প্রস্তুতি। অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান কর্মী মিলিতভাবে গোপনে তৈরী হয়ে ওঠে। ২রা জুলাই পরের দিনের কর্মসূচী প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। তাতে দেখা যায়, ৩রা জুলাই দুপুরবেলায় প্রথম অভিযান শুরু হবে। বিকালে এ্যালবার্ট হলে বসবে জনসভা; সেখানে সুভাষচন্দ্র একাই ভাষণ দেবেন। সেখান থেকে যাবেন টাউন হলে মুসলিম ছাত্রদের সভায় ভাষণ দিতে।

কিন্তু তা আর হলো না। ২রা জুলাই বেলা আড়াইটায় গ্রেপ্তার হলেন সুভাষচন্দ্র। পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলেই অবাক হয়ে গেল দেশের মানুষ।

গ্রেপ্তার হওয়ার কিছু আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। কবি এক বিবৃতি দেন,

ব্যক্তিগতভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি।...তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন এবং দেশ বিদেশের রাজনীতি চর্চা করেছেন। সেই জন্য তাঁর কাছ থেকে আমি আশা করি এবং দাবী করি তিনি দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন; তার সাংঘাতিক অনৈক্য গহ্বরের উপর সেতু বন্ধন করবেন; তাঁর প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করবেন; তাঁর দেশসেবা সার্থক হবে। চারিদিকের দলীয় আঘাত তাঁর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভ কামনা।

কবিগুরুর কাছ থেকে একদিন এলগিন রোডের বাড়িতে ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র দেখেন, দোতলার অতিথিদের ঘরে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড় জমে উঠেছে। এমন সময় একজন পুলিশ অফিসার এসে পরোয়ানা দেখাল।

কোন কথা বললেন না সুভাষচন্দ্র। শুধু ভিতরে গিয়ে মার সঙ্গে একবার দেখা করে এলেন। কোনরকমে চোখের জল সামলে নীরবে শুধু ছেলের মাথায় হাত রাখলেন মা।

সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরদিন ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলন ঠিকই চলল। আগেকার কর্মসূচীর মতই কাজ চলে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট জনতা এক সঙ্গে হাত তুলে তাদের মনোভাব জানায়।

সম্মেলনে অবিলম্বে যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন কৃষক নেতা সহজানন্দ সরস্বতী।

রামগড়ের ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলনকে অনেকে আপোষ বিরোধী সম্মেলন বলেও অভিহিত করল। যে যাই বলুক এ সম্মেলনের আশ্চর্য সাফল্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন কংগ্রেস নেতারা।

রামগড় থেকে ফিরে এসে ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় সুভাষচন্দ্র তাঁদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য আবেদন জানিয়ে এক প্রবন্ধ লেখেন।

রামগড় সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের সাফল্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন গান্ধীজী। কংগ্রেসের অধিবেশন দারুণ ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়ে কোনরকমে শেষ হলো। শেষে গান্ধীজী বললেন, আমি সুভাষকে ছেলের মতই মনে করেছিলাম। মনে করেছিলাম, সুভাষকে আমি পেয়েছি। কিন্তু তা হলো না। তাঁর ভালবাসা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

রামগড় থেকে সুভাষচন্দ্র ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সপ্তাহের প্রস্তুতি চলে কলকাতায়। কলকাতায় তখন যুদ্ধের জন্য ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। কিন্তু তা অমান্য করে একের পর এক করে জনসভা করে চলেন সুভাষচন্দ্র। সবাই ভাবল যে কোনদিন এবার তাঁকে গ্রেপ্তার করবে সরকার।

কিন্তু তা করল না। বৃটিশ সরকার তখন বুঝল, কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে আরও কিছুদিন ছেড়ে রাখা দরকার। কারণ এখন সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন বৃটিশ বিরোধী বক্তৃতায় কংগ্রেস নেতাদেরও সমালোচনা করছেন। বৃটিশ দেখল ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দল থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসছে।

জাতীয় সপ্তাহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশ জোড়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করল ফরওয়ার্ড ব্লক। চরমপত্র দিল বৃটিশ সরকারকে। তার উত্তরে সরকার শুরু করল অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা।

এমন সময় কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন হল। কংগ্রেসের এ্যাড হক কমিটি তখন মৃতপ্রায়। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীই বেশী জিতল। আর জিতল মুসলিম লীগের একটা দল আর এ্যাড হক কংগ্রেসের সহায়তায় নির্দলীয়রা। লীগ ও স্বতন্ত্ররা মিললে ওরাই হয়ে ওঠে দলে ভারী।

মুসলিম লীগের সঙ্গে প্যাক্ট করল ফরওয়ার্ড ব্লক। মেয়র হলেন

আবদার রহমান সিদ্দিকী আর অলডারম্যান হলেন সুভাষচন্দ্র। অনেকে সমালোচনা করল এই আঁতাতের। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না সুভাষচন্দ্র। তিনি এই আঁতাত শুধু কলকাতা পৌরসভার জন্যই করেননি, এ আঁতাত করেছেন তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের কথা ভেবে। অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার ও জয়ী করে তুলবে এই আঁতাতের মধ্যে তারই আভাষ দিলেন সুভাষচন্দ্র।

বস্তুতঃ দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ও সুভাষচন্দ্রের 'করপোরেশন প্যাক্ট' ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের নেতারা তখন তা বুঝতে পারেননি। এই আঁতাতের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দুমহাসভা প্রতিবাদ জানায়, সভা করে টাউন হলে।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি সভা করে এ বিষয়ে সব প্রতিবাদের উত্তর দেন সুভাষচন্দ্র। তিনি আবেগের সঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠে বলেন,

মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভা, কংগ্রেস, যে কেউ আজকের আসন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রামী ভারতের আশা আকাঙ্খার সমর্থনে দাঁড়াবে, বিন্দুমাত্রও সাহায্য করবে আজকের এই মহা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে—প্যাক্ট ত দূরের কথা, আমি চিরদিন তার গোলামি অঙ্গীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হব না। দুশো বছর ইংরেজের গোলামি করে ভারতবর্ষের মৃত্যুর পথ আমরা প্রশস্ত করেছি। ইংরেজের গোলামি নিঃশেষ করতে আমার দেশবাসীর গোলামি যদি আমাকে করতেই হয় তা হবে আমার সহস্রবার কাম্য।

ঢাকায় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাদেশিক সম্মেলন বসে। সভাপতি হন রাজেন দেব।

বাংলায় তখন চলছে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা। ঢাকার সম্মেলনে এমন একটি প্রস্তাব নেয়া হলো যা দেখে চমকে গেল লীগ মন্ত্রীরা। চমকে গেল বৃটিশ সরকার। সম্মেলনে গৃহীত

প্রস্তাবটিতে ১৯৪০ সালের ৩রা জুলাই কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট উৎখাত করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে অন্ধকূপ হত্যার বদনাম দিয়ে এই মনুমেন্ট নির্মাণ করে বৃটিশ।

প্রস্তাবে ঠিক হয় আগামী ৩রা জুলাই নবাব সিরাজদ্দৌলা দিবস পালিত হবে সারা বাংলা দেশ জুড়ে। হলওয়েল মনুমেন্ট শুধু স্বাধীনতাকামী নবাব সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতিকেই অকারণে কলঙ্কিত করেনি, বিগত দেড়শো বছর ধরে সমগ্র জাতির দাসত্ব ও অবমাননার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার বুকের উপর। ওর চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে হবে।

ঢাকার মুসলমান ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় একবাক্যে আশ্বাস দেন সুভাষচন্দ্রকে, অন্ধকূপ হত্যার এই মিথ্যা স্মৃতিচিহ্ন অপসারিত করার আন্দোলনে মুসলমান ছেলেরাও সানন্দে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

এরপর জুনের প্রথমেই নাগপুরে বসবে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের বার্ষিক অধিবেশন। বাংলা থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যান রাজেন দেব, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, বসন্ত মজুমদার, কালী বাগচি, হরেন ঘোষ, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, হেমপ্রভা দেবী, লীলা রায় এবং আরও অনেকে।

২৭শে জুলাই পুনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন বসে। তাতে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় বৃটেন যদি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী মেনে নেয় তাহলে কংগ্রেস যুদ্ধে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে। ইংরেজকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাস। আর সেই সদিচ্ছার প্রমাণস্বরূপ অবিলম্বে এমন একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে যার প্রতি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যদের আস্থা থাকবে। একমাত্র জাতীয় সরকারই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংরেজকে বর্তমান যুদ্ধে সাহায্য করতে পারে।

আরও বলা হলো, কমিটির এই আবেদন সরকার মঞ্জুর করলে কংগ্রেস তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে ভারত রক্ষার কাজে।

এই আন্দোলনের জগতে আগস্ট মাসে বড়লাট তাঁর কার্যকরী পরিষদে ও আলোচনা পরিষদে কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধিকে নেবার কথা ঘোষণা করেন।

বিনা বিচারে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রইলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সেজন্য কোন উদ্বেগ প্রকাশ করল না কংগ্রেস। যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন তাঁকে আটকে রাখবে বৃটিশ সরকার। কারণ সরকার জানে সুভাষচন্দ্র যুদ্ধের সময় বাইরে থাকলে ভারতে তাদের সাম্রাজ্যবাদের ভিতটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবেন। তাতে যুদ্ধের ক্ষতি হবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্ট বলল, সুভাষবাবু কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়েই আইন অমান্য করেছেন।

কিন্তু জেল থেকে তাঁকে বেরোতেই হবে। জেলে এর আগে বহুবার এসেছেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু এমন অস্বস্তি আর কখনও অনুভব করেননি তিনি। ইতিহাসের এই বিরাট সন্ধিক্ষণে জেলে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকা হবে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভুল। কিন্তু কেমন করে বেরোবেন?

মরিয়া হয়ে সরকারকে এক চরম পত্র দিলেন সুভাষচন্দ্র। সরকার যদি তাঁকে ছেড়ে না দেয় তাহলে যেমন করে হোক তিনি নিজের মুক্তি নিজেই রচনা করে নেবেন। তাতে তিনি মৃত্যু বরণ করতেও প্রস্তুত।

সে চরম পত্রের কোন উত্তর দিল না সরকার। বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তখনকার প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে জানিয়ে দিলেন, সরকারের এ বিষয়ে কোন্ কিছু করবার নেই।

শরৎচন্দ্র জেলের ভিতর গিয়ে দেখা করে কথাটা জানিয়ে দিলেন

সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্র একখানি চিঠিতে জানিয়ে দেন তাঁকে মুক্তি না দিলে তিনি আগামী ২৯শে নভেম্বর হতে অনশন শুরু করবেন।

তিনি তাঁর চরম কথা ঘোষণা করলেন, সরকার আমায় পশু শক্তির জোরে জেলের মধ্যে আটকে রাখতে চায়। তার উত্তরে আমার কথা হলো, হয় আমাকে মুক্তি দাও, নইলে আমি প্রাণপাত করব—আমার জীবণ-মৃত্যু আমার হাতে।

এই সঙ্গে তাঁর শেষ রাজনৈতিক ইচ্ছাটির কথাও খুলে বললেন সুভাষচন্দ্র,

এখনি সঙ্গে সঙ্গে কোন ফল পাওয়া না গেলেও কোন আত্মত্যাগই কখনও বৃথা যায় না। কষ্টস্বীকার ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আদর্শের প্রসার হয়।... এই মরজগতে সব কিছুই ধ্বংস হয়,—শুধু বিনাশ নেই মানুষের ভাবাদর্শের, বিনাশ নেই স্বপ্নের। আদর্শের জন্য ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর হাজার হাজার মানুষের জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে সে আদর্শ। এই জন্যেই ঘুরে চলে বিবর্তনের চাকা। এক মানুষের স্বপ্ন আর ভাবাদর্শ এমনি করেই বর্তায় তার উত্তরসূরীদের মধ্যে।

দেশবাসীকে আমি বলে যেতে চাই—ভুলো না, দাসত্বের চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলো না অন্যায় অবিচারের সঙ্গে আপোষ করা মহা অপরাধ। জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়—এই হলো চিরকালের নিয়ম। মনে রেখো বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করাই সকলের বড় ধর্ম—তার জন্য যত দামই দিতে হোক।

পরিশেষে দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও অত্যাচার বন্ধ করার জন্যও আবেদন জানালেন সরকারের কাছে।

অনশন শুরু হলো ২৯শে নভেম্বর। প্রথম প্রথম শুধু নুন মেশানো জল খেতে লাগলেন। পরে তাও বন্ধ করলেন। বাধ্য হয়ে অনশনের ছয় দিন পরেই তাঁকে মুক্তি দিল সরকার।

বাড়িতে এসে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র।

এদিকে নভেম্বর মাসে গান্ধীজীও শুরু করে দিয়েছিলেন ছোট আকারের এক প্রতিরোধ আন্দোলন। একজন অহিংস হিসাবে সরকারের যুদ্ধোদ্যম সমর্থন করতে পারেন না। যুদ্ধে বৃটিশ সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করার পর থেকেই তিনি বলতেন, যিনি অহিংসায় বিশ্বাসী তিনি শুধু নিজে যুদ্ধ করবেন না, যুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করবেন না।

অক্টোবর মাসেই ঘোষণা করেন গান্ধীজী, সরকারের যুদ্ধোদ্যমে বাধাদানের জন্য আন্দোলন শুরু করবেন তিনি। তবে অবশ্য ব্যাপকভাবে নয়। এই ঘোষণা অনুযায়ী আন্দোলন শুরু হলো নভেম্বর মাসে। সঙ্গে সঙ্গে যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছিলেন তাঁরাও আন্দোলনে যোগদান করেন। বহু কংগ্রেস নেতার সঙ্গে তাঁদেরও গ্রেপ্তার করল সরকার।

কিন্তু এর আগে ১৯২১ সালে ও ১৯৩০-৩২ সালে গান্ধীজী যে আন্দোলন করেন তার তুলনায় এ আন্দোলন খুব ছোট ও দুর্বল মনে হলো। কোন উৎসাহ বা দৃঢ়তা দেখা গেল না এ আন্দোলনে। কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই তখন আন্দোলন চাইছিলেন। দেশ বিপ্লবের জন্য তৈরি। তবু কংগ্রেস নেতারা বিপ্লব চান না। চান না কোন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন।

ফরওয়ার্ড ব্লক বলল, তবু মন্দের ভাল। একেবারে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে না থেকে একটা যা হোক কিছু করছেন গান্ধীবাদীরা।

॥ কুড়ি ॥

পুরনো বছর শেষ হতে চলেছে। নতুন বছর ১৯৪১ সাল আসতে আর মাত্র কটা দিন বাকি। বাড়িতে বিছানায় শুয়ে কেবল ভাবেন সুভাষচন্দ্র। এক একটি বছর কেটে যাচ্ছে আর এক একটি শুকনো পাতা ঝরে যাচ্ছে জীবনের বৃন্ত হতে। কিন্তু কোন কাজই হচ্ছে না।

শুধু চিন্তা আর চিন্তা। আপন মনে চিন্তা করতে করতে অনেক গভীরে চলে যান সুভাষচন্দ্র। মা সব সময় কাছে কাছেই থাকেন। মাঝে মাঝে খবর নিতে আসেন দাদারা। কিন্তু বিশেষ কোন কথা বলেন না সুভাষচন্দ্র। বাড়ির ছেলেরা তাদের প্রিয় রাঙাকাকার কাছে আসতে সাহস পায় না। বাইরের লোকজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও বিশেষ দেখা করেন না।

ভাবতে ভাবতে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ওঠেন সুভাষচন্দ্র, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভুল পথে চলছে কংগ্রেস এবং এ ভুল তাদের কোনোদিন ভাঙ্গবে বলে মনে হয় না। একা ফরওয়ার্ড ব্লক বিশেষ কিছুই করতে পারবে না।

সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট দল কেবল নিজেদের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত। ওরা চায় কংগ্রেসকে এখন না চটিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে তাদের সভ্যদের ভাঙ্গিয়ে আনতে।

অবশ্য দেশের তরুণ বিপ্লবীরা বোমা পিস্তল নিয়ে যতটুকু পারছে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সুভাষচন্দ্রের। তাদের শক্তি কতটুকু তাও জানতেন। তিনি জানতেন, ওদের শক্তি কম হলেও ওঁরা খাঁটি বিপ্লবী, অদম্য ওদের উৎসাহ। তবে এটাও

জানতেন দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে ওদের ক্ষমতা ও উৎসাহ যথেষ্ট নয়।

· আইন অমান্য এমন কি সন্ত্রাসবাদও যথেষ্ট নয়। একান্তভাবে উপলব্ধি করলেন সুভাষচন্দ্র, ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাইরের সামরিক সাহায্য এখন অপরিহার্য। বৃটেনের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। বাইরে থেকে সামরিক সাহায্য পেয়ে তাকে জোর একটা আঘাত হানলেই তার ক্ষমতার বাঁধনটুকু ছিঁড়ে যাবে একেবারে। কিন্তু এ সাহায্য আসবে কোথা হতে, সেইটাই হলো প্রশ্ন।

ইউরোপে থাকাকালে ইটালি গিয়ে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। হিটলারের সঙ্গেও দেখা করেছেন। যুদ্ধে ইটালিতে অক্ষশক্তি জিতবে ঠিক, কিন্তু ভারতকে তারা বিনা স্বার্থে সাহায্য দেবে না। তবে রাশিয়ার কথা একটু স্বতন্ত্র। বিপ্লবের দুঃখকষ্টের স্মৃতি আজও পুরনো হয়ে যায়নি বলেই হয়ত রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করতে পারে তার স্বাধীনতা সংগ্রামে।

কিন্তু সমস্যা হলো কে যাবে। এমন একজনকে পাঠাতে হবে যার ভারতের বাইরেও বেশ নামডাক আছে। যার কথার গুরুত্ব দেবে বিদেশীরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে মনে ঠিক করে ফেললেন সুভাষচন্দ্র, তিনি নিজেই ভারতের বাইরে চলে যাবেন।

কিন্তু কাউকে ঘুণাক্ষরেও বললেন না কথাটা।

শুধু জামিনে খালাস পেয়েছেন সুভাষচন্দ্র। আগামী ২৬শে জানুয়ারি তারিখে রাজদ্রোহিতার অপরাধে বিচার হবে তাঁর। বিচারে নিশ্চয়ই কঠিন কিছু শাস্তি হবে। বহুদিন হতেই তাঁর উপর রেগে আছে বৃটিশ সরকার। সরকার জানে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু হলেন সুভাষচন্দ্র।

এই সময়কার তাঁর মনের অবস্থা পরে লেখা তাঁর 'অন টু দিল্লী' বইখানিতে সুন্দরভাবে লিখেছেন সুভাষচন্দ্র।

এ যেন স্বেচ্ছাকৃত নির্জনবাস। বাড়ি থেকে একবারও বেরোন না।

কোথাও যান না। বাইরে থেকে আসা কোন লোকজনের সঙ্গেও দেখা করতে চান না। দিনরাত বাড়িতে শুয়ে বসে কাটান। জানুয়ারি মাস থেকেই এইরকম ভাবে চলছিল। শুধু ১৬ই জানুয়ারি হলো এর কিছুটা ব্যতিক্রম। জনকতক ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করলেন সুভাষচন্দ্র। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন।

বন্ধুরা সকলে দেখে অবাক হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্রের মুখে একমুখ দাড়ি। এর আগে কেউ কখনও দাড়ি দেখেননি তাঁর মুখে। অনেকে হাসতে লাগলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা বললেন না সুভাষচন্দ্র।

বিকালের দিকে ভাইপো শিশিরকুমার বসুকে একবার ডাকলেন। ডেকে গোপনে কি বললেন।

শীতের রাত্রি। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। রাত্রি প্রায় একটা দেড়টা নাগাদ একটি কালো রঙের মোটর গাড়ি বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভিতর থেকে মৌলবী জিয়াউদ্দীন নামে একজন পাঠান ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে যা কিছু লটবহর ছিল গাড়িতে তোলা হলো।

গাড়ি চালাতে লাগলেন ভাইপো শিশিরকুমার।

গাড়ি তীর বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দূর বিদেশের পথে প্রথম যাত্রা শুরু হলো সুভাষচন্দ্রের। মা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। পা ছুঁয়ে একবার প্রণাম করতেও পারলেন না। কারণ পা ছুঁলেই যদি জেগে যান। যদি কোন বাধা সৃষ্টি করেন।

হাওড়া স্টেশন থেকে কোন গাড়িতে উঠলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কারণ তখন বড় বড় স্টেশনেই গোয়েন্দারা কড়া নজর রাখত রাজনৈতিক লোকদের উপর। জি, টি, রোড ধরে রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলল গাড়ি।

আপাততঃ যাবেন পেশোয়ার। ওখানে সব ঠিক করা আছে। কিন্তু বরাবর এভাবে গাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। দিনের বেলায় ধরা

পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। তাই দিন হলে ধানবাদে অশোক বোসের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হল, আর রাত্রি হলেই আবার যাত্রা শুরু হল। এইভাবে দুই একদিনের মধ্যে গোমোয় গিয়ে পৌঁছলেন সুভাষচন্দ্র। এখান থেকেই ট্রেনে উঠবেন। পাড়ি দেবেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে।

ভাইপো শিশিরকুমারকে বিদায় দিয়ে স্টেশনে গিয়ে পেশোয়ারের একটি টিকিট কিনলেন সুভাষচন্দ্র।

অশোক ও শিশির দুই ভাই তখনও গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন তাঁদের রাঙা কাকাবাবুর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। সুভাষচন্দ্র শুধু একটি কথা বললেন, আমি চলি, তোমরা ফিরে যাও।

এই বিদায়ই শেষ বিদায়, এই দেখাই শেষ দেখা একথা সেদিন ভাবতে পারেননি অশোক ও শিশির।

ট্রেন এসে যায়। মৌলবী জিয়াউদ্দীনবেশী সুভাষচন্দ্র ট্রেনে উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। ছুটে চলে হু হু বেগে। মনে অনেক ভাবনা জাগে। ভাবনা নিজের জন্য ততখানি নয়। ভাবনা হয় বাড়ির লোকদের জন্য। কলকাতায় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে নিশ্চয় মেজদা ও বাড়ির লোকজনের উপর পীড়ন করবে পুলিশ। যাই হোক মনে ভাবনা জাগলেও ভয় নেই বিন্দুমাত্র। সমস্ত পার্থিব জয়ের উর্ধ্বে উঠে গেছেন তখন সুভাষচন্দ্র।

নৌশেরা জংশনে গাড়ি আসতেই নেমে পড়লেন সুভাষচন্দ্র আর সঙ্গে সঙ্গে আবাদখাঁ নামে একজন পাঠান এসে সেলাম করে দাঁড়াল। সঙ্গে তার আছে একটা লরি। সেই লরিতে করে তাঁকে নিয়ে যাবে পেশোয়ার। ভগৎরামের কাছে।

পেশোয়ারে পৌঁছলেন ওঁরা সন্ধ্যার কিছু আগে। যুদ্ধের জন্য সারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তখন চলেছে বৃটিশ পুলিশের কড়া পাহারা। চারিদিকে বিরাট পর্বতমালা থাকলে হবে কি অদূরেই দেখা যাচ্ছে খাইবার পথ। এই খাইবার পথের ভিতর দিয়ে যুগে

যুগে অসংখ্য বিদেশী শত্রু এসেছে ভারতে। তাই খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে যে কোন মানুষের যাতায়াতকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাতটা পেশোয়ারেই কাটাতে হবে। রাত কাটাবার জন্য একটা সরাইখানা পাওয়া গেল। নাম আজাদ মুসাফিরখানা। নোংরা সরাইখানায় রাতটা কোনরকমে কাটল। আফগানিস্থান ও পাশাপাশি পার্বত্য এলাকার অনেক যাত্রী এসে রাত কাটায় এখানে। এই সরাইখানাতেই তুজনে পাঠানের বেশ পরেন। বেশ পাল্টে ভগৎরাম তলোয়ার হন রহমৎ খাঁ আর সুভাষচন্দ্র জিয়াউদ্দীনই রয়ে যান। তবে এবার আর মৌলবী নয়। রহমৎ খাঁনের বোবা কালা এক অসুস্থ ভাই। ফকিরের আস্তানা পীরের দরগায় যাচ্ছেন মানত দিতে। স্থানীয় পাঠান ভাষা না জানার জন্যই বোবা কালা সাজতে হলো সুভাষচন্দ্রকে।

ভোর হতেই লরি ছাড়ে। এরপর গাড়ি থামবে সবকদরে। পেশোয়ার জেলার শেষ ঘাঁটি। এখানে ইংরেজদের পলিটিক্যাল এজেন্ট বা কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিল।

সবকদর পার হলেই মোমান্দ নামে স্বাধীন আদিবাসীদের একটি পাহাড়ী গ্রাম পাওয়া যায়। ওরা ভীষণ তুর্ধর্ষ এবং পাহাড়ের উপর থেকে লড়াই করে বলে তখনও তাদের জয় করতে পারেনি বৃটিশ। ওখানেও বিপদ কম নয়। সেই তুর্ধর্ষ উপজাতির কারো যদি কোন পথিককে দেখে সন্দেহ হয় সে বৃটিশের চর তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হাতের রাইফেল থেকে গুলি করবে তাকে।

সামনে খাইবার পাসের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে জামরুদ তুর্গ। হাঁটা সোজা রাস্তা ছেড়ে মাঝ পথে এগিয়ে যেতে থাকেন ওঁরা। ভগৎরাম তুজন পাঠান রক্ষী যোগাড় করেছেন। কারণ এ অঞ্চলে পথে বড় চুরি রাহাজানি হয়। এই পার্বত্য এলাকা পার হয়ে যেতে হবে আফগানিস্থান। তারপর রাশিয়া। রাশিয়া তখন

জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাই সুভাষচন্দ্র ভাবলেন রাশিয়াতে আশ্রয় মিললেও মিলতে পারে।

আফগান সীমান্তে কাবুল নদী পার হয়ে আড্ডা শরীফ নামে এক সরাইখানায় রাত কাটালেন। সেখান থেকে যান আফগানিস্থানের অন্তর্গত লালপুরে। তারপর কাবুল নদী পার হয়ে আবার পথ ধরলেন। নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সঙ্গী আবাদ খাঁ চলে গেলেন। ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে ঘুমিয়েও পড়লেন সুভাষচন্দ্র। ভগৎরাম কোন একটা গাড়ির খোঁজে বেরোলেন। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ক্লান্ত ও অসুস্থ অবস্থা সুভাষচন্দ্রের। আর এক পাও হাঁটবার ক্ষমতা নেই।

অবশেষে সন্ধ্যার দিকে একটা লরি পাওয়া গেল। লরিতে উঠে বসলেন দুজনে। কনকনে শীতের রাত্রি। বরফ পড়ছে চারদিকে। তবু গাড়ি ছুটে চলল সারারাত। তারপর গোটা দিনটাও।

বরফে ঢাকা গোটা কাবুল উপত্যকা পার হয়ে ওঁরা যখন কাবুলে লাহোর গেটে গাড়ি থেকে নামলেন তখন শীতে প্রায় জমে গেছেন দুজনে। কিন্তু কোন সরাইখানা নেই। আছে শুধু লরি ড্রাইভারদের একটা আড্ডা। সেইখানেই রয়ে গেলেন দুজনে।

সন্ধ্যে হতেই ভগৎরাম কিছু বাতি, কিছু শুকনো রুটি আর কাবাব নিয়ে এল। শুকনো রুটি সুভাষচন্দ্র খেতে পারলেন না দেখে ভগৎরাম এক কাপ চা নিয়ে এলেন। চায়ে ডুবিয়ে রুটি খেয়ে রাতটা কাটালেন সুভাষচন্দ্র। কিছু কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে শরীরটাকে গরম করে নিলেন দুজনেই।

এই কাবুলে খুব সাবধানে থাকতে হবে তাঁদের। এখানে যে কোন ভারতীয়ই ইংরেজদের চর হতে পারে আবার যে কোন আফগানবাসীও গোয়েন্দা বিভাগের সদস্য হতে পারে। গোয়েন্দা আর গুপ্তচরে ভর্তি কাবুল শহরে সব সময়ই বিপদ

রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত অফিসে আশ্রয় চেয়ে পাঠাবার মনস্থ করলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু কাকে পাঠাবেন খুঁজে পেলেন না। সব রাষ্ট্রদূতদের অফিসের সামনেই কড়া পুলিশ পাহারা। তা ভেদ করে অজস্র কৈফিয়ৎ দিয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

একদিন একটি গাড়ি করে রুশ রাষ্ট্রদূতের অফিসের সামনে গেলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে পারলেন না। ফলে ফিরে আসতে হলো বিফল হয়ে।

নোংরা আস্তানা আর ছেড়া ময়লা পোষাকে ঢাকা বোবা কালার ছদ্মবেশ আর ভাল লাগছিল না। তবু উপায় নেই। ভারতে ফিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। সেখানে শুধু হতাশা আর ব্যর্থতা। তবে এ জায়গাটাও যেমন করে হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করতে হবে।

অবশেষে পাঁচ দিনের দিন ভগৎরামকে ইটালির রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠালেন। রাষ্ট্রদূত পিয়েত্রো কারোনি আশ্বাস দিলেন। আশ্বাস পেয়ে নিজে গিয়ে দেখা করলেন সুভাষচন্দ্র। পিয়েত্রো কারোনি বললেন, সুভাষচন্দ্রের রোমে অথবা বার্লিন যাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। তবে দিনকতক সময় লাগবে। কাবুল থেকে রোম বা বার্লিন যেতে হলে রাশিয়া হয়ে যেতে হবে। অন্য কোন পথ নেই। তবে তাতে আটকাবে না। রাশিয়া কিছুতেই অমত করবে না। ইটালির কথা রাখবে।

নাৎসীবাদী ও ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ধারণা তখনও পর্যন্ত পাল্টায়নি। তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা তখনও যায়নি সব মন থেকে। তিনি রাশিয়াতে আশ্রয় নিতেই চাইছিলেন। কিন্তু কোন উপায় না করতে পেরে বাধ্য হয়ে রোমে বা বার্লিনে যেতে রাজী হলেন।

তা ত হলো। কিন্তু অন্তবর্তীকালীন দিনগুলো কাটাবেন

সরাইখানায় রোজ আফগান পুলিশ এসে শুধায়, সন্দেহ করে। লরি ড্রাইভারদের সরাইখানায় তুজন হজ যাত্রী কেন এতদিন বসে আছে। পুলিশকে কিছু ঘুষ দিতে হয় ঠাণ্ডা রাখতে। কারণ এ নিয়ে একবার একটা হৈ চৈ করলেই আর রক্ষা নেই। মাটি হয়ে যাবে সব।

শেষকালে হঠাৎ একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই কাবুলে এক ভারতীয়ের ঘরে আশ্রয় মিলে গেল সুভাষচন্দ্রের। নাম, উত্তমচাঁদ মালহোত্র। এ আশ্রয় দানে বিপদ আছে, ঝুঁকি আছে বিস্তর ; তবু তাঁকে আশ্রয় দিয়ে গর্ববোধ করলেন উত্তমচাঁদ।

তখন ফেব্রুয়ারি মাস সবেমাত্র পড়েছে।

এদিকে তখন সুভাষচন্দ্রের খোঁজে সারা ভারত তোলপাড় করছে বৃটিশ সরকার।

১৭ই জানুয়ারি থেকে ২৬শে জানুয়ারি সকাল পর্যন্ত ব্যাপারটা চাপা রাখা হয়েছিল। একমাত্র মা আর বাড়ির লোকজন ছাড়া বাইরের কাউকে জানতে দেয়া হয়নি। বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত জানতে পারেনি।

অন্তর্ধানের আগে কিছুদিন বাড়িতে যেমন অজ্ঞাতবাসের মত ছিলেন সুভাষচন্দ্র, বাইরের সকলে জানল তিনি তেমনিই আছেন। তেমনিই চাকর এসে যথাসময়ে খাবার দিয়ে যেত এবং শূন্য থালা নিয়ে যেত। বাড়ির ছেলেরা এক একজন করে রোজ পিছনের দরজা দিয়ে এসে সেই খাবার খেয়ে যেত। মা তেমনি সুভাষচন্দ্রের সেই শোবার ঘরে থেকে সেবা করার ভান করে যেতেন।

কিন্তু ২৬শে জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের বিচারের দিন সকালে সুভাষচন্দ্রের শোবার ঘর খুলে হঠাৎ দেখা গেল তিনি নেই। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে খবর দেয়া হলো। শরৎচন্দ্র ছিলেন রিষড়ার বাগান বাড়িতে। তিনি এসে পুলিশকে জানালেন, বাংলা ও ভারতের বড়

বড় নেতাদের টেলিফোনযোগে খবর দিলেন। পণ্ডিচেরী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিতেও টেলিগ্রাম করা হলো।

বাইরের সবাইকে বলতে লাগলেন শরৎচন্দ্র, নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছে সুভাষ। সেই জন্যই দাড়ি রাখছিল।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে শরৎচন্দ্রকে নানারকমের প্রশ্ন করে। মা আবার পাল্টা প্রশ্ন করেন পুলিশকে, তোমরাই আমার ছেলেকে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছো। বল, আমার ছেলে কোথায়? তোমরা তাকে শত্রু মনে করো, তাই তাকে লুকিয়ে নিয়ে গেছ।

অশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে আগুন ঠিকরে পড়ে মার চোখে। অবাক হয়ে পুলিশ চলে যায়।

খবর পেয়ে গান্ধীজী টেলিগ্রাম করেন শরৎচন্দ্রকে। তার উত্তরে শরৎচন্দ্র জানান, Circumstances indicate renunciation ঘটনা থেকে যা বোঝা যায় তাতে মনে হয় সংসার ত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও তারবার্তা এল ২৯শে জানুয়ারি। তিনি লিখলেন, সুভাষের অন্তর্ধান সংবাদে ভয়ানক বিচলিত হয়েছি। মা জননীকে আমার সমবেদনা জানাবে। কোন সংবাদ পেলেই আমাকে জানাবে।

এ ছাড়া দেশের অসংখ্য মানুষ দলে দলে এসে ভিড় করতে লাগল এলগিন রোডের বাড়িতে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার অন্ত নেই তাদের প্রিয় নেতার জন্য।

আর দেরি করা চলে না। কাবুল থেকে সরতেই হবে। উত্তমচাঁদকেও বিপদের ঝুঁকি থেকে মুক্তি দেয়া দরকার। ওদিকে পিয়েত্রো কারোনিও বসে নেই। ঘন ঘন টেলিফোন করছেন রোম ও বার্লিনে।

অবশেষে জার্মানি যাতায়াতের সব ঠিক হয়ে যায়। কাবুল থেকে

মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্রকে বার্লিনে নিয়ে যেতে হলে একটা পাশপোর্ট দিতে হবে।

কাবুলে থাকাকালে একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, যে ভারতে এত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সেখানে জাতীয় ঐক্য কি করে সম্ভব?

সুভাষচন্দ্র তখন উত্তর করেন, বৃটিশের মত এক তৃতীয় শক্তি যতদিন ভারতে থাকবে ততদিন এ সমস্যা বা বিবাদের শেষ হবে না। বরং তা বেড়েই চলবে। যদি একজন কড়া ডিক্টেটর কুড়ি বছর ধরে ভারতকে শাসন করে তাহলে সব অনৈক্য ও বিবাদ দূর হয়ে যাবে। ভারতে বৃটিশ শাসনের পর অন্ততঃ বেশ কয়েকবছর ধরে একনায়কতন্ত্রের দরকার। অন্য কোন শাসনতন্ত্র এখন ভারতে চলতে পারে না। ভারত এখন যে সব রাজনৈতিক রোগে ভুগছে একজন নির্মম একনায়কতন্ত্রী শাসকই সে সব রোগ সারাতে পারে।…ভারতে একজন কামাল পাশার দরকার।

কাবুলে ইটালির রাষ্ট্রদূত অফিসে অরলাণ্ডো ম্যাজোটা নামে একজন ইটালীয় ভদ্রলোক বেতার অপারেটারের কাজ করতেন। তাঁর পদটি ছিল কূটনৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি অনেকদিন অনুপস্থিত থাকায় পদটি খালি পড়ে ছিল। এখন অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটার নামে এক পাশপোর্ট দেয়া হলো সুভাষচন্দ্রকে। এই পাশপোর্ট নিয়ে তাঁকে রোথারা ও সমরখন্দ হয়ে যেতে হবে মস্কো। সেখান থেকে বিমানযোগে বার্লিন।

কাবুল থেকে যাত্রা শুরু করতে ছয় সপ্তাহ দেরি হয়ে গেল নানা কারণে। এর মধ্যে তাঁর প্রতি রাশিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন আর একবার। কিন্তু কোন ফল হয়নি তাতে। ব্যাপারটিতে কোন গুরুত্ব দেননি রুশ কর্তৃপক্ষ। অবশ্য রাশিয়ার উপর দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে যেতে দিতে তাঁদের কোন আপত্তিও ছিল না।

১৮ই মার্চ কাবুল ত্যাগ করলেন সুভাষচন্দ্র। জিয়াউদ্দীন নাম

ছেড়ে নতুন নাম ধারণ করলেন, অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা। কাবুল থেকে বোখারো ও সমরখন্দের পথ বড় ভয়ানক। হিন্দুকুশ পর্বতমালার অসংখ্য গিরিপথ, তাশকুরগ্যানের গিরিসংকট, স্টেপভূমির মত মৃত নগরী প্রভৃতি পার হয়ে সুভাষচন্দ্র পৌঁছলেন অক্সাস নদীর ধারে পাটা কেশারে। আফগান সীমান্তের এই শেষ শহর পাটা কেশার। নদীর ওপারেই সোভিয়েত রাশিয়া।

পাটা কেশার থেকে গেলেন টারমিজ। সেখান থেকে ট্রেন ধরলেন মস্কোর জন্য। সঙ্গে ছিলেন ডঃ ওয়েলার নামে একজন জার্মান এন্‌জিনিয়ার।

রাশিয়াতে মাত্র পাঁচ ছয়দিন ছিলেন সুভাষচন্দ্র। রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোন সরকারী সাহায্য দিতে না পারলেও তাঁর আতিথেয়তার ত্রুটি করেননি। তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই করা হয়েছিল ঠিকমত।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি রাশিয়ার এই কূটনৈতিক ঔদাসিন্যের কারণও ছিল যথেষ্ট। তখন মস্কোতে নতুন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ক্রিপসের সঙ্গে আলোচনা চলছিল সোভিয়েত সরকারের। নাৎসীবাদী জার্মানিকে বিশ্বাস করতে পারছিল না রাশিয়া। বৃটিশের সঙ্গে মৈত্রী সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তাই তার ছিল না। সুভাষচন্দ্রকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিলে সে সম্ভাবনা পাছে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় এই ভয়েই তখন চুপ করে ছিল রাশিয়া সব জেনে শুনেও।

রাশিয়ায় জার্মান দূতাবাসের সামরিক গোয়েন্দা এক রিপোর্টে বলেন, রাশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিকে রুশ কর্তৃপক্ষ কোন সরকারী স্বীকৃতি না দিলেও তাঁর সেখানে থাকাকালে যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় তার জন্য সব ব্যবস্থাই তাঁরা করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি রাশিয়ার আগ্রহ ও সহানুভূতি ছিল অপরিসীম।

মস্কো থেকে বিমানে উঠলেন সুভাষচন্দ্র ২৮শে মার্চ। বার্লিন

পৌঁছলেন ৩রা এপ্রিল তারিখে। বার্লিনে তিনি সাদর অভ্যর্থনা পাবেন এ কথা জানতেন সুভাষচন্দ্র। ভারতে একটা বড় রকমের বিপ্লব হোক এটা অনেক আগে হতেই চাইছিল জার্মানি। কারণ তাহলে বৃটিশ সৈন্যের একটি বড় অংশ ব্যস্ত থাকবে সে বিপ্লব দমন করার জন্য।

কিন্তু কাবুলে জার্মান রাষ্ট্রদূত ঠিকমত বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা। বুঝতে পেরেছিলেন ইটালির রাষ্ট্রদূত। তিনি একটি রিপোর্টে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনার কথাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। অনেক কথার মধ্যে লেখেন,

বোসের প্রথম কাজ হবে ইউরোপের কোনখানে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করা ও তা ঘোষণা করা। তিনি আশা করেন, ইটালি, জার্মান ও জাপান সরকার অবিলম্বে স্বীকৃতি জানাবেন সে সরকারকে।

বোস মনে করেন, ভারতবর্ষ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। প্রাথমিক কাজ শুরু করার আগে অভাব শুধু সাহসের। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অহেতুক ও অত্যধিক ভীতিও কম অন্তরায় হয়ে ওঠেনি কাজের পথে। একবার যদি জার্মানি কিম্বা ইটালি, কিম্বা জাপান ভারত সীমান্তে গিয়ে দাঁড়াতে পারে তাহলে ভারতীয় সৈন্য ওদের পক্ষ ছেড়ে চলে আসবে। জনসাধারণ বিদ্রোহ করবে এবং ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান হবে অচিরে।

বোসকে আমরা জানি তাঁর কাজ থেকে। তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি যোগ্যতা ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য থেকে আমরা তাঁকে সহজেই বুঝতে পারি ভালভাবে। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বাস্তববাদী।

গত বৎসর আমরা একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ইংলণ্ডের পতন নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। তখন বোসের গুরুত্ব ছিল খুবই বেশী। তাঁর প্রস্তাবিত পন্থায় ভারতকে মুক্ত করা

খুবই সহজ ছিল। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রধানতম স্তম্ভ। গত বৎসরের সুযোগ আমরা হারিয়েছি। আবার তেমনি সুযোগ এবারও আসতে পারে আর তার সদ্ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের।

হিটলার ও মুসোলিনী দুজনেই যুদ্ধে তখন দারুণ ব্যস্ত। তখন ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে চলেছে যুদ্ধের বিভীষিকা। মুসোলিনী যেখানে ঘা খান হিটলার সেখানে ছুটে গিয়ে রক্ষা করেন তাঁকে।

যুদ্ধে শত ব্যস্ত থাকলেও সুভাষচন্দ্রের কাজের সব ব্যবস্থাই করে ছিলেন তিনি। তাঁর দেখাশোনার ভার দিলেন বৈদেশিক দপ্তরের দুজন বিশিষ্ট কর্মচারি এ্যাডাম ভনট্রট ও আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থের উপর।

তাঁরা দুজনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কি কি দরকার তা জেনে নিলেন। সুভাষচন্দ্রের দাবী হলো, তিনি কোন অজ্ঞাত বেতার কেন্দ্র হতে বৃটিশবিরোধী প্রচার কার্য চালাতে চান। তারপর তখন ১৯৪১ সালের এপ্রিলের শেষ। গত মার্চ মাসে জার্মানিতে এসে পৌঁছেছেন সুভাষচন্দ্র। হিটলার তখন রাশিয়া আক্রমণের সব ঠিক করে ফেলেছেন। আক্রমণ শুরু করবেন আগামী জুন মাসে। হিটলার জানেন, তাঁর শত্রু ইংলণ্ড বা আমেরিকা নয়; তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু, তাঁর লক্ষ্যের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো রাশিয়া। কারণ পূর্ব ইউরোপের ছোটখাটো ছিন্ন ভিন্ন দেশগুলিকে এক করে তাঁর অধীনে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চান হিটলার। কিন্তু ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু রাশিয়া নিশ্চয়ই এ কাজে বাধা দেবে তাঁকে। সুতরাং তার আগেই তাকে ঘায়েল করা দরকার।

এমন সময় তাঁর কাছে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করলেন সুভাষচন্দ্র। জার্মানির বৈদেশিক দপ্তরের বড় কর্তা রিবেনট্রপ ও সুনট্রট দুজনেই

সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন সুভাষচন্দ্রকে। তাঁর কথা মন দিয়ে শুনে হিটলারকে সে কথা বলেছেন।

হিটলার দেখলেন ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় সৈন্যরা মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র লড়াই করছে। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা সফল হলে তাঁর রাশিয়া জয়ও সার্থক হবে। তাই তিনি সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য যা কিছু দরকার তার সব ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। কিন্তু একটা জিনিস দিতে পারলেন না। সেটা হলো ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে অক্ষশক্তির তরফ থেকে একটি নিঃশর্ত ঘোষণা।

আপাতত তিনটি জিনিস চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। প্রথম কথা, তিনি ভারত হতে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করে বৃটিশ বিরোধী প্রচার চালিয়ে যেতে চান। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন অঞ্চলে অক্ষশক্তির হাতে যে সব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছে তাদের এনে শিখিয়ে পড়িয়ে একটি স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যসংস্থা বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে চান। তৃতীয়তঃ তিনি চান অক্ষশক্তির পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা।

কিন্তু তখন এই ধরনের কোন ঘোষণা করতে রাজী হলেন না হিটলার। হিটলারের পক্ষ থেকে রিবেনট্রপ কথাটা জানিয়ে দিলেন তাঁকে। জুন মাস পড়তেই ইটালি চলে গেলেন সুভাষচন্দ্র, মুসোলিনীও তখন যুদ্ধে ভীষণ ব্যস্ত। ইটালির সৈন্য কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে বেকায়দায় পড়েছে তখন। মুসোলিনীর জামাই ও বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী কাউন্ট সিয়ানো মুসোলিনীর পক্ষ থেকে স্রেফ জবাব দিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রথম দুটি প্রস্তাবে অবশ্য তাঁদের কারো কোন আপত্তি নেই।

ইটালি থেকে আবার জার্মানিতে ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র। ২২শে জুন তারিখে সোভিয়েত জার্মান চুক্তিভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করেছেন হিটলার। অনেকগুলি যুদ্ধ জয় করে দুর্বার হয়ে উঠেছে

তখন তাঁর সাহস আর উচ্চাশা। ওদিকে জাপানও চুপ করে বসে নেই। মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ শক্তিকে বিব্রত করে তুলেছে দারুণ ভাবে।

তখনও সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে আছেন অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা ছদ্মনাম ধারণ করে। তাঁর উপস্থিতি সরকারীভাবে ঘোষিত হয়নি তখনও।

ওদিকে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড রাশিয়াকে সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠাল। এতদিন পড়ে পড়ে মার খেয়েছে; বোমার আগুনে সারা দেশ জ্বলেছে; তবু কোন কথা বলেনি প্রতি আক্রমণের চেষ্টাও করেনি। এবার যেন হঠাৎ একটা সুযোগ পেয়ে গেল ইংলণ্ড। একের পর এক টেলিগ্রাম করে সাহায্যের প্রস্তাব পাঠাল।

স্টালিন বললেন, পশ্চিম অঞ্চলের ফ্রন্টে তোমরা শুধু পিছু হটছ কেন, যে কোন আক্রমণকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করো, সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করো।

ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ছিলেন ঘোর কমিউনিস্ট বিরোধী। তাঁর মত লোক রাশিয়াকে হঠাৎ কেন সাহায্য করতে চাইছেন তা বুঝতে পারল না অনেকেই। তাঁরই প্রাইভেট সেক্রেটারি কোনভিল একদিন কথাটা তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মত গোঁড়া কমিউনিস্ট বিরোধীর পক্ষে রাশিয়াকে সাহায্য ও সমর্থন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না?

চার্চিল উত্তর দিলেন, মোটেই না। এই মুহূর্তে আমার লক্ষ্য একটি, হিটলারের ধ্বংস। একাজ করতে পারলে আমি বেঁচে থাকব সহজভাবে। হিটলার যদি নরক আক্রমণ করে আমি নরকের দূতের কাছেও সমবেদনা জানাতে দ্বিধা বোধ করব না।

অবশেষে তাঁর প্রথম দুটি পরিকল্পনার কথা আরও ভেঙ্গে বললেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর পরিকল্পনা হলো জার্মানিতে একটি ফ্রী ইণ্ডিয়া সেণ্টার বা আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গড়ে তোলা। এই সঙ্ঘের অধীনে থাকবে একটি

পূর্ণাঙ্গ প্রচার বিভাগ। পরিকল্পনার প্রথম অংশই হলো প্রচার। একটি স্বতন্ত্র বেতারকেন্দ্র হতে বক্তৃতা হবে নানা ভাষায়। ভারতের উদ্দেশ্যে, ইংরিজি, বাংলা, হিন্দী এবং আরও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে ক্রমাগত। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদও পরিবেশিত হবে।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশটি হবে সামরিক ব্যবস্থা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেসব ভারতীয় ছড়িয়ে আছেন তাঁদের ও অক্ষশক্তির হাতে ধরা পড়া ভারতীয় সৈন্যদের একত্রিত করে একটি ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে হবে।

তখন ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও আরও কয়েকটি জায়গায় কিছু ভারতীয় ছিল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল ছাত্র, বাকি ছিল ব্যবসায়ী। অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটার জবানীতে তাদের সবার কাছে নিমন্ত্রণ পাঠালেন সুভাষচন্দ্র।

প্রথমে সেক্রেটারি হিসাবে পেলেন পুরনো বান্ধবী ফ্রলীন এমেলি শেঙ্কলকে। অস্ট্রিয়ার শেঙ্কলএর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয় অনেক আগে জার্মানির বাদগেষ্টাইন স্বাস্থ্য নিবাসে থাকবার সময়। ১৯৩৪ সালে সুভাষচন্দ্র যখন 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইখানি লেখেন তখন এ বিষয়ে তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেন এমেলি।

এমেলি এবার আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সব কাজ প্রথমে একাই করে যেতে লাগল। চিঠি লেখা, টাইপ করা, অতিথিদের সম্বর্ধনা, টেলিফোন ধরা সব কাজ নিজেই করে যায়। তবে এমেলি কিন্তু একা আসেনি, সঙ্গে এনেছিল পনের জন জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান ছেলেমেয়ে। এ ছাড়া কয়েকজন ভারতীয়ও এলেন সঙ্ঘে। তাঁদের নাম হলো, নাম্বিয়ার, গনপুলে, আবিদ হাসান, ডঃ গিরিজা মুখার্জি, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ডঃ সুলতান, এম, ভি, রাও, ডঃ মল্লিক ও কান্তারাম।

সঙ্ঘের প্রথম বৈঠক বসল ১৯৪১ সালে ২রা নভেম্বর। তখন থেকে সঙ্ঘের সভ্যদের পারস্পরিক অভ্যর্থনার নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়,

জয়হিন্দ। ভারতীয়দের জন্যে স্বদেশী মনোভাবের পরিচায়ক সম্ভাষণ হিসাবে জয় হিন্দের প্রচলনও এই সময় থেকেই হয়। কথায় কথায় ধ্বনি ওঠে, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ অর্থাৎ স্বাধীন ভারত দীর্ঘজীবী হোক। আর এক নতুন কথার সৃষ্টি করলেন সেদিন সঙ্ঘের সভ্যরা, সেটি হলো নেতাজী। তাঁদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র হলেন নেতাজী। সারা বিশ্বে এই নামেই অভিহিত হয়ে আসছেন তখন থেকে।

একটি গোপন বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলো ডিসেম্বর মাসে। স্বাধীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি গভীর ভাবে আলোচনা করবার জন্য একটি প্রাথমিক কমিটিও তৈরি হলো।

প্রাচ্যে জাপান যতই এগিয়ে চলেছে রাশিয়াতে জার্মানিও ততই যুদ্ধ জয় করে চলেছে। নেতাজী মনে করেন, জার্মানি রাশিয়া জয় করে উজবেকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাবে। তার আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা ভারতে ঢুকে বৃটিশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সব বানচাল করে দেবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের নৈতিক সাহস ও দেশপ্রেম দেখে ভারতীয় সৈন্যদের মাথা ঘুরে যাবে।

বিভিন্ন শিবির থেকে বাছাই করা যুদ্ধবন্দীদের বার্লিনের একটি শিবিরে আনার কাজ প্রথম শুরু হয় মে মাসে। তাদের সঙ্গে কথা বলে ও আলাপ করে প্রচুর উৎসাহ পেলেন নেতাজী। তখন জার্মান সেনানায়ক রোমেলের কাছে উত্তর আফ্রিকা ও মিশর হতে সমস্ত বন্দী সৈন্যদের আনবার জন্য অনুরোধ করলেন। আরও বললেন ভবিষ্যতে যে কোন ভারতীয় সৈন্যকে বন্দী করলেই যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

সমস্ত বন্দীদের ড্রেসডেনের কাছে আন্নাবুর্গ শিবিরে রাখা হলো। ইটালি থেকেও অনেক যুদ্ধবন্দীদের পাঠানো হলো এই শিবিরে।

অবশ্য বন্দী বৃটিশ সৈন্যদের সরিয়ে দেয়া হলো। তাদের কোন দরকার নেই এ ব্যাপারে।

ডিসেম্বর মাসে নিজে গিয়ে শিবির পরিদর্শন করলেন নেতাজী। তাঁর কথাগুলি দোভাষীর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হলো বন্দীদের। প্রথমে কয়েকজন কয়েকটি প্রশ্ন করল তাঁকে, যেমন জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের সম্পর্ক কি হবে, তাদের পদমর্যাদা কি হবে। এই সব কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চাইল তারা। কিন্তু নেতাজী কোন উত্তর দিলেন না কাউকে। কারণ এ দরকষাকষির ব্যাপার নয়। দেশকে যারা ভালবাসে, দেশকে যারা সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন থেকে উদ্ধার করতে চায় তারাই এগিয়ে আসবে বিনা শর্তে।

এলও তাই অনেকে। কোনরূপ শর্ত আরোপ না করেই এগিয়ে এল অনেকে। ভারতের এক মহান নেতা হিসাবে অকুণ্ঠভাবে মেনে নিল নেতাজীকে। এইভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে আজাদ হিন্দ ফৌজ।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর জন্য একটি প্রতীক চিহ্ন বার করলেন নেতাজী। ঝাঁপিয়ে পড়া একটি বাঘের ছবি। এই ছবিটি থাকত পতাকায় ও মাথার টুপিতে। যতবার সৈন্যদের সামনে বক্তৃতা দিতে যেতেন, ততবারই শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘের যুদ্ধোদ্যমের কথাটি মনে করিয়ে দিতেন। মনে করিয়ে দিতেন স্বাধীনতা কেউ দেয় না, আদায় করে নিতে হয়। স্বাধীনতা কেউ কখনও হিসাবেও পায় না, কারণ সব দানের পিছনেই থাকে স্বার্থের বন্ধন।

এদিকে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাপান আমেরিকার বিশাল সুরক্ষিত নৌঘাটি পার্ল হারবার আক্রমণ করতেই পরদিন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকা। তার পুরনো বন্ধু ইংলণ্ডকে বাঁচানোও তার অন্যতম কর্তব্য। তাছাড়া ১৯৪০ সালের ২৭শে

সেপ্টেম্বর জার্মানি, ইটালি ও জাপান এই তিন দেশ মিলে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর থেকে জার্মানি ও জাপান যেভাবে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাকে গ্রাস করতে চাইছে তা কোনরূপে আর বরদাস্ত করতে পারা যায় না। তাই তার প্রভূত ধনবল ও জনবল নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমেরিকা।

রাশিয়া সাম্যবাদী দেশ। সাম্যবাদ পছন্দ করে না আমেরিকা, তবু জাপান ও জার্মানির ক্রমবর্ধমান শক্তি ও রাজ্যলিপ্সাকে খর্ব করার জন্যই রাশিয়াকেও সাহায্য করতে চাইল আমেরিকা।

পার্ল হারবার জয়ের পরই জাপান একে একে জয় করে বসল হংকং মালয় ও ফিলিপাইন। কিন্তু জাপান যতই জয়ের পর জয় করে চলুক, আমেরিকা ইংলণ্ড ও রাশিয়ার পাশে এসে দাঁড়াতেই বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। চার্চিল খুশি হয়ে বললেন, আমরা জিতে গেছি, আর ভয় নেই।

॥ একুশ ॥

বাছাই করা ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম দুটি দল গড়ে উঠল ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে।

তখন নেতাজী থাকতেন বার্লিনে সোভিয়েত সত্রানেতে। ওইখানেই ছিল আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের কার্যালয়। পঁয়ত্রিশজন ভারতীয় ছাত্র কাজ করত। সঙ্ঘের কাজ ছিল প্রচুর। তখন আজাদ হিন্দ রেডিও, জাতীয় কংগ্রেস রেডিও ও আজাদ-মুসলিম রেডিও নামে তিনটি বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আজাদ হিন্দ নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

সঙ্ঘের কাজ ছিল এইসব বেতারে ও পত্রিকায় যা কিছু প্রচারিত হবে তা সব সম্পাদনা করা। এ ছাড়াও জার্মানি ও পূর্ব ইউরোপে

যে সব ভারতীয় থাকত তাদের দেখাশোনা করতে হত। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় আলোচনার জন্য সভা আহ্বানও করতে হত সঙ্ঘকে।

এই সময় সঙ্ঘের কাজকর্মের ব্যাপারে নেতাজীর ডানহাত ছিলেন নাম্বিয়ার। সাংবাদিকতার কাজে আঠারো বছর কাটিয়েছেন নাম্বিয়ার। ফ্রান্সে থাকার সময় হঠাৎ নেতাজীর সংস্পর্শে আসেন আর সেই থেকেই ঢুকে যান আজাদ হিন্দে।

এম, আর, ব্যাস বেতার প্রচারের কাজগুলি দেখতেন। গনপুলে ছিলেন নাম্বিয়ারের সহকারী। নেতাজী বলতেন, আমার অবর্তমানে নাম্বিয়ারই সব দেখাশোনা করবে। গনপুলে আগে ছিলেন বোম্বাই কংগ্রেসের একজন সদস্য। অনেকদিন হতে জার্মানিতে বাস করছিলেন। এমন সময় এল নেতাজীর ডাক।

১৯৪২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র হতে প্রথম ভাষণ দান করেন নেতাজী। তিনি বলেন, নীরবে এবং ধৈর্যসহকারে বহুদিন প্রতীক্ষা করে এসেছি আমি; পর্যবেক্ষণ করে এসেছি ঘটনার গতিপ্রকৃতি। এখন উপযুক্ত সময় এসেছে দেখে আমি বেরিয়ে এসে কথা বলছি।

এই সংগ্রামে এবং তার পরবর্তীকালে পুনর্গঠনের সময় আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করে যাব যারা আমাদের সাধারণ শত্রুকে ধ্বংস করতে সাহায্য করবে আমাদের।

বৃটিশই হচ্ছে ভারতের চিরশত্রু। বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আজ ভারতের আনন্দের দিন। কোন কোন ভারতবাসী বৃটিশকে সমর্থন করতে পারে, কিন্তু ভারতের বেশীর ভাগ লোকই সংগ্রাম করে থাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

এই সঙ্গে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের তরফ থেকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন নেতাজী। হিটলারের সহকারী গোয়েবেলস তাতে

বিশেষ খুশি হন। কারণ এর আগে নেতাজী যখন জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন তখন তাঁকে অনেক সরকারী বড়কর্তারা সন্দেহের চোখে দেখেছিল। ভেবেছিল, বলা যায় না বৃটিশের চরও হতে পারে।

কিন্তু আজ সে সংশয় কেটে গেল নিশ্চিতভাবে। আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে জার্মানির নির্ভরযোগ্য বন্ধু এ বিষয়ে কোন সন্দেহই আর রইল না। কিন্তু তবু গোয়েবেলস বললেন, এখনও সময় আসেনি। এখন সরকারী ভাবে আমরা ভারতীয় জনগণকে বিপ্লবের জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারি না।

সে যাই হোক, ১৩ই মার্চ তারিখে তাঁর দ্বিতীয় ভাষণে ভারতে ক্রিপস মিশনের উল্লেখ করলেন নেতাজী। তিনি বললেন, এই মিশন একেবারে অর্থহীন। ক্রিপসের মত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও উদারপন্থী লোক কেন যে একাজ করলেন তা বুঝতে পারা যায় না। এটা ভারতের পক্ষে অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাপানের টোকিওতে বসে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুও ক্রিপস মিশনের বিরুদ্ধে এই একই ধরনের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বার্লিন ও টোকিওর অনেকেই মনে করলেন এই প্রচারই হলো ভারতে ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। ১২ই এপ্রিল তারিখে ব্যর্থ হয়ে ভারত হতে বিদায় নেন ক্রিপস। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় কোন ফল হয়নি।

তার আগে চীনের মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও তাঁর স্ত্রী এসে ছিলেন ভারতে বেড়াতে। এসেছিলেন বৃটিশের হয়ে দৌত্যগিরি করতে। কিন্তু গান্ধীজী তাঁদের কথা শোনেননি। একমাত্র জওহরলালই তাঁদের সব কথায় সায় দিয়ে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন।

একমাত্র জওহরলালই ক্রিপসকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, জাপানকে আমরা রুখবই। The Japanese must be resisted. We are not going to surrender to the invader.

Inspite of all that has happened, we are not going to embarrass the British war effort in India.

ভারতে বৃটিশের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে কোনক্রমেই ব্যাহত হতে দেব না আমরা।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তখন দেখলেন, ভারতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র জওহরলালই খাঁটি বৃটিশ বন্ধু। দুঃখ করে আরও বলেছিলেন, নেহেরুকে সমর্থন করবার দ্বিতীয় লোক নেই। তিনি একা।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পর্যন্ত চার্চিলের উপর চাপ দিতে থাকেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য। ১২ই এপ্রিল এক চিঠিতে চার্চিলকে লিখলেন, বর্তমান অচল অবস্থার জন্য বৃটিশ সরকারই দায়ী, The deadlock has been due to the British Government's unwillingness to concede the right of self Government to the Indians.

ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখে ভুল করেছে বৃটিশ।

কিন্তু কথাটা এড়িয়ে গেলেন চার্চিল।

মৌলানা আজাদ তাঁর 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম' গ্রন্থে লিখেছেন, গান্ধীজী যখন সরাসরি ক্রিপসকে জানিয়ে দেন আলোচনা করে লাভ নেই, তিনি শুধু একটা কথাই বলতেন আর সেটা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা—তখন বৃটিশবন্ধু জওহরলাল বিচলিত হয়ে ওঠেন বিশেষ ভাবে। ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যই চেয়ে থাকেন গান্ধীজীর মুখপানে। কারো কিছু বলার নেই। গান্ধীজীর কথাই তাঁদের সকলের প্রাণের কথা। কিন্তু একা জওহরলালই প্রতিবাদে গুমরে ওঠেন ভিতরে ভিতরে।

এই সময় হঠাৎ একদিন বৃটিশ সরকার একটি মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে। ঘোষণা করে, বার্লিন থেকে টোকিও যাবার পথে

বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বোস মারা গেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি।

কথাটা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত শোনাল দেশবাসীর কাছে। শোকের নিবিড় আঁধার নেমে এল সারা ভারতের বুকে। বৃটিশের ভয়ে শোকের কথা সবাই মুখে প্রকাশ করতে না পারলেও প্রায় সবার চোখে মুখে ফুটে উঠল বিষাদের কালো ছায়া।

গান্ধীজী সান্ত্বনা জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন সুভাষের মার কাছে কলকাতায়। মা বললেন, আমি ও কথা বিশ্বাস করি না। সুভাষ মরতে পারে না।

পরে জানা গেল খবরটি একেবারে মিথ্যা। সুভাষের মৃত্যুতে দেশে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্যই এ খবর প্রচার করেছিল বৃটিশ।

এদিকে জাপান এক প্রস্তাব করল অক্ষশক্তির কাছে। প্রস্তাবে বলল, সুভাষচন্দ্রকে ডেকে তার সঙ্গে আলোচনা করে ভারত সম্পর্কে ত্রিপাক্ষিক এক ঘোষণা প্রচার করা হোক।

তখন এপ্রিল মাস। হিটলার ও মুসোলিনী এক জায়গায় মিলিত হয়ে জাপানের এই প্রস্তাবটি আলোচনা করে দেখলেন। পরে তাঁরা একমত হয়ে বললেন, সে সময় এখনও আসেনি।

নেতাজী তখন ছিলেন রোমে। তিনি একদিন মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কথা বুঝিয়ে বললেন। তাঁর যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না মুসোলিনী। তিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে এক ত্রিপাক্ষিক ঘোষণা প্রচারে সম্মত হলেন এবং একথা জার্মানিকে তারযোগে জানিয়ে দিলেন।

১১ই মে তারিখে জানা গেল জার্মানির প্রতিক্রিয়া। গোয়েবেলস বললেন, আমরা এ ধারণাটাকে খুব পছন্দ করতে পারছি না। আমরা মনে করি না এ ধরনের রাজনৈতিক চাল খেলার সময় এখনই এসেছে যদিও জাপান সত্যি সত্যিই এটা চায়। তবে অবশ্য এই

অস্থায়ী সরকার বেশীদিন এভাবে শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না। সত্যি সত্যিই সরকারের পিছনে যদি কোন বাস্তব সমর্থনের ভিত্তিভূমি না থাকে তাহলে তার অস্তিত্ব একমাত্র সীমাবদ্ধ থাকে শুধু তত্ত্বের জগতে।

জার্মানির এই দ্বিধা এই দোদুল্যমানতার অর্থ কিছুতেই বুঝতে পারলেন না নেতাজী। জাপানের কাছ থেকে বাস্তব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, জাপান তাঁর কথা সত্যিই বুঝতে পেরেছে, তবু এখনই সেখানে যেতে পারছেন না তিনি। তাছাড়া অক্ষশক্তির অন্য দুটি দেশ অর্থাৎ জার্মানি আর ইটালির মত না নিয়ে জাপান কিছু করতে পারে না।

তবু ২৯শে মে হিটলারের সঙ্গে একবার দেখা করলেন নেতাজী। ভারতে তাঁর যে জনপ্রিয়তা আছে তাই দিয়েই তিনি বাইরে বিদেশ থেকেই বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন ভারতবাসীকে। এখনকার মত আর কখনও বিপ্লবের এমন পরিস্থিতি আসেনি ভারতে। বাইরে থেকে শুধু একটু ধাক্কা দিলেই হলো।

হিটলার বললেন, বিপ্লব করেই বা কি হবে। মাত্র কয়েক হাজার সশস্ত্র সৈন্য লক্ষ লক্ষ অস্ত্রহীন বিপ্লবীদের অনায়াসে দমন করতে পারে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইরের কোন শক্তি তাকে সাহায্য করছে ততক্ষণ সেখানে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে জার্মানি তা পারছে না। জাপানেরও অবস্থা সঙ্গীন হয়ে আসছে ক্রমশঃ।

যে ঘরে কথা হচ্ছিল সে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল পৃথিবীর একখানি বড় মানচিত্র। সে মানমিত্রের সামনে গিয়ে হিটলার নেতাজীকে বললেন, রাশিয়ার কোন জায়গায় জার্মানি রয়েছে আর কোথায় ভারতবর্ষ। এ অবস্থায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু ঘোষণা করা হবে বোকামি। দুনিয়ার লোক মনে করবে হিটলারের এ কাজ করা উচিত হয়নি। হিটলার বরং মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে,

কারণ রোমেল সেখানে সে ঘোষণা কার্যকরী করতে পারে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কিছু ঘোষণা করার মত অবস্থা এখনও আসেনি।

ঘরের মধ্যে দারুণ একটা অস্বস্তি অনুভব করছিলেন সুভাষ। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ত্রিপক্ষীয় অক্ষশক্তির কোন ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না মনে। এতদিন তিনি কোথায় আছেন, কি করছেন, কেউ জানত না। কিন্তু এবার তিনি যে জার্মানিতে আছেন এবং হিটলারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে এটা ঘোষণা করেছে জার্মানি। অথচ তাঁর কোন ক্ষমতা বা পদমর্যাদা নেই। তিনি যে মহান কাজের জন্য এসেছেন এবং চেষ্টা করে চলেছেন তারও কোন স্বীকৃতি নেই।

মাঝে মাঝে দেশের কথা মনে হয় নেতাজীর। এক একবার একথাও মনে হয় যে তিনি হয়ত ভুল করেছেন দেশ ছেড়ে এসে। দেশে যে সংগ্রাম ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে সে সংগ্রামে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন সেখানে আজ থাকলে। কিন্তু এখানে তিনি একরকম চুপচাপ বসে আছেন। কাজের কাজ কিছুই করতে পারছেন না। তাঁর ক্ষমতা এখন খুবই সীমাবদ্ধ। জার্মান সরকার তাঁকে এখনও সন্দেহের চোখে দেখে। পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। অথচ যাবারও উপায় নেই।

এখন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজারের মত। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধবন্দীরা এসে গেছে। রোম ও ফ্রান্সে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের শাখা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপান মালয় অভিযানের চেষ্টা করতে শুরু করেছে।

ব্যাঙ্ককে দূর প্রাচ্যের বৃটিশ বিরোধী প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন বসছে। সেখান থেকে এল নিমন্ত্রণ। জাপানের অধীনে তিনি দূর প্রাচ্যে ভারতীয়দের নেতৃত্ব করতে পারেন। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে

এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু তার আগে ইউরোপে যা করছেন তা সম্পন্ন করা দরকার। ইউরোপে আজাদ হিন্দ সংগঠনের যে কাজ শুরু হয়েছে সে কাজ এখন ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। এখনও একবছর থাকতে হবে।

দূরপ্রাচ্যে এখন যাওয়া সম্ভব নয় বলেই এক বাণী পাঠিয়ে দিলেন নেতাজী। সেই বাণীতে বললেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অখণ্ড। পৃথিবীর যেখানে যত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আছে তাদের সবাইকে একত্র করে, এক মিলিত সংগঠন গড়ে তোলার সময় এসেছে।

দূর প্রাচ্যের ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গেলেন না নেতাজী তবু তাঁর নাম সমস্ত প্রতিনিধিদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। তাঁরা সকলেই চান তাঁর নেতৃত্ব।

এটাও একটা কম আশার কথা নয়। কালো মেঘের প্রান্তে এক রূপোলী রেখার মত নেতাজীর চোখের সামনে জ্বল জ্বল করতে লাগল আশাটা। ইউরোপে আজাদ সংগঠন ও ফৌজকে জোরদার করে তিনি যাবেন দূরপ্রাচ্যে। সেখানে গিয়ে গড়ে তুলবেন এক বিরাট বাহিনী। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবেন ভারতের দিকে। মুক্ত করবেন তাঁর স্বপ্নের শৃংখলিত ভারতকে।

আজাদ হিন্দ রেডিওর মাধ্যমে ভারতের উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ চলতে লাগল ক্রমাগত। নেতাজী প্রায়ই বলতেন, ভারতে কি ঘটছে না ঘটছে আমি সব খবর রাখি। ভারতে আমাদের লোক ছড়িয়ে আছে। প্যারাসুটে করে আমাদের লোক নামবে।

কৃষকদের বলতেন, আমাদের লোক নামলে তোমরা সাহায্য করবে।

ভারতের সৈন্য ও পুলিশদের বলতেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তোমরা যদি যোগ না দাও বা সাহায্য না করো

তাহলে স্বাধীন ভারতে একদিন তোমাদের বৃটিশকে সমর্থন বা সাহায্য করার অপরাধে সরকারী কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

এদিকে ভারতে রাজনৈতিক অবস্থা তখন চূড়ান্ত বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ায় আপোষের শেষ আশাটুকু মুছে গেছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে একমাত্র নেহেরু ছাড়া বাকি সব সদস্যেরই বৃটিশ সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটেছে।

ক্রিপস ভারত থেকে চলে গেলে ২৭শে এপ্রিল তারিখে এলাহাবাদে কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক সমিতিতে ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়, ভারতে অন্য কোন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করলেও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবে কংগ্রেস।

বিখ্যাত 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ৬ই জুলাই তারিখে। ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিতে গৃহীত এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়, ভারতে অবিলম্বে বৃটিশ শাসনের অবসান চাই।

আরও বলা হয়, এ কথায় কান না দিলে এতদিনের অর্জিত অহিংস শক্তি কাজে লাগানো হবে।

গান্ধীজী বললেন, এ প্রস্তাব প্রকাশ্য বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু নেতাজী মনে করেন তাঁর নীতির সঙ্গে এ প্রস্তাবের অনেক ফারাক।

কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক সমিতিতে ঠিক হয় আগামী ৭ই আগস্ট বোম্বাইএ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসবে। ঐ অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবটি পেশ করা হবে। তার আগে ৪ঠা আগস্ট আর একবার আলোচনা করে দেখা হবে।

বৃটিশ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা বলতে লাগলেন, ভারতে কংগ্রেস নেতারা জনগণকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করছেন।

৪ঠা আগস্ট কার্য নির্বাহক সমিতি তার ভারত ছাড় প্রস্তাবটিই

বহাল রাখল তবে তার সঙ্গে একটা কথা জুড়ে দিয়ে বলল, ভারত স্বাধীনতা পেলে স্বাধীন ভারত তার সমস্ত শক্তি ও সম্পদ বৃটিশের পক্ষে যুদ্ধে নিয়োগ করবে।

সে যাই হোক, ৭ই আগস্ট বোম্বাইএ নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন বসল, তার পরদিন অর্থাৎ ৮ই তারিখে ২টা ৪৫ মিনিটে ওয়ার্কিং কমিটির ভারত ছাড় প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে গৃহীত হলো। শুধু কমিউনিস্টরা ও রাজাগোপালাচারীর সমর্থকরা ভোট দেননি। এই প্রস্তাবের কথা ঘোষণার পর মহাত্মা গান্ধী নব্বই মিনিট ধরে বক্তৃতা করে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে আমায় একা দাঁড়াতে হলেও আমি সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

অধিবেশন শেষ হতে রাত্রি হয়ে গেল। গৃহীত প্রস্তাবটিতে বলা হলো, ভারতের মঙ্গল ও জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতে বৃটিশ শাসনের আশু অবসান চাই। কমিটি বিশেষ আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে রুশীয় ও চীন রণাঙ্গনগুলিতে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে এবং সেই সঙ্গে তাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের বীরত্বের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান একটি বিশেষ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ এরই উপর নির্ভর করছে বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সাফল্য। নাজীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীন ভারত তার সব শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করবে।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করে জওহরলাল নেহেরু বলেন, আমরা এখন এমনই এক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি যা থেকে পিছিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। কংগ্রেস এখন এক বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। হয় সে স্বাধীনতা নিয়ে উঠে আসবে না হয়ত চিরদিনের মত ডুবে যাবে।

প্রস্তাবটি জওহরলাল নিজে উত্থাপন করলেও তাঁর ভাষণের মধ্যে একটি চাপা কুণ্ঠা মাঝে মাঝে ফুটে বেরিয়ে পড়ে তাঁর ভাষণে। মনে হয় এই চরম পথ কংগ্রেস বৃটিশের বিরুদ্ধে অবলম্বন করুক এটা তিনি চাননি। কিন্তু না চাইলেও আর সকলের চাপে পড়ে তা মেনে নিতে হয়েছে তাঁকে।

মৌলানা আজাদ প্রস্তাবকে সমর্থন করে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'ভারত ছাড়' ধ্বনির অর্থ হলো ভারত চায় ভারতীয় জনগণের উপর পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর। তার বেশীও না, কমও নয়।

ভারত ছাড় প্রস্তাব পাশ হওয়ার কথা শুনে ক্ষেপে ওঠে বৃটিশ সরকার। চার্চিল রেগে বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলে করবার জন্য রাজার প্রধান মন্ত্রীত্ব আমি গ্রহণ করিনি।

প্রস্তাবের মধ্যে এই কড়া সুর নেহেরুর মত গান্ধীজীও চাননি। চাননি বলেই হয়ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসার আগে অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটিতে ভারত ছাড় প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর বড়লাটের কাছে একজন দূত পাঠান গান্ধীজী। বড়লাটকে বোঝাবার চেষ্টা করেন আসলে যাকে বিপ্লব বলে এ বিপ্লব সে বিপ্লব নয়। তবু কিন্তু বড়লাট রাগ করে গান্ধীজীর দূতের সঙ্গে দেখা করেননি। অবশেষে গান্ধীজীর আদেশে তাঁর সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই এক বিবৃতি দেন যে, গান্ধীজী বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অহিংস বিপ্লব শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা ঠিক নয়।

সে যাই হোক, গান্ধীজী অবশ্য পরে মত পাল্টেছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নব্বই মিনিট ধরে এক দীর্ঘ বক্তৃতায় ভারত ছাড় প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন, যদি তোমরা স্বরাজ ও স্বাধীনতা চাও, যদি তোমরা বোঝ যে আমি যা বলছি তা ঠিক তাহলে তা গ্রহণ করো।

৮ই আগস্টের রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস নেতাদের

গ্রেপ্তার করে সরকার। নেতারা গ্রেপ্তার হলেও বিপ্লব কিন্তু শুরু হয়ে যায়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বিপ্লবে।

এই দিনটির জন্য মনে মনে কত প্রতীক্ষা করেছেন নেতাজী। গত মে মাসে ভারতবর্ষ ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য আজাদ হিন্দ রেডিও মারফৎ এক ভাষণ দান করেন নেতাজী। ভাষণে বলেন,

আমার বোনেরা আর ভাইরা, ইংরেজের জঘন্য প্রস্তাব তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছ। সাবাস।

কিন্তু তোমাদের মধ্যে আজও কয়েকজন লোক আছে যারা নিজেদের কংগ্রেসের সভ্য বলে পরিচয় দেয়। তারা কিন্তু এর পরও ইংরেজদের সঙ্গে শর্তাধীন সহযোগিতার কথা ভাবছে। এরা কংগ্রেসের আদর্শ ভুলে গেছে।

ইংরেজের আজকের এবং অদূর ভবিষ্যতের সমস্ত প্রচার কৌশল সত্ত্বেও প্রতিটি চিন্তাশীল ও বিজ্ঞ ভারতবাসীর মনে দিনের আলোর মত একটি কথা স্পষ্ট হয়েছে,—ভারতের শত্রু মাত্র একটি, যে শত্রু একশো বছরেরও বেশী ভারতকে হিংস্রভাবে শোষণ করে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলেছে। শুষে নিয়েছে তার সব রক্ত। সে শত্রু সেই একমাত্র শত্রু আর কেউ নয়—ইংরেজ।

আমি অক্ষশক্তির সমর্থক নই। কিম্বা ওদের সমর্থন করা আমার পেশাও নয়। ওকাজ ওরা নিজেরাই করবে আর তা করবার ক্ষমতাও ওদের আছে যথেষ্ট। আমার মাথাব্যথা একমাত্র ভারতবর্ষ আর তার মুক্তির জন্য। ইংরেজের পরাজয় মানে ভারতের মুক্তি। পক্ষান্তরে ইংরেজ যদি এবারও জিতে যায়—যদিও সে সম্ভাবনা সুদূর পরাহত,অনাগত বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষের পরাধীনতা অনড় হয়ে থাকবে তার বুক চেপে। দুটো পথ ভারতের সামনে আজ প্রসারিত—স্বাধীনতা আর পরাধীনতার পথ। একটা তাকে বেছে নিতেই হবে।

বন্ধুগণ, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, কী অপূর্ব কৌশলে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইএর নাম করে ইংরেজ ভারতবর্ষে আমেরিকার অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে। আমেরিকার কূটনীতিবিদ, বণিক আর সৈনিক ভারতের রক্তের উপর বেশ জাঁকিয়ে বসে গিয়েছে। এর যদি এখন প্রতিকার না হয়, আর একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদ শেকড় গেড়ে বসবে ভারতের মাটিতে।

ভারতে যখন চলছে আগস্ট বিপ্লব, নেতাজী তখন জার্মানিতে বসে দিন গণছেন জাপান যাবার। কিভাবে দূরপ্রাচ্যে গিয়ে বিশাল আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করা যায় তা গত জুলাই মাস থেকেই ভাবছেন তিনি।

কোন স্থলপথ তার জন্য খোলা নেই। বিমানে তাঁকে পাঠানোও সম্ভব নয়। ইটালিকে একবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ইটালি জবাব দিল। তখন দেখা গেল, সাবমেরিন বা কোন ডুবো জাহাজে করে তাঁকে জাপান যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যদি সব হয়ে যায় তাহলে তাতে কোন আপত্তি নেই নেতাজীর।

তাঁর জাপানী বন্ধু কর্ণেল ইয়ামামাতোকে কথাটা বলে ফেললেন নেতাজী। ইয়ামামাতো সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিলেন, তিনি বাড়ি গিয়ে এর সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন নেতাজী। কিন্তু শুধু চুপ করে বসে রইলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইউরোপে আজাদ হিন্দের কাজ কেমন করে চালিয়ে যাবেন তাঁর সহকারী নাম্বিয়ার তা বোঝাতে লাগলেন। ইউরোপে আরও আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের শাখা খুলতে হবে। আরও বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভারতীয়দের জার্মানির আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। নৌ ও বিমান সম্বন্ধেও অনেক কিছু শিখতে হবে।

জার্মানিতে জাপানের রাষ্ট্রদূত ওসিমার সঙ্গে দেখা করলেন নেতাজী। কর্ণেল ইয়ামামাতো ওসিমারই সামরিক উপদেষ্টা ও সংবাদদাতা। এর আগেও একবার ১৯৪১ সালে ব্রহ্মদেশের পতনের পরেই জাপানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন নেতাজী এই দূতাবাসে এসে।

কিন্তু পরে জাপান থেকে উত্তর এসেছিল, এখন তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এখানে একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী রয়েছেন। আবার একজন কেন ?

জাপান তখন বলেছিল বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথা। এরপর ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুরের পতনের পরও জাপান যাবার কথাটা আবার তোলেন নেতাজী। তখনও জাপান মত দেয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের সহকারী সিনহিগুইতি একটা বড় উপকার করলেন কথায় কথায়। হঠাৎ নেতাজীকে বলে বসলেন, আচ্ছা আপনি রাসবিহারী বোসকে জানেন না ?

নেতাজী বললেন, না, কিন্তু তাঁর কথা আমি জানি। তিনি দীর্ঘদিন জাপানে থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন। আর এইটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা মিস্টার রাসবিহারী বোসের অধীনে সামান্য সৈনিকের কাজ করারও যদি সুযোগ পাই, তবে তাই যথেষ্ট মনে করব। মোট কথা, আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা।

সবশেষে অনুরোধের সুরে বললেন, আমার যাওয়াটা একটু তাড়াতাড়ি করা যায় না ?

রাষ্ট্রদূত যথারীতি খবর পাঠিয়েছিলেন জাপানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, পাঠাও। নিশ্চয়ই পাঠাবে। তবে তাঁর নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে সবচেয়ে আগে। ওঁর জীবন অমূল্য। যদি নিরাপদে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পার ত পাঠাও।

ডিসেম্বরটা নেতাজী কাটালেন ভিয়েনায়। কাটালেন নিশ্চিন্ত

হয়ে। কারণ তখন যাওয়ার অনুমতি এসে গেছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হচ্ছে।

অনেকের মতে নেতাজী এই সময় ভিয়েনায় তাঁর স্ত্রী এমেলি শেঙ্কলের বাড়িতে কাটান। ১৯৩৪ সালে জার্মানিতে শরীর সারাতে গিয়ে এমেলির সঙ্গে যে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় সেই পরিচয় ও বন্ধুত্ব পরে নাকি প্রণয় ও পরিণয়ে পরিণত হয়। ১৯৪১ সালে জার্মানিতে আজাদ হিন্দ কেন্দ্র স্থাপিত হলে এমেলি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে সেক্রেটারির কাজ করতে থাকেন।

অনেকে বলেন, ১৯৪২ সালের শেষ থেকে নেতাজীর সঙ্গে স্ত্রীরূপে বাস করতে থাকেন এমেলি। কিন্তু নেতাজীর অনুরোধেই তাঁদের এই দাম্পত্য সম্পর্কের কথা গোপন রাখে জার্মান সরকার। ১৯৪২ সালের জুলাই মাস থেকে এমেলিকে অব্যাহতি দেওয়া হয় সেক্রেটারির কাজ থেকে এবং সেপ্টেম্বর মাসে তিনি নেতাজীর এক কন্যাসন্তানের জননী হন। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময়টা ভিয়েনাতে তাঁর স্ত্রী ও শিশুকন্যা অনীতাকে নিয়ে কাটান নেতাজী।

নেতাজীর এই বিয়ের ঘটনাটি জার্মান সরকার কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। নেতাজী নিজেও কখনও তা স্বীকার করেননি কোন উক্তিতে। অনেকে বলেন, জার্মানি থেকে দূরপ্রাচ্যে যাবার আগে নেতাজী তাঁর বিয়ের কথাটি ভারতে তাঁর মার কাছে একটি চিঠি লিখে জানান। কিন্তু সে চিঠিখানি যে কোন কারণেই হোক কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং আমরা তা দেখিনি।

॥ বাইশ ॥

১৯৪৩ সাল।

নতুন বছর পড়তেই ভিয়েনা থেকে বার্লিনে চলে এলেন নেতাজী। ভিয়েনায় গিয়েছিলেন কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা করতে। এদিকে এখানে আবার যাবার প্রস্তুতি আছে। হিটলারের সঙ্গে একবার দেখাও করতে হবে এজন্য।

সেবার বার্লিনে বসেই ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করলেন নেতাজী। এই উপলক্ষে এক ভোজসভার আয়োজন করা হলো। ছয়শো অতিথি যোগদান করলেন সে সভায়। তাঁরা স্বাস্থ্যপান করলেন নেতাজীর।

তখন যাওয়ার ব্যবস্থা সব ঠিক। কিন্তু একেবারে গোপন রাখা হলো কথাটা। একমাত্র তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী নাম্বিয়ার ছাড়া আর কাউকে কিছু বলা হলো না। আরও দুই একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন নেতাজী। কিন্তু যাওয়ার কোন উপায় নেই।

শুধু বলা হলো নেতাজী বোস যাচ্ছেন দীর্ঘ ভ্রমণে। তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজ করবেন নাম্বিয়ার।

জানুয়ারি মাসেই জার্মানির জাপানী রাষ্ট্রদূত এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। তাতে এসেছিলেন কয়েকজন বিশ্বস্ত জার্মান সরকারের কর্মচারী, সিরিয়ার বিশপ, ইরাকের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, আর আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত। নেতাজী এসেছিলেন নাম্বিয়ারকে সঙ্গে করে।

একে একে অন্য সবাই চলে গেলেও নেতাজী রয়ে গেলেন। কথা বলতে লাগলেন সহকারী রাষ্ট্রদূত সিনহিগুইতির সঙ্গে। রাষ্ট্রদূত ওসিমা তখনও ফেরেননি জাপান থেকে।

নেতাজী বললেন, আমি জানি, আমার যাত্রাপথ খুব বেশী আরামের হবে না কিন্তু আমি এ কথাও জানি যে, নিরাপদে আমি পৌঁছেও যাব। আমার বন্ধুদের এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু তা সম্ভব হবে কেমন করে? তার উপায় কোথায়? এরা সব রইল এখানে। এদের আর এদের সংকল্পের প্রতিনিধি হয়ে একাই যাচ্ছি আমি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আমাদের একমাত্র কামনা। যদি পথে আমার কিছু ঘটে, আমার সংকল্পের কথা মিস্টার রাসবিহারী বোসকে জানাবেন। আর একথাও জানাবেন যে, তাঁর ব্রত সার্থক হোক, এই আমার কামনা রইল। আমার যাবার পর নাম্বিয়ার থাকবেন আমার প্রতিনিধি হয়ে। এখানকার কাজকর্ম তিনিই পরিচালনা করবেন।

সিনহিগুইতি বললেন, মিস্টার ইয়ামামাতো এশিয়ায় আপনার জন্য এখনও প্রতীক্ষা করছেন। তিনিই আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবেন।

হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কিছুটা মুস্কিলে পড়লেন নেতাজী। তাঁকে যেতে দেবার মত ছিল না হিটলারের।

কিছুদিন হতেই যুদ্ধের অবস্থা ভাল বুঝছিলেন না হিটলার। তাঁর রাশিয়া অভিযান উচিত কাজ হয়নি। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কতখানি সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তা তিনি ধারণা করতে পারেননি। তাছাড়া তিনি নিজেই জানতেন একই সঙ্গে দুটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা উচিত হবে না জার্মানির পক্ষে। জার্মান জাতির অন্যতম স্রষ্টা যুদ্ধবিশারদ বিস্‌মার্ক একথা নিষেধ করে গিয়েছিলেন। তবু একথা জেনেও শেষ পর্যন্ত মেনে চলতে পারেননি হিটলার।

রাশিয়ায় জার্মানির বিপর্যয়ে মন মেজাজ খারাপ হয়ে ছিল তাঁর। আমেরিকার বিরাট শক্তি আর ভারতবর্ষের প্রচুর রসদ ক্রমশই শক্তিশালী করে তুলছে ইংরেজকে। দূর প্রাচ্যের পরাজয়ের আঘাত

এখন প্রায় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে মিত্রশক্তি। হিটলার ভাবলেন এ সময় সুভাষচন্দ্রের পরামর্শের দাম আছে।

জার্মানিতে অবশ্য আরও দুই একজন নির্বাসিত বিপ্লবী আছেন যেমন জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতি, ইরাকের রসিদ আলি। কিন্তু তাঁদের উপর অতখানি নির্ভর করা যায় না। তাঁদের থেকে বোস অনেক উঁচু স্তরের বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ।

জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের বড় কর্তা ভন ট্রটের কাছে সব কথা আগেই খুলে বলেছিলেন নেতাজী। বলেছিলেন কেন তাঁর জাপান ও দূর প্রাচ্যে গিয়ে কাজ করা দরকার।

আজ ট্রটও সেইভাবে বোঝালেন হিটলারকে। ট্রট হিটলারকে বললেন, আপনি জাপানকে খুব বড় রকমের একটা সাহায্য করতে পারেননি। আজ সুভাষ বোসকে জাপানে যাবার অনুমতি দিলে সমগ্র অক্ষশক্তিরই তাতে ভাল হবে। কারণ বোস দূর প্রাচ্যে গিয়ে কাজ করলে মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধসম্ভার এশিয়ায় অনেক পরিমাণে আটকে থাকবে। তাছাড়া জাপান যখন তাঁকে পাঠাবার অনুরোধ করেছে তখন তাঁকে পাঠালে খুশি হবে জাপান। অক্ষশক্তির স্বার্থও রক্ষিত হবে তাতে।

অবশেষে যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি।

যাত্রা শুরু হয় কিয়েল থেকে। সঙ্গে যাবেন আবিদ হাসান। প্রথমে একটি জার্মান সাবমেরিণে করে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। এগিয়ে যেতে থাকেন উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে মাদাগাস্কারের দিকে। সেখানে দেখা হয় একটি ছোট্ট দলের সঙ্গে। তারা একটি রবারের ডিঙ্গি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

সেই ডিঙ্গিতে করে আবার যাত্রা শুরু হয় ২৮শে এপ্রিল তারিখে। এখান থেকে তাঁরা সোজা গিয়ে ধরবেন জাপানী সাবমেরিণ 129. এই সাবমেরিণ তাঁদের নিয়ে যাবে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে জাপানে। যাবে উত্তর সাগর ঘুরে। এ পথে বিপদের

ঝুঁকি দারুণ। চারিদিকে শত্রুদের সজাগ দৃষ্টি। তবু তাঁকে যেতে হবে।

সাবমেরিণের ভিতর থেকে পেরিস্কোপের সাহায্যে সব কিছু স্বচ্ছ-ভাবে দেখা যায়। জাপানী সাবমেরিণের ক্যাপ্টেন পেরিস্কোপের ভিতর দিয়ে দেখল আকাশে শত্রুদের বোমারু বিমান উড়ে বেড়াচ্ছে। জলের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে শত্রুপক্ষের সাবমেরিণ। একবার সন্দেহ হলেই হলো। টর্পেডো ছাড়াও আছে ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার আর টহল বোট। ডেপ্থচার্জ সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছে। একবার সন্দেহ করলেই নিঃশব্দে গুলি বেরিয়ে আসবে ডেপ্থচার্জ থেকে।

তবু এই সব বিপদের মাঝখান দিয়ে দূরপ্রাচ্যে যেতে হবে নেতাজীকে। তাছাড়া যাওয়ার কষ্টই বা কী সাংঘাতিক। একটুখানি জায়গা। পা মেলে বসা চলবে না। জড়ো হয়ে অতি কষ্টে নেতাজী আর আবিদ হাসান বসে কাটাতে লাগলেন দিনের পর দিন। পোষাক পাল্টানো নেই, দাড়ি কামানো নেই। শুধু চুপচাপ বসে থাকা। বসে বসেই খাওয়া আর একটু করে ঘুমিয়ে নেয়া। একদিন দুদিন নয়, এইভাবে যেতে হবে নব্বই দিন।

কিন্তু কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল না নেতাজীর। নির্বিকার নিরুদ্বেগ মুখের ভাব। যথারীতি অভ্যাসমত বই পড়েন। তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য কাজ করেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসানের সঙ্গে কথা বলেন।

একদিন হঠাৎ একসময় ক্যাপ্টেন বলল, তার মনে হচ্ছে, শত্রুরা বুঝি বা টের পেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আমাদের বুঝি বা অনুসরণ করছে। প্রথমে কিছুটা উত্তেজনা দেখা গেল সবার মনে। পরে দেখা গেল সব ভুল। জলের বুক চিরে এগিয়ে চলল সাবমেরিণ।

এই সব বিপদের জন্য জাপান সরকার নেতাজীকে আনতে চায়নি। জার্মান সরকার তাঁকে ছাড়তে চায়নি।

কিছুকাল আগে দূরপ্রাচ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে এক

সঙ্কট দেখা দেয়। যখন অনেক অফিসার থাকবেন কি থাকবেন না এই নিয়ে দ্বিধাবোধ করছিলেন, তখন জাপান সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত সংযোগ অফিসার জেনারেল ইয়াকুরো জাপান সরকারকে বলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের ব্যক্তিগত পরিচালনা ও সহযোগিতা ছাড়া আই, এন, একে উন্নত করা সম্ভব নয়।

জাপান সরকার তখন ইয়াকুরোকে জানায়, নেতাজীকে আনার জন্য আপনি জেদ করবেন না। কারণ তাঁর এখানে আসার পথে আছে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা। তাঁকে আনতে হবে একমাত্র সাবমেরিণে করে এবং সমস্ত জলপথে অসংখ্য বৃটিশ ও আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

তবু ইয়াকুরো লিখলেন, জানি তাঁর এখানে নিরাপদে আসার পথে অজস্র বাধা বিপত্তি আছে। কিন্তু তথাপি সব ভারতীয়রা মনে করে যে একমাত্র নেতাজীর পরিচালনা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করতে পারবে না তারা। তিনি যদি নিরাপদে এখানে না আসতে পারেন তাহলে আমাদের এই কথাই বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর ভারতের স্বাধীনতা চান না। যদি তিনি কোনক্রমে এখানে নিরাপদে একবার এসে পড়তে পারেন তাহলে আমরা জানব যে, তাঁর চেষ্টার দ্বারাই ভারত স্বাধীনতা পাবে এটা বিধির বিধান।

সবশেষে ইয়াকুরো জাপান সরকারকে অনুরোধ করলেন, যাই হোক, এখানকার ভারতীয়দের ইচ্ছার কথাটা একবার নেতাজীকে জানান।

এতদিন সেই তিরিশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যের ইচ্ছার টানে আজ তিনি তাদের কাছেই যাচ্ছেন। কিন্তু যেতে যেতে একটা কথা প্রায়ই মনে হয় নেতাজীর। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশার আলোর মাঝে দেখা দেয় বিষাদের মেঘচ্ছায়া। তাঁর মনের যা গঠন আপোষহীন বিপ্লব আর ক্লান্তিহীন সংগ্রামের সুরে সাধা তাঁর

যে জীবন তাতে জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে চলা সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে। যেমন করেননি বৃটিশের কাছে, যেমন করেননি জার্মানির হিটলার বা ইটালির মুসোলিনীর কাছে। সব জায়গাতেই এবং সব আলোচনাতেই তিনি রেখেছেন তাঁর স্বাধীন চিন্তা আর অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছাপ। কারো কাছ থেকে কোন অপমানজনক শর্তে ভারতের স্বাধীনতা চান না তিনি।

বার্লিনে ও রোমে যে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলেছেন তিনি সেখানে একরকম স্বাধীনভাবেই কাজ করতেন। তাঁর প্রচার ও সামরিক ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করেননি হিটলার বা মুসোলিনী।

তবে অক্ষশক্তির এই দুই প্রধান ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন ঘোষণা করতে রাজী হননি। জাপানকে তিনি এবার সরাসরি বলবেন, তিনি চান অক্ষশক্তির দ্বারা স্বীকৃত এক স্বাধীন অস্থায়ী সরকার গঠন করতে। এতে কাজ করার সুবিধা হবে তাঁর পক্ষে। অক্ষশক্তিরও সুবিধা হবে তাতে। এই অস্থায়ী ভারত সরকারের অধীনে দূর প্রাচ্যের সমস্ত সম্পদ ও শক্তিকে সংহত করে তুলবেন তিনি। তখন কালক্রমে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ভারতের শাসনযন্ত্রটা দখল করাও সহজ হবে তাঁর পক্ষে।

যতদূর মনে হয় তাঁর এই চাওয়ার পথ রুখে দাঁড়াবে না জাপান, কারণ জাপান জানে দূরপ্রাচ্যের অনেক জায়গা জাপান দখল করলেও সেখানকার সব মানুষই ১৯৪১ সাল থেকে নেতাজী বোসের জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। পথ চেয়ে চেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে তাদের প্রতীক্ষিত মন। মালয়ে তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইখানির চাহিদার জন্য তার নতুন মুদ্রণ প্রকাশ করতে হয়েছে। তাঁর আপোষহীন স্বাধীনতাসংগ্রাম, রহস্যময় অন্তর্ধান, দুর্ধর্ষ অক্ষশক্তির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা, ইউরোপে আজাদ হিন্দ

গঠন—সব মিলিয়ে কী দুর্বার তাঁর জীবনের আকর্ষণ। কী মোহপ্রসারী তাঁর ব্যক্তিত্ব।

নব্বই দিনের পর সাবমেরিণ পৌঁছল সুমাত্রার উত্তরে সাবাংএ। এখান থেকে বিমানে চাপলেন টোকিও যাবার জন্য। সাবাং হতে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে টোকিও নিয়ে যাবার জন্য জাপান সরকারের পক্ষ থেকে এসেছিলেন ইয়ামামাতো আর হিকারি কিকান। তাঁরাও সঙ্গে চললেন বিমানে।

টোকিও পৌঁছলেন ১৩ই জুন, ১৯৪৩। পৌঁছবার পরের দিনই প্রধানমন্ত্রী টোজো সাদর আমন্ত্রণ জানালেন নেতাজীকে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার বললেন, ভারত আক্রান্ত হোক আর নাই হোক বৃটিশের পরাজয় ঘটলেই ভারত আসবে জাপানের অধিকারে। কিন্তু শুধু যুদ্ধের জন্য যতটুকু দরকার তার বেশী জাপান ভারতের কাছ থেকে কখনও কিছুই চাইবে না এবং ভারত স্বাধীন হোক জাপান এটাই চায়। আর এই স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়রা যা যা করবে জাপান তা সমর্থন করবে, তাতে সাহায্য করবে।

জাপানী পার্লামেণ্ট ডায়েটে প্রধানমন্ত্রী টোজো ঘোষণা করলেন ১৬ই জুন তারিখে, Japan is firmly resolved to extend all means in order to help to expel and eliminate from India the Anglo-Saxon influences which are the enemy of Indian people and enable India to achieve full indipendence in the true sense of the term.

ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে ও ভারতের বুকের উপর থেকে ভারতীয় জনগণের শত্রু ইংরেজ প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধন করতে জাপান সব রকমে সাহায্য করবে।

নেতাজীর অস্থায়ী সরকারের পরিকল্পনা মেনে নিল জাপান

সরকার। ঠিক হলো, জাপানী সৈন্যরা ভারতের যে সব অঞ্চল দখল করে যাবে সেই সব অঞ্চল চলে আসবে তাঁর অস্থায়ী সরকারের অধীনে।

দিনকতকের মধ্যেই বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা করলেন নেতাজী। প্রাচ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো দুজনে। আজাদ হিন্দের প্রতি জাপান সরকারের নীতির কথাও সব শুনলেন।

১৯শে জুন তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন নেতাজী। তাঁর পরিকল্পনার কথা কিছু কিছু বললেন। বললেন তাঁর উদ্দেশ্য ও এখানে আসার কারণ। তারপর বেতার ভাষণেরও ব্যবস্থা করলেন।

জাপানে আসার পর থেকেই ভারতের উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন নেতাজী। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন, ভারতবর্ষের অনেকেই অক্ষশক্তিকে ভয় পায়। ইংরেজের মত অক্ষশক্তির দেশগুলিও উগ্র সাম্রাজ্যবাদী সুতরাং সেই অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে ভারতীয়দের মনে। সে স্বাধীনতার শর্তটা কি, তাদের সঙ্গে তাঁর আপোষের সূত্রটাই বা কি?

সুতরাং খোলাখুলি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলা ভাল দেশবাসীকে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে ২৪শে জুন বললেন, যদি আপনারা অক্ষশক্তিকে বিশ্বাস না করেন তাহলে অন্ততঃ আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আর এটা জানবেন ধূর্ত ও বুদ্ধিমান বৃটিশ রাজনীতিবিদরা যদি আমায় হাত করতে না পারে তাহলে কেউই তা পারবে না।

বৃটিশের সঙ্গে আর কোন রকমের আপোষের কথা নয়। ভারতকে ছাড়া বৃটেনের আর্থিক দিক থেকে একেবারে অসম্ভব এবং ভারতের পক্ষে সেটা আশা করাও বাতুলতা মাত্র। কিন্তু তিনটি

অক্ষশক্তি বৃটেনকে চরম আঘাত দিয়েছে এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারতকে সাহায্য দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এজন্য ভারত তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা ভারতীয় জনগণকে রক্তের বিনিময়েই অর্জন করে নিতে হবে এবং ভারতীয় শক্তির দ্বারাই সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। ভারত থেকে আমার পালিয়ে আসার উদ্দেশ্য আজ এখন সফল হয়েছে। অক্ষশক্তি বিশেষ করে জাপান আজ ভারতকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। অক্ষশক্তি অধিকৃত সব দেশের ভারতীয়রা আজ একটি জাতিতে সুসংগঠিত হয়ে ভারতবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করতে চায়।

দেশে আজ যে আইন অমান্য আন্দোলন চলছে সে আন্দোলনকে অবশ্যই সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত করে তুলতে হবে। একমাত্র যখন ভারতীয় জনগণ ব্যাপকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে তখনই তারা পাবে স্বাধীনতা।

যারা মনে করেন, নেতাজী ইউরোপে গিয়ে ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলেন তাঁরা ভুল করেন। ইউরোপে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটেছে ১৯২২ সালে আর ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ঘটে নাৎসীবাদের প্রাদুর্ভাব। নাৎসীবাদ ফ্যাসিবাদেরই আর এক ভিন্নরূপ বলা চলে। তবে ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রগত স্বৈরাতন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও নাৎসীবাদের প্রকাশ হচ্ছে উগ্র সাম্রাজ্যবাদে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালি ও জার্মানিতে যে নৈরাশ্য ও অপমানবোধ প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায় তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই দুটি রাষ্ট্রে জন্ম হয় ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের। ফ্যাসিবাদের মূল তত্ত্ব হলো উগ্র জাতীয়তাবাদ আর পুঁজিবাদের সংরক্ষণ। নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ হলো ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি।

নাৎসীবাদেরও মূলতত্ত্ব হলো উগ্র জাতীয়তাবাদ আর জাতীয়তাবাদী

সমাজতন্ত্র। তবে ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানি যে লাঞ্ছনা পায় তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নাৎসীবাদকে উগ্র সাম্রাজ্যবাদে পরিণত করে ফেলে।

যাই হোক ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ দুটিই হলো সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধী। কারণ সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সেখানে পররাজ্য গ্রাসের কোন লালসা নেই। তাছাড়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রী। কিন্তু ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতন্ত্র বিরোধী। সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হলো পুঁজিবাদের উচ্ছেদ। কিন্তু ফ্যাসিবাদের কথা হলো, পুঁজিবাদকে ধ্বংস না করে তাকে কিছুটা শুধরে নেয়া। তাছাড়া সুভাষচন্দ্রের মতে যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা নাৎসীবাদের ও ফ্যাসিবাদের বিকৃত নেতাবাদকে কখনই মানতে পারেন না।

মুসোলিনী ও হিটলারের শক্তিমত্তা, কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি সুভাষচন্দ্র। কিন্তু তাই বলে মুসোলিনী বা হিটলারের মতবাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তাঁর পক্ষে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তাদের কাছে সাহায্য নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য শুধু এক কূটনৈতিক কর্মকৌশল গ্রহণ করেছিলেন তিনি দেশ থেকে পালিয়ে ইউরোপে গিয়ে।

তাছাড়া সুভাষচন্দ্রের মতে পৃথিবীর যে কোন রাজনৈতিক তত্ত্বকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত হবে না। তবে সব তত্ত্বের মধ্যেই কিছু না কিছু ভাল জিনিস আছে আর সেই ভালটুকু গ্রহণ করে আমাদের দেশ ও জাতিকে উন্নত করতে হবে। ফ্যাসিবাদের মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে তাকে গ্রহণ করতে তাঁর যেমন কোন দ্বিধা নেই তেমনি মার্কসবাদ বা সাম্যবাদের মধ্যে তার ভাল দিকটিকে গ্রহণ করতেও কোন দ্বিধা নেই তাঁর।

জওহরলাল নেহেরু এক সময় মনে করতেন, ফ্যাসিবাদ কিম্বা মার্কসবাদ তুটির একটিকে গ্রহণ করতেই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র বলতেন, এই তুই মতবাদ একেবারে একে অপরের উল্টো নয়। এই তুই মতবাদের থেকে কিছু কিছু ভাল উপাদান গ্রহণ করা যেতে পারে।

কথায় কথায় জানতে পারলেন নেতাজী দূরপ্রাচ্যের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা রাসবিহারী বসু তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য সিঙ্গাপুর থেকে ছুটে এসেছেন টোকিওতে। শুধু দেখা করতে আসেননি ; তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। আসবার সময় এ কথা কাউকে বলে আসেননি। শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বলে এসেছেন, তোমাদের জন্য একটা বড় রকমের উপহার আনব।

নেতাজী টোকিও এসে পৌছেছেন একথা টোকিও রেডিও থেকে প্রচারিত হয় ২৩শে জুন তারিখে। টোকিওতে প্রচুর সম্মান ও সম্বর্ধনা পেয়েছেন একথাও বলা হলো। ২১শে জুন প্রথম বেতার ভাষণ দান করলেন নেতাজী টোকিও রেডিও থেকে। অনেক কথার মধ্যে বললেন, এতদিন বৃটিশরা মনে করত যতদিন সিঙ্গাপুরে তাদের নৌশক্তির ঘাঁটি ঠিক আছে ততদিন পূর্ব সীমান্তে তাদের কোন ভয় নেই। তাই তারা কেবলমাত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্তেই জোরদার করে তুলেছিল তাদের প্রতিরক্ষা। পূর্ব সীমান্ত দিয়ে কোন শত্রু এসে ভারত আক্রমণ করবে একথা তারা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু জাপানী জেনারেল ইয়ামাশিতার অগ্রগতি বৃটিশ প্রতিরক্ষার ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করে দিয়েছে। যে সিঙ্গাপুর কুড়ি বছর ধরে গড়ে তুলেছিল বৃটিশ তা মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তারা হারিয়েছে।...কিন্তু বর্মা ও সিঙ্গাপুরের এই পতন যা বৃটিশের সামরিক ইতিহাসে এক বিরাট বিপর্যয়, তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির মধ্যে কিন্তু আনতে পারেনি

বিন্দুমাত্র পরিবর্তন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তেমনি রয়ে গেছে। এই পৃথিবীতে বহু লোক যাবে আসবে, অনেক সাম্রাজ্যেরও উত্থান-পতন হবে, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরকাল অনড় হয়ে থাকবে, আমাদের শাসকরা তাই ভাবেন।

ভারতের ভিতরে ও বাইরে যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন তাঁদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে নেতাজী বললেন, বৃটিশ আবার হয়ত আপোষ আলোচনা করবে ভারতের সঙ্গে। সুপরিকল্পিত উপায়ে দীর্ঘসূত্রতা নীতির দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এড়িয়ে যাওয়া ও ভারতের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখাই হলো বৃটিশের আসল উদ্দেশ্য। যেমন তারা করেছিল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে আর ১৯৪২ সালের এপ্রিলে। আপোষের দ্বারা কিছুই হবে না। যারা সত্যি সত্যিই ভারতের স্বাধীনতা চায়, তাদের দেহের রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করে যেতে হবে তার জন্য। বন্ধুগণ ও স্বদেশবাসীগণ। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে ভারতের ভিতরে এবং বাইরে যুদ্ধ করে চলো। যতদিন না বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং যতদিন না তার সেই ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে স্বাধীন ভারত বেরিয়ে আসে ততদিন অবিচল আস্থা রেখে যুদ্ধ করে চলো।

জুনের শেষের দিকে নেতাজীর যাওয়ার কথা ছিল চীন এবং মাঞ্চুকুওতো কিন্তু বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে আলোচনার পর থেকে সিঙ্গাপুর যাওয়ার ইচ্ছা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল তাঁর মধ্যে এবং রাসবিহারী বসুও তাই চাইছিলেন।

ওদিকে সিঙ্গাপুরবাসীরাও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে তাঁর জন্য। সেখানকার সামরিক অসামরিক সব মানুষ চায় তাঁকে দেখতে, তাঁর সান্নিধ্য পেতে। টোকিও রেডিওতে তাঁর ভাষণ শুনে অধৈর্য হয়ে উঠেছে তারা আরও।

অবশেষে যাওয়ার দিন ঠিক হলো ২রা জুলাই। কিন্তু সিঙ্গাপুরে

নেতাজীর যাওয়ার দিনটা গোপন রাখা হলো। আই, এন, এর কয়েকজন অফিসারকে শুধু জানানো হলো কথাটা।

॥ তেইশ ॥

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই বেলা এগারোটার সময় সিঙ্গাপুরের বিশিষ্ট কয়েকজন ভারতীয়, জাপানের রাষ্ট্রদূত ও সামরিক কর্মকর্তারা আর আই, এন, এ বা ভারতের জাতীয় বাহিনীর কয়েকজন অফিসার অসামরিক বিমান বন্দরে গিয়ে নেতাজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উপস্থিত হলেন। আই, এন, এ-র বাছাই করা লোকজনদের দিয়ে তাঁকে এক 'গার্ড অফ অনার' দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়।

বেলা তখন বারোটা। এমন সময় একটি জাপানী বিমান এসে নামল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন নেতাজী। সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ও দেহরক্ষী আবিদ হাসান। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাসবিহারী বসু, কর্ণেল ইয়ামামাতো আর সেনদা।

আই, এন, এ বাহিনীর প্রতিটি লোকের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং কিছু কথা বললেন। জেনারেল শাহ নওয়াজ খাঁ ছিলেন এই বাহিনীরই এক অফিসার। সেদিন তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সেদিন নেতাজীর পরনে ছিল হালকা বাদামী রঙের স্যুট আর মাথায় গান্ধী টুপী। উন্নত দেহ, উদ্ধত মাথা, মুখে মধুর হাসি। তাঁর আসার খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই সিঙ্গাপুরের আবালবৃদ্ধ বনিতা প্রতিটি নরনারী এসে ভিড় করতে লাগল তাঁর বাসভবনের চারিদিকে। নেতাজী তাদের কাছে এক আশ্চর্য মহান পুরুষ। তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখেই ধন্য হতে চায় তারা। প্রাণান্তকর ভিড়ের চাপ। তবু ছুটেছে দর্শনার্থী মানুষ। নেতাজীকে তারা দেখবেই।

পরের দিন নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন, থাইল্যাণ্ড, বর্মা ও বোর্ণিওর স্বাধীনতা লীগের কর্মীদের সঙ্গেও দেখা করলেন। সামরিক বাহিনীর ঝানু অফিসাররা আশ্চর্য হয়ে গেলেন নেতাজীর বর্তমান যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান দেখে।

তার পরদিন দূরপ্রাচ্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন নেতাজী। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ক্যাথে বিল্ডিংএ। সমস্ত লোকে লোকারণ্য। এই সম্মেলনে এক ঐতিহাসিক ভাষণের শেষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সব ভার নেতাজীর উপর আনুষ্ঠানিকভাবে দান করলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

এই দায়িত্বভার গ্রহণ করে নেতাজী বললেন, বন্ধুগণ! আজ স্বাধীনতা প্রিয় প্রতিটি ভারতবাসীর কাজ করার সময় এসেছে। যুদ্ধের সময় সবচেয়ে যেটা হলো দরকার সেটা সামরিক শৃঙ্খলাবোধ আর লক্ষ্যের প্রতি অবিচল আস্থা। আমি তাই দূরপ্রাচ্যের আমার দেশবাসীকে আহ্বান করছি তাঁরা যেন আজ এক সাধারণ বেদীমূলে সমবেত ও সুসংগঠিত হয়ে ভবিষ্যতের এক জীবন মরণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা তা করবেন।

ভারতের বাইরে দেশপ্রেমিক ভারতীয়রা দেশের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আমি এটা জোর গলায় বলতে পারি যে, আজ পর্যন্ত যা আমরা করেছি বা ভবিষ্যতে যা কিছু করব তা শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্যই এবং আমরা এমন কিছুই করব না যা ভারতের স্বার্থ ও ভারতীয় জনগণের জাতীয় ইচ্ছার পরিপন্থী।

আমরা যাতে আমাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত করতে পারি তার জন্য স্বাধীন ভারতের এক অস্থায়ী সরকার গঠন করতে চাই। ত্যাগ ও চেষ্টার দ্বারা স্বাধীনতা লাভের পরও আমাদের এমন শক্তি অর্জন করতে হবে যার দ্বারা আমরা আমাদের সেই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারব।

১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই তারিখে দূরপ্রাচ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা সারা বিশ্বে প্রচারিত হলো। সেইদিনই সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংএর সামনে অনুষ্ঠিত এক প্যারেডে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত বাহিনীগুলিকে পরিদর্শন করলেন নেতাজী। ভাষণে বললেন,

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকগণ! আজ আমাদের জীবনে সবচেয়ে গর্বের দিন। ঈশ্বরের দয়ায় আজ মুক্তিফৌজ গঠনের কথাটি সারা বিশ্বে ঘোষণা করার সম্মান ও সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। যে সিঙ্গাপুর ছিল একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক বিরাট ঘাঁটি, সেই সিঙ্গাপুরের যুদ্ধক্ষেত্র হতে সৈন্য সংগ্রহ করেই গঠিত হলো এই সামরিক বাহিনী। এই বাহিনী বৃটিশের কবল থেকে মুক্ত করবে ভারতবর্ষকে। আজ প্রতিটি ভারতীয়ের এই ভেবে গর্ব অনুভব করা উচিত যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় নেতৃত্বের অধীনেই এই ভারতীয় মুক্তি ফৌজ গঠিত হয়েছে এবং সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নেতার অধীনে এই মুক্তি ফৌজ যাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে।··· আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কবরখানার উপরে দাঁড়িয়ে এক অবোধ শিশুও বুঝতে পারবে যে সর্বশক্তিমান বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ অতীতের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বন্ধুগণ! আজ তোমাদের মুখে একমাত্র ধ্বনি হোক, দিল্লী চলো, দিল্লী চলো। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের মধ্যে কয়জন বেঁচে থাকবে আমি তা জানি না। তবে আমি জানি যে একদিন না একদিন আমরা জয়লাভ করবই এবং যতদিন পর্যন্ত না পুরনো দিল্লীর লালকেল্লায় বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্য একটি কবরখানায় আমাদের বীর যোদ্ধারা বিজয় অভিযান করে না যায় ততদিন আমাদের এই মহান কাজের শেষ হবে না।

আমার রাজনৈতিক জীবনের মাঝে কাজ করতে গিয়ে সব সময় একটা জিনিস অনুভব করেছি যে একরকম সব দিক দিয়েই ভারতবর্ষ

স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু শুধুমাত্র একটা জিনিসের অভাব আর সেটা হলো তার নিজস্ব মুক্তিফৌজ ; জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর হাতে ছিল নিজস্ব সৈন্যদল। গ্যারিবল্ডীও তাঁর হাতে সশস্ত্র স্বেচ্ছাবাহিনী ছিল বলেই মুক্ত করতে পেরেছিলেন ইটালিকে। আজ তোমাদের পক্ষে এটা গর্ব ও সম্মানের কথা যে, আজ তোমরাই প্রথম ভারতের জাতীয় বাহিনী গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছ। যে সব সৈনিকরা তাদের জাতির প্রতি চিরবিশ্বস্ত থাকে, সকল অবস্থাতেই তাদের কর্তব্যকর্ম করে চলে, যারা জীবনে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকে সব সময়, জানবে সে সব সৈনিকরা অজেয়। আদর্শ সৈনিকের এই তিনটি কর্তব্য অন্তরে খোদাই করে রাখবে।

৬ই জুলাই আর একটি প্যারেডের অনুষ্ঠান হয় আগে যেখানে হয়েছিল। এই প্যারেডে নেতাজীর সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী টোজো সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করে খুশি হন টোজো। পরে একটি ঘরে নেতাজীর সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বাহিনী গঠনের জন্য বাহবা দেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাপানী জাতির পক্ষ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

৯ই জুলাই হয় এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান। সেখানে এক দীর্ঘ ভাষণে নেতাজী কেন দেশ ছেড়ে এসেছেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য কি কি করেছেন তা বর্ণনা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মূল পরিকল্পনার কথাটিও খুলে বলেন নেতাজী। দূরপ্রাচ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকরা যখন ভারতে ঢুকে গিয়ে বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করবে তখন শুধু ভারতের জনগণই দেশজোড়া এক বিরাট বিপ্লবে ফেটে পড়বে না, ভারতীয় সেনাবাহিনীও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। বৃটিশ সরকার যখন এই ভাবে ভারতের

ভিতরে ও বাইরে থেকে আক্রান্ত হবে তখন তার নিশ্চয়ই পতন ঘটবে আর তখন ভারতের জনগণ নিশ্চয়ই স্বাধীনতা পাবে।

আমার মতে অক্ষশক্তি ভারত সম্বন্ধে কি ভাবছে বা না ভাবছে সে বিষয়ে তার নীতি কি তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথার কোন দরকার নেই। ভারতের ভিতরে ও বাইরে ভারতীয়েরা ঠিক মত কর্তব্য কর্ম করে গেলে তারাই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। আজ দূরপ্রাচ্যের তিরিশ লক্ষ ভারতীয়ের মুখে শোনা যাবে শুধু একটি মাত্র কথা, যুদ্ধের জন্য সর্বশক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করো। আমি ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের কাছ থেকে চাই অন্ততঃ তিন লক্ষ সত্যিকারের সৈনিক আর তিন লক্ষ ডলার। বীর ভারতীয় নারীদের দ্বারা আমি একটি নারীবাহিনীও গড়ে তুলতে চাই। ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁসীর রাণী যেমন করে যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি করে এই নারীবাহিনীও মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অস্ত্রচালনা করবে যুদ্ধক্ষেত্রে।

॥ চব্বিশ ॥

যুদ্ধবন্দীদের শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে আরও দুই হাজার সৈন্য সংগ্রহ করলেন। ক্রমাগত আলোচনা করে যেতে লাগলেন সামরিক অফিসারদের সঙ্গে। প্রায় রোজ জনসভায় ভাষণ দিয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে লাগলেন ভারতীয় জনগণকে।

শুধু কাজ আর কাজ। সারা দিনের মধ্যে একটুও বিশ্রাম নেই। তার উপর গভীর রাত পর্যন্ত লেখালেখির কাজ ও অফিসের কাজ করতে হয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুম। তবু কোন কষ্ট হয় না। কোন ক্লান্তি অনুভব করেন না নেতাজী। একটি মহান আদর্শের অফুরান উৎস হতে অবিশ্রান্ত কর্মের একটি ধারা তাঁর দেহ মনকে স্নাত

ও স্নিগ্ধ করে অবিরাম বয়ে চলে তাঁর জীবনের উপর দিয়ে। কোন কষ্ট হয় না, বরং তৃপ্তি পান কাজ করে।

জার্মানিতে থাকার সময় বেতার ভাষণে যেমন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করতেন, এখানেও তাই করতে লাগলেন নেতাজী। আন্তর্জাতিক ঘটনা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা বরাবরের স্বভাব তাঁর। এই আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলিকে সময় বুঝে কাজে লাগানোও রাজনীতির একটি বড় শিক্ষা।

বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানালেন নেতাজী, তখন বাংলা দেশে চলছে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশের মন্বন্তর বলে যা আজও চিহ্নিত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় আর মানুষের মনে। শুধু কলকাতা শহরেই মারা যায় বত্রিশ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষ।

অথচ এ দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি। বৃটিশ সরকার দূরপ্রাচ্যে জাপানের কাছে হঁটে গিয়ে ইচ্ছে করে বাংলার খাদ্যশস্য সব কিনে নষ্ট করে ফেলে। জাপান যদি বাংলাদেশে এসে পড়ে পূর্ব সীমান্ত দিয়ে তাহলে এখানে এসে কোন রসদ পাবে না এই জন্যই তারা এই জঘন্য কাজ করে বসে। তাছাড়া তার আগের বছর দামোদরের বন্যাতেই বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ধানের বড় ক্ষতি হয়।

যাই হোক কথাটা শুনে বাংলার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল নেতাজীর।

আগস্ট মাসে এক বেতার ভাষণে তিনি দশ হাজার টন চাল দূরপ্রাচ্যের ভারতীয় লীগের পক্ষ থেকে দান হিসাবে ভারত সরকারকে দিতে চাইলেন। ভারতের যে কোন বন্দরে, এই চাল জাহাজ থেকে নামিয়ে নেয়া যাবে।

তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড ওয়াভেল। ওয়াভেল প্রত্যাখ্যান করলেন নেতাজীর এই দান। এর জন্য নেতাজী ভারত সরকারকে আরও কঠোর ভাবে আক্রমণ করলেন তাঁর বেতার ভাষণে। কিন্তু আই, এন, এ সম্বন্ধে কোন কথা বলল না বৃটিশ। তার মানে স্বীকার করতে চাইল না আই, এন, এ-র অস্তিত্ব।

আগস্ট মাসে দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কিভাবে টাকা ও সৈন্য সংগ্রহ করা যায় তার জন্য কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণে বার হলেন। প্রথমে গেলেন রেঙ্গুন। সেখান থেকে ব্যাঙ্কক ও পরে সাইগন।

নেতাজী দেখলেন মালয়ে প্রচুর ভারতীয় রয়েছে। সংখ্যায় হবে আট লক্ষ। ব্রহ্মদেশেও রয়েছে ছয় লক্ষ। মালয় ও ব্রহ্মদেশের মাঝখানে আছে শ্যামদেশ আর শ্যামদেশেও আছে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয়। এই সব দেশের ভারতীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য টাকা ও সৈন্য দুই পাওয়া যেতে পারে।

এই সব দেশগুলি ভ্রমণ সেরে ঘুরে এলেন নেতাজী। কোথায় কি পাওয়া যাবে তা দেখে এইবার কাজের কথা ভাবলেন। তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রবীণ অফিসারকে পাঠালেন কয়েকটি দেশে।

এইবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় বাহিনীর ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন নেতাজী। ভার গ্রহণ করলেন ৮ই আগস্ট এবং ঘোষণা করলেন ২৫শে আগস্ট।

এই ব্যাপারটি নিয়ে আগেই তিনি জাপানী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। ইম্ফল অভিযানের সময় এই বাহিনী কতবড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেকথাও আলোচনা করেন নেতাজী।

কিন্তু দূর প্রাচ্যের জাপানী কম্যাণ্ডার ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি কিন্তু ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা আই, এন, এ-র সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে এই বাহিনী যে সব সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে তারা মালয়ে একদিন জাপানীদের কাছে পরাজিত হয়েছে। সুতরাং দেহ ও মনের দিক থেকে তারা পঙ্গু ও দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের দ্বারা কোন কাজ হবে না।

ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি আরও বলেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য যা কিছু করার দরকার তা জাপানী সৈন্যরাই করবে। বোস শুধু ভারতীয়

জনগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাকে সংহত করে কাজে লাগাবেন। তাঁর মতে আই, এন, এ-র বড় অংশটি সিঙ্গাপুরে যাক ; কেবলমাত্র গুপ্তচর আর প্রচার বিভাগটি যুদ্ধক্ষেত্রে থাক।

কিন্তু তেরাউচি যাই বলুন, নেতাজী ক্রমাগত বাড়িয়ে চললেন তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা। তিনি চান বিপুল হতে বিপুলতর হয়ে উঠুক এই বাহিনী। এরাই একদিন বিজয় অভিযানে অপ্রতিহত বেগে ছুটে যাবে দিল্লীর পথে। ভারতের স্বাধীনতা জাপানী সৈন্যরা এনে ভারতীয়দের হাতে ছেলের হাতে মোয়ার মত তুলে দেবে এটা কখনও চাননি নেতাজী। চাওয়া দূরে থাক এ কথা ভাবতেও পারেননি।

তাই ২৫শে আগস্ট সমস্ত ভারতীয় বাহিনীর কর্তৃত্বভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন,

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বার্থের খাতিরে আমি এই বাহিনীর পরিচালনভার গ্রহণ করলাম। এটা আমার পক্ষে সত্যি সত্যিই খুব আনন্দ ও গর্বের বস্তু। কারণ একজন ভারতীয়ের পক্ষে ভারতের মুক্তি ফৌজের সেনাপতিত্ব করার মত সম্মান আর সৌভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না। আমি আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সেবক বলে মনে করি নিজেকে। আমি এমনভাবে আমার কার্য পরিচালনা করতে চাই যাতে এই আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয় এবং যাতে প্রতিটি ভারতীয় আমার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে চলতে পারেন। পূর্ণ ন্যায় বিচার, পক্ষপাতহীনতা ও নিখুঁত জাতীয়তাবাদের ভিত্তির উপরেই গঠিত হয়েছে এই ভারতের মুক্তি ফৌজ।

১৯৪৩ সালের ২রা অক্টোবর নেতাজীর তৎপরতায় দূর প্রাচ্যের সর্বত্র মহাত্মা গান্ধীর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। সিঙ্গাপুরে এক জনসভায় এক দীর্ঘ ভাষণে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর অবদানের কথা বলেন।

এরপর নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সংস্কার সাধন করে নতুন করে ডিভিসনগুলি গড়ে তুলতে শুরু করলেন। প্রথম ডিভিসনকে মালয়ে সামরিক শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সৈন্যদের উন্নত ধরনের সামরিক শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নৈতিক মানও উন্নত করতে হবে। আগে তারা বিদেশী সরকারের হয়ে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে। তাদের নীতিবোধ স্বভাবতই দুর্বল। কিন্তু নীতিবোধকে উন্নত করে তুলতে না পারলে তারা তাদের মহান উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা বুঝতে পারবে না, দেশের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষায় তৈরি হতে পারবে না।

নেতাজী খোলাখুলি ভাবে বললেন, যারা দুর্বলমনা তারা স্পষ্ট করে বলুক ; তারা চলে যাক। তাদের আমরা চাই না। যারা থেকে যাবে তাদের সবদিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল হয়ে উঠতে হবে। যুদ্ধে যারা নিহত হবে তাদের পরিবারবর্গের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হবে। আহতদের জন্য সেবা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হবে। বীরত্বের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা হবে।

নেতাজী সৈন্যদের বেতনের হার বাড়িয়ে দেন। তাদের খাদ্যের রেশন ব্যবস্থারও উন্নতিসাধন করেন। কার্যভার হাতে নিয়ে সৈন্যদের সব বিষয়েই বিশেষ আগ্রহ দেখান নেতাজী।

সব সৈন্যদের নিজের মত করে দেখতেন নেতাজী। সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিশতেন। কোন ভেদজ্ঞান ছিল না তাঁর মনে। সৈন্যরা বসে খাচ্ছে, আগে থেকে কিছু না বলে হঠাৎ তাদের মাঝে গিয়ে খেতে বসে গেলেন। বিকালে তাদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতে শুরু করে দিলেন। যে কোন সৈনিক ও অফিসারের জন্য সব সময় খোলা থাকত তাঁর ঘরের দরজা। যে কোন সৈনিক যে কোন সময়ে তাঁর ঘরের ভিতর যেতে পেত।

ভারতের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাই ছিল তাঁর আত্মার আত্মীয়।

তাঁর অস্থিমজ্জার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা।

ব্রহ্মদেশ অধিকার করে সে দেশের অধিবাসীদের জাপান স্বাধীনতা দান করে গত ১লা আগস্ট। সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী। তিনি বলেন, আজ রেঙ্গুনের সরকারি ভবনে যেমন ময়ুরমার্কা পতাকা উড়ছে, তেমনি দিল্লীর লালকেল্লায় উড়বে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা।

মাঝে মাঝে এখানে সেখানে যেতে হত। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় থাকতেন সিঙ্গাপুরে। অবসর সময়ে দূর সীমান্তবর্তী ভারতের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠত অটল সংকল্পের ছাপ। চোখে ফুটে উঠত এক দৃঢ় ও দূরাহিত প্রত্যয়ের আভাস।

এবার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের দিন ঠিক হয়ে যায়। ২১শে আগস্ট তারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের উদ্যোগে সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিংএ অনুষ্ঠিত হয় এক ঐতিহাসিক অধিবেশন। অধিবেশন শুরু হয় বেলা সাড়ে দশটায়।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে ভাষণ দেন রাসবিহারী বসু এবং কর্নেল চ্যাটার্জি সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন। তারপর মঞ্চে আসেন নেতাজী। এক ঘণ্টাব্যাপী এক রোমাঞ্চকর বক্তৃতায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখে দেন। নেতাজীর শপথ পাঠ করার সময় শ্রোতাদের উল্লসিত করতালিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে সভাগৃহ। কখনও মৃদু কখনও বা দৃঢ় কণ্ঠস্বরে শপথ বাণী পাঠ করেন নেতাজী :

আমি সুভাষচন্দ্র বসু ভগবানের নামে শপথ করছি যে ভারতবর্ষ ও আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীকে মুক্ত করবার জন্য আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পবিত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

বলতে বলতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। সমস্ত সভা স্তব্ধ। সকলেরই দৃষ্টি নেতাজীর উপর আবদ্ধ। শ্রোতারা এমন মুগ্ধ হয়ে গেছে তারাও সকলে নীরবে স্বগত উচ্চারণে নেতাজীর কথাগুলি মনে মনে বলে যাচ্ছে।

নেতাজী আবার বলতে শুরু করলেন,

আমি চিরদিনই ভারতবর্ষের একজন সেবক হয়ে থাকব এবং আমার আটত্রিশ কোটি ভারতীয় ভাই বোনের উন্নতির জন্য কাজ করে যাব। এই সেবাই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এমন কি ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও সেই স্বাধীনতার জন্য আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাত করার জন্য সব সময় আমি প্রস্তুত থাকব।

নেতাজীর এই কথা বলার পর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্যরা একে একে মঞ্চে এসে শপথবাণী পাঠ করলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই বলতে হলো, আমি ভগবানের নামে এই পবিত্র শপথ করছি যে, ভারতবর্ষ ও আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীকে স্বাধীন করার জন্য আমি আমার নেতা সুভাষচন্দ্র বোসের প্রতি সব সময়ে বিশ্বস্ত থাকব এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি আমার জীবন ও যথাসর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকব।

এইভাবে একের পর এক ঈশ্বর ও জন্মভূমির নামে শপথ গ্রহণ করেন আর তাঁদের সর্বাধিনায়ক নেতাজীর সামনে নতজানু হয়ে অকুণ্ঠ আনুগত্য দেখান। এই অস্থায়ী সরকারের নাম হলো আর্জি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ।

এর পর নেতাজী সরকারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত এক ঘোষণা পত্র পাঠ করলেন,

১৭৬৭ সালে বৃটিশের কাছে বাংলার পরাজিত হবার পর থেকে ভারতীয় জনগণ অপ্রতিহতভাবে একশো বছর ধরে একটানা যুদ্ধ

করে আসছে। বড় অতুলনীয় বীরত্ব আর আত্মত্যাগের গৌরবময় দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল হয়ে আছে এই একশো বছরের ইতিহাস। বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা ও মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের হায়দার আলি, টিপু সুলতান ও ডেলু সাম্পি, মহারাষ্ট্রের আপ্পা সাহেব ভোঁসলে ও পেশোয়ার বাজীরাও, অযোধ্যার বেগমরা, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং আগরওয়ালা, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, ডুমরাওএর মহারাজ কুনওয়ার এবং নানা সাহেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের উত্তর পুরুষরা বুঝতে পারেননি যে বৃটিশ সমগ্র ভারতের পক্ষেই বিপজ্জনক আর তা বুঝতে পারেননি বলেই তাঁরা একযোগে তাঁদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেননি। অবশেষে যখন সত্যি সত্যিই তাঁরা প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন তখনই তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহের পতাকা তলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেন।

১৮৫৭ সালের পর থেকে বৃটিশ জোর করে সব অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করায় ভারতীয় জনগণ কিছুদিনের জন্য নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকে আবার নতুন জাগরণ আসে ভারতীয় জনগণের মধ্যে। ১৮৮৫ সাল থেকে গত প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জনগণ তাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বরকমে চেষ্টা করে—যেমন আন্দোলন ও প্রচার, বৃটিশ পণ্য বর্জন, সন্ত্রাসবাদ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং পরিশেষে সশস্ত্র বিপ্লব। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় অবশেষে ১৯২০ সালে ভারতের জনগণ যখন ব্যর্থতা ও হতাশায় মূহ্যমান হয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের নতুন মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন।

এইভাবে ভারতীয় জনগণ শুধু তাদের রাজনৈতিক চেতনাই ফিরে পায় না, সঙ্গে সঙ্গে এক অখণ্ড জাতীয় সত্তায় সংহত হয়ে ওঠে তারা। তখন থেকে তাদের সাধারণ লক্ষ্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক অখণ্ড কায়মনোবাক্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সামর্থ্য অর্জন করল। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আটটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে কংগ্রেস মন্ত্রীরা দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁরা নিজেদের শাসনকার্য নিজেরাই চালাতে পারেন। সুতরাং বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতের চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভূমি প্রস্তুত হয়েই ছিল।

শঠতা, প্রবঞ্চনা, লুণ্ঠনের দ্বারা ভারতীয় জনগণকে মৃত্যু ও অনশনের পথে ঠেলে দিয়ে বৃটিশ শাসকরা ভারতীয় জনগণের সব শুভেচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে। আজ তাদের অস্তিত্বকে নিজেরাই বিপন্ন করে ফেলেছে তারা। এখন সেই অবাঞ্ছিত শাসনের শেষ চিহ্নটুকুকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য দরকার শুধু এক টুকরো অগ্নিশিখার। সেই অগ্নিশিখাকে প্রজ্জ্বলিত করাই হলো আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ।

আজ যেহেতু স্বাধীনতার সুপ্রভাত আমাদের হাতের কাছে এসে পড়েছে, ভারতীয় জনগণের কর্তব্য হচ্ছে এক স্বাধীন অস্থায়ী সরকার গঠন করা এবং সেই সরকারের অধীনে শেষবারের মত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু ভারতের নেতারা কারাগারের মধ্যে থাকায় ও ভারতীয় জনগণের হাতে কোন অস্ত্র না থাকায় ভারতবর্ষের মধ্যে কোন অস্থায়ী সরকার গঠন করা বা সেই সরকারের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আজ দূর প্রাচ্যের যে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগকে ভারতের ভিতরে ও বাইরে প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসী সমর্থন ও শ্রদ্ধা করে তার উচিত হলো স্বাধীন ভারতের জন্য অস্থায়ী সরকার গঠন করা আর আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিটি ভারতীয়ের কাছ থেকেই আনুগত্য লাভের অধিকারী। এই সরকার তার অধীনস্থ সকল নাগরিককে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সকলকে সমান অধিকার আর সুযোগ সুবিধা দান করেছে। এই সরকার সমগ্র দেশ ও জাতি ও তার প্রতিটি অংশের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করছে। বিদেশী সরকার যে সব ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে, সেই সব ভেদজ্ঞানের উর্ধ্বে গিয়ে দেশের প্রতিটি সন্তানকে সমানভাবে মানুষ করে তুলবে এই সরকার।

ঈশ্বরের নামে ও আমাদের সেই সব উত্তরপুরুষেরা যাঁরা ভারতবাসীকে একটি জাতিতে পরিণত করে গেছেন এবং যাঁরা বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য রেখে গেছেন তাঁদের নামে আজ আমরা ভারতীয় জনগণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা তাঁদের কাছে আরও আহ্বান জানাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত না ভারতের মাটি থেকে শত্রুরা বিতাড়িত হয়; এবং যতদিন না ভারতীয় জনগণ আবার এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত না হয় ততদিন তাঁরা যেন জয়ের প্রতি আস্থা রেখে বীরত্ব সাধন ও অধ্যবসায় সহকারে বৃটিশের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে চলেন।

এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্রে যারা আপন আপন পদমর্যাদা অনুসারে সই করেন তাঁরা হলেন, সুভাষচন্দ্র বোস, রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন শ্রীমতী লক্ষ্মী, নারী সংগঠন বিভাগ, এস, এ আয়ার, প্রচার বিভাগ, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এন, এস, ভগৎ, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল জে, কে, ভোঁসলে, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল গুলজারা সিং, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এম, জেড কিয়ানি, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এ, ডি, লোগনধন, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ইশান কাজির ও লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল শাহ নওয়াজ খাঁ—এঁরা সকলেই সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিরূপে মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন।

এম, এ সহায় মন্ত্রীর সম মর্যাদাসম্পন্ন সচিব। রাসবিহারী বোস, প্রধান পরামর্শদাতা। এ, এন, সরকার, আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা এবং করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি, এম, খাঁ, ওয়াই ইয়েলাপ্পা, জে, থিভি ও সর্দার ঈশ্বর সিং হন সাধারণ পরামর্শদাতা।

এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হলো বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ১৯৪৩ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংএর সামনে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অসামরিক ভারতীয়দের এক বিরাট জনসমাবেশে ঘোষণা করেন নেতাজী,

আমাদের মন্ত্রীসভা দ্বিতীয় বৈঠকে রাত্রি ১২-৫ মিনিটে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে।

আর্জি হুকুমৎ-ই—আজাদ হিন্দ বৃটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।

নেতাজী এ কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল জনসভায় পঞ্চাশ হাজার লোক আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। অনেকে উচ্ছাসে আত্মহারা হয়ে মঞ্চের দিকে ছুটে চলে। ঝাঁসি রাণী বাহিনীর অনেক মেয়ে আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

নেতাজী তখন সকলকে শান্ত হতে বলেন। তিনি বলেন, আপনারা শুধু হাত তুলে আপনাদের সম্মতি প্রকাশ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার লোক হাত তুলে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা রাইফেল তুলে বেয়নেট উঁচিয়ে তাদের সম্মতি জানায়।

দিনকতকের মধ্যেই আজাদ হিন্দ সরকারকে সমর্থন করল কয়েকটি দেশ। জাপান, ব্রহ্মদেশ, জার্মানি, ফিলিপাইন, নানকিং, মাঞ্চুকুও প্রভৃতি দেশগুলি আজাদ হিন্দ সরকারকে সমর্থন করে বাণী পাঠাল।

॥ পঁচিশ ॥

নতুন সরকারের কর্মভার গ্রহণ করার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের এক বৈঠক ডাকলেন নেতাজী। সেখানে জাপানের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির কথাটা আলোচনা করলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে তেরাউচির ধারণা খুব উঁচু নয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে তেরাউচির কথাগুলি বললেন নেতাজী। এই বৈঠকে যে সামরিক অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, ভোঁসলে, এম, জে ও আই, জে, কিয়ানি, আজিদ আমেদ, শাহ নওয়াজ, গুলজারা সিং, হবিবুর রহমান ও পি, কে, সাইগল।

নেতাজী বললেন, তেরাউচি বলেছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা জাপানী সৈন্যদের মত অত ভাল লড়াই করতে পারবে না। কারণ তারা একবার মালয়ে হেরে গিয়েছিল এবং তারা দুর্নীতিগ্রস্ত।

তেরাউচি আরও বলেছিল, বৃটিশ শাসনের অধীনে এতদিন তারা যুদ্ধ করে বিলাসী হয়ে পড়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানী সৈন্যদের মত অত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া এতদিন তারা বৃটিশের ভাড়াটে সৈন্যের মত যুদ্ধ করে এসেছে ; তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা বা কোন মতাদর্শ নেই ; সুতরাং তারা যে কোন সময়ে প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে। সুতরাং ভারতের দিকে জাপানী সৈন্যরা এগিয়ে যাবে আর আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছনে থাকবে।

নেতাজী আরও বললেন, তেরাউচির এই সব কথার উত্তর অবশ্য আমি দিয়েছি। আমি তাকে বলেছি, জাপানীদের ত্যাগ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যদি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় তাহলে সে স্বাধীনতাকে আমি দাসত্বের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করব। জাপানী

সৈন্যরা যদি ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে এগিয়ে যায় আর আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি তার পিছনে পড়ে থাকে তাহলে সেটা হবে ভারতের পক্ষে জাতীয় অপমান, সুতরাং এর পর সব যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রথম এগিয়ে যাবে; ভারতের বুকে ভারতীয় সৈনিকদেরই রক্ত প্রথম ঝরে পড়বে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সৈনিকরাই প্রথম চেষ্টা করবে। পরে যদি দেখা যায় সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তারা স্বাধীনতা লাভ করতে পারল না তখন তারা জাপানী সাহায্য চাইবে।

তেরাউচি অবশ্য নেতাজীর কথায় সায় দিয়েছে। কিন্তু নেতাজীকে বলেছে, সব নয়। এখন আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত ডিভিসন হতে বাছাই করা ভাল সৈন্যদের নিয়ে একটি ব্রিগেড তৈরি করা হোক। তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেখা হোক, তারা যদি জাপানী সৈন্যদের মত কষ্ট সহ্য করে ভাল যুদ্ধ করতে পারে তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের বাকি সৈন্যদেরও পাঠানো হবে যুদ্ধক্ষেত্রে।

এই সব কথাগুলি অফিসারদের বুঝিয়ে বলার পর নেতাজী তাঁদের মতামত চাইলেন। অবশেষে অফিসাররা সকলে মিলে এই ধরনের একটি বাহিনী গঠন করতে চাইলেন যার নাম হবে এক নম্বর গেরিলা বাহিনী।

তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে তিনটি বাহিনী ছিল। তিনজন ভারতীয় নেতার নাম অনুসারে তিনটি বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন নেতাজী—গান্ধী ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড ও নেহেরু ব্রিগেড।

এই তিনটি ব্রিগেড হতে বাছাই করা ভাল সৈন্যদের নিয়ে একটি গেরিলা বাহিনী তৈরি হলো আর তার সেনাপতি হলেন জেনারেল শাহ নওয়াজ। সৈন্যরা নিজে থেকে এই বাহিনীর নাম দিল সুভাষ ব্রিগেড।

সামনে দুই মাস বাকি। এই দুই মাসের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিতে হবে। তারপর যেতে হবে বর্মা রণাঙ্গনে। আজাদ হিন্দ

ফৌজের এই গেরিলা বাহিনীর উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নেই। বেতার বা টেলিফোন ব্যবস্থা নেই সঙ্গে। তাছাড়া ভাল কোন পরিবহণ ব্যবস্থাও নেই।

বাহিনীর মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। তিন হাজার সৈনিকের দেখাশোনার জন্য মাত্র পাঁচজন ডাক্তার ছিল। তাও আবার ডাক্তারদের হাতে অস্ত্রোপচারের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ছিল না। তাছাড়া পোষাক ও জুতোর অভাব ছিল সৈনিকদের। অনেক সময় মালয়ের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বিষধর পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে খালি গায়ে যুদ্ধ করতে হত সৈনিকদের।

এই সব অসুবিধার মধ্য দিয়েই বাহিনীকে একা গড়ে তুলতে লাগলেন নেতাজী। জাপানীদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই নিলেন না। একাই স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। একাই সৈন্যদের শিক্ষার দিকে নজর রাখতে লাগলেন।

মালয়ের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে একদিন নেতাজী বললেন, যখন কোন দেশে যুদ্ধ চলে তখন সেখানে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকে না।···তোমরা যদি মনে করে থাক তোমাদের ব্যক্তিগত সব সম্পত্তি শুধু তোমাদেরই তাহলে তোমরা ভুল করেছ। তোমাদের সব সম্পত্তি এখন তোমাদের নয়। তোমাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি একমাত্র ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃত। আমার একান্ত বিশ্বাস যে তোমরা এই সরল সত্যটা বুঝতে পেরেছ—ভারতের স্বাধীনতা আমাদের যে কোন উপায়ে লাভ করতেই হবে।

যদি তোমরা এই সরল সত্যটা বুঝতে না পার তাহলে তোমাদের অন্য পথ দেখাতে হবে যে পথ এতদিন ইংরেজরা দেখিয়েছিল।

শেষের এই কড়া কথাটা বলতেন না নেতাজী। কিন্তু না বলে পারলেন না, কারণ তিনি শুনেছিলেন মালয়ের অনেক ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে টাকা দিতে কুণ্ঠা বোধ করছে।

তিনি বার বার তাই সাবধান করে দিলেন, আমাকে যে কোন উপায়ে যেমন করে হোক ভারতকে স্বাধীন করতেই হবে। যদি তোমরা এ বিষয়ে তোমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাও, তাহলে স্পষ্ট করে বলো যে তোমরা ভারতের স্বাধীনতা চাও না। তাহলে আমি আগেই বলেছি আমি তোমাদের পথ দেখাব।

টোকিওতে দূরপ্রাচ্যের এক মহা সম্মেলন বসছে। নেতাজীকে সেখানে যেতে হবে। তাই সব কাজের ভার সহকর্মী অফিসারদের দিয়ে নেতাজী ২৫শে অক্টোবর জনসভায় ভাষণ দেবার পরই বিমানযোগে টোকিও যাবার জন্য সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলেন।

জাপানী প্রধানমন্ত্রী টোজোর সঙ্গে দেখা করলেন নেতাজী ১লা নভেম্বর। তেরাগুচির সব কথা তিনি খুলে বললেন। তিনি আগামী ১৯৪৪ সালের যুদ্ধে তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসনটিকে পুরো কাজে লাগাতে বললেন। এর পর মালয়ে আরও দুটি ডিভিসন গড়বেন তাও তিনি বললেন।

নেতাজী রেঙ্গুনে তাঁর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের নতুন সদর দপ্তর খোলবার অনুমতি চাইলেন। তিনি জাপানদের অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কর্তৃত্বভার তাঁর সরকারের উপর ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তাছাড়া সরকারকে নতুন ব্যাঙ্ক নোট ছাপতে হবে। পরিত্যক্ত ভারতীয় সম্পত্তির ভারও তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে।

টোজো নেতাজীর সব কথাই প্রায় মেনে নিলেন। তিনি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের উপর ছেড়ে দিতে চাইলেন, নোট ছাপারও অনুমতি দিলেন, পরিত্যক্ত ভারতীয় সম্পত্তির ভারও নেতাজীর উপর ছেড়ে দিলেন। বাকি যুদ্ধগত প্রশ্নগুলি যুদ্ধ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা হবার পর মিটিয়ে ফেলার কথা দিলেন। এ সব ব্যাপারে তিনি নেতাজীকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

৫ই ও ৬ই নভেম্বর টোকিওর পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো দূরপ্রাচ্যের মহাসম্মেলন। সেখানে নেতাজী বললেন, এই ধরনের সংগঠন থেকে কালক্রমে গড়ে উঠবে এক বিশ্বসংস্থা। বৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের যে যুদ্ধ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সারা বিশ্বের স্বার্থ। তিনি বললেন,

ভারতবর্ষ হতে যদি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করা না যায়, তাহলে পরাধীন মুসলিম দেশগুলির পক্ষে বৃটিশের বন্ধন ছিঁড়ে হারানো স্বাধীনতা পুনরায় উদ্ধার করা শুধু দুঃসাধ্য নয় অসম্ভবও বটে।

নেতাজী চান ভারতের স্বাধীনতা আর পূর্ব এশিয়া হতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপসারণ। সম্মেলনে যে সব দেশ এসেছে তাদের সবার চেয়ে এ যুদ্ধে বেশী মূল্য দিতে হবে ভারতকে। কারণ তাদের কাছে প্রশ্ন হলো স্বাধীনতা রক্ষা করার আর ভারতের সমস্যা হলো স্বাধীনতা অর্জনের।

জাপানী প্রধানমন্ত্রী টোজো ও সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বলার পর বলতে উঠেছিলেন নেতাজী। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা ভাল হলো সবচেয়ে বেশী। সবচেয়ে বেশী প্রশংসা পেলেন তিনি।

সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সবাই বেশ বুঝতে পারলেন রাজনৈতিক খ্যাতি ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে নেতাজী বোসের সমকক্ষ রাষ্ট্রনেতা তখন শুধু টোকিও নয়, সারা পূর্ব এশিয়ার কোথাও নেই।

জাপান সম্রাটের সঙ্গেও দেখা করলেন নেতাজী। জাপানে প্রচুর সম্মান পেলেন সব জায়গায়। বহু জনসভায় ডাকা হলো তাঁকে। এ্যাকাডেমি, ক্যাডেট কলেজ, অস্ত্র কারখানা সব ঘুরিয়ে দেখানো হলো।

নেতাজী সম্পর্কে সম্মেলনের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের ধারনা থেকে বোঝা যায় তাঁরা কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন নেতাজীকে।

প্রধানমন্ত্রী টোজো বললেন, এক যুদ্ধবিশারদ রাজনীতিবিদ হিসাবে

দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে সম্মেলনে প্রবেশ করলেন তিনি। তাঁর কথাগুলি যেমন অকুণ্ঠ ও অভ্রান্ত তেমনি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ।

মাঞ্চুরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চো বললেন, তাঁকে দেখে মনে হলো, তিনি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তাঁকে দেখে আরও মনে হয়, তিনি যেন এক যুদ্ধ জাহাজের প্রধান ক্যাপ্টেন যিনি একের পর এক বহু ঝড়ের মুখে পড়েছেন, কিন্তু কেমন করে নিরাপদে জাহাজ ভেড়াতে হয় বন্দরে তা ভালভাবেই জানেন।

ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি বললেন, তিনি একজন ভাল বাগ্মী। তাঁর নিষ্ঠা ও আদর্শ মানুষের চোখে জল আনে।

শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডের যুবরাজ বললেন, তিনি বড় ভদ্র ও মার্জিত। দেশের ঐতিহ্য সচেতন এক মহান ব্যক্তি। জগৎসভার মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে জানেন।

ব্রহ্মদেশের ব মাউ বললেন, তাঁর কথা শুনে মনে হয় তিনি যেন টাটকা যুদ্ধফেরৎ এক সৈনিক; শত্রুসৈন্যের প্রতি আঘাত হানার জন্য সব সময় প্রস্তুত। এক স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ এশিয়া গড়ে তোলার কাজে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত।

এশিয়ার জাতিগুলির কাছে নেতাজীর আসল পরিচয় এইখানে। নেতাজী শুধু ভারতের স্বাধীনতা চান না; তিনি চান এশিয়ার সমস্ত দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে। শুধু ভারত নয়, এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধিই তাঁর কাম্য।

জাপান থেকে চলে যাওয়ার আগে টোজো ঘোষণা করলেন, জাপান আজাদ হিন্দ সরকারকে যে সাহায্য করতে চায় তার প্রমাণ স্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের উপর ছেড়ে দিতে চায়।

আন্দামান ও নিকোবর ছিল তখন জাপানের গুরুত্বপূর্ণ নৌ ঘাঁটি। তবু জাপান তা এককথায় ছেড়ে দিল নেতাজীকে। নেতাজী নতুন

নাম দিলেন এই দুটি দ্বীপের শহীদ-স্বরাজ দ্বীপ। আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত একজন ভারতীয় চীফ কমিশনার নিযুক্ত হলো।

এর পর জাপ সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তা সুগিয়ামার সঙ্গে দেখা করলেন নেতাজী। ১৯৪৪ সাল অর্থাৎ আগামী বছরে বর্মা অঞ্চলে যুদ্ধ করার সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সেনাপতির অধীনে মিত্রবাহিনী রূপে যুদ্ধ করবে—এ বিষয়ে সুগিয়ামার মত আদায় করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা ও কর্তব্য কি তা ঠিক করবে বর্মার সেনাধ্যক্ষ।

নতুন বছরের শুরুতেই প্রথম ডিভিসন ও নেতাজীর নিজস্ব বেসামরিক হেড কোয়ার্টার রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিসন গড়ার অনুমতিও আদায় করলেন নেতাজী। সৈন্যদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করলেন।

আরও ঠিক হলো, আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে যে সব সৈন্য প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীদের ভিতর থেকে নেয়া হয়েছে তাদের ব্যয়ভার বহন করবে জাপান এবং যারা বেসামরিক লোকদের ভিতর থেকে এসে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে তাদের খরচ চালাবে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার। আর বৃটিশের কাছ থেকে যে সব অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করা হয়েছে তাতেই চলে যাবে।

টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন নেতাজী ১৮ই নভেম্বর। ফেরার পথে নানকিং, সাংহাই, ম্যানিলা ও সাইগন—এই চারটি জায়গা সফর করতে হবে।

যেখানেই গেলেন বড় দরের একজন আন্তর্জাতিক নেতার উপযুক্ত সমাদর ও সম্মান পেলেন সব জায়গায়।

সাংহাই থেকে এক বেতার বক্তৃতায় চিয়াং কাইশেকের কাছে এক আবেদন জানিয়ে বললেন, জাপানের সঙ্গে চীন এমন এক সম্মানজনক চুক্তি করুক যাতে চীন থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারিত হয়।

সফর শেষে সিঙ্গাপুরে ফিরলেন ২৫শে নভেম্বর। ফিরে এসেই আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান হেড কোয়ার্টার ও মন্ত্রীসভা বর্মায় নিয়ে যাবার কাজগুলি সারতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ডিভিসন গড়ে তোলার কাজও চলতে লাগল।

এস, এ, আয়ার ছিলেন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার বিভাগের মন্ত্রী। তিনি 'আনটু হিম এ উইটনেস' বইখানিতে নেতাজীর ব্যক্তি জীবনের অনেক কথা লিখে গেছেন।

যেদিন রাত জেগে কাজ করতে হত সেদিন রাতের খাওয়ার পর কফি খেতেন নেতাজী। এক একদিন কাজ করতে করতে রাত কেটে যেত। ১৯৪৩ সালের ২০শে অক্টোবর সারা রাত ধরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্রটি লেখেন।

নেতাজী পান ও সিগারেট খেতেন। তবে সিগারেট খুব বেশী খেতেন। উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলে একটার পর একটা সিগারেট ধরাতেন আর একেবারে শেষ পর্যন্ত সিগারেট মুখে রেখে দিতেন। তিনি ব্যাডমিণ্টন খেলতে ভালবাসতেন। চায়ের নেশা ছিল খুব বেশী। প্রায় সব সময় চা হলেই ভাল হয়। এ ছাড়া তাঁর খাওয়া পড়ার ব্যাপারে কোন বিলাসিতা ছিল না। নিজে খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তবে কোন অতিথি এলে তিনি মুক্ত হস্তে খরচ করতেন।

নেতাজীর কাছে প্রায় সব সময় একটি ছোট ঝুলি থাকত। তার মধ্যে থাকত জপের মালা, ছোট্ট একখানা গীতা আর পড়াশুনোর জন্য আর একটা চশমা। সিঙ্গাপুরে থাকার সময় তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের সঙ্গে অবসর সময়ে বসে তত্ত্ব আলোচনা করতেন। এক একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠে গাড়ি করে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে সিল্কের গেরুয়া কাপড় পরে একটি রুদ্ধদ্বার ঘরে বসে জপের মালা নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন।

কাজে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। এমন অনলস অক্লান্তভাবে

কাজ করে যেতেন যে খাওয়ার কথা তাঁর মনেই থাকত না। নেতাজী জন্তু জানোয়ার পুষতে ভালবাসতেন। কাজের ফাঁকে একটু সময় পেলেই পোষা জন্তু জানোয়ারদের দেখাশোনা করতেন। রেঙ্গুনে থাকার সময় তাঁর একপাল বাঁদর, খরগোস, হাঁস, রাজহাঁস আর একটা টাট্টুঘোড়া ছিল। তবে তিনি বিড়াল একেবারেই পছন্দ করতেন না। ঘরোয়াভাবে অনেক সময় তাঁকে দেখে খুব হিসেবী মনে হত। অনেক দিন চাকরকে ডেকে জিনিসপত্রের দাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কলার দাম সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাইতেন। গাড়ির গতিবেগ নিয়ে অনেক সময় ড্রাইভারকে বলতেন। কিন্তু আবার কোন গরীব কিছু সাহায্যের জন্য এলে যাতে শুধু হাতে না ফেরে সেদিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

দৃঢ়তা ও উদারতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা ছিল নেতাজীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সৈনিকদের খাওয়া দাওয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি সব সময় কড়া নজর রাখতেন। এক একদিন খাওয়ার সময় তিনি নিজে সাধারণ সৈন্যদের মাঝখানে গিয়ে খাওয়ার জন্য বসে পড়তেন। এক সঙ্গে বসে খেতেন। সৈনিকদের সঙ্গে বিকালে ব্যাডমিন্টন খেলতেন। তিনি বলতেন খাওয়ার ব্যাপারে সাধারণ সৈনিক ও অফিসারের মধ্যে কোন ভেদ থাকবে না। তিনি নিজে ব্যক্তিজীবনেও কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধাভোগ পছন্দ করতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে কতদিন কত সামান্য জিনিস সবাই মিলে সমানভাবে ভাগ করে খেয়েছেন। নিজে একটুও বেশী নেননি।

তিনি যেমন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিককে ভালবাসতেন তেমনি প্রতিটি সৈনিকও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। তিনি একবার ৪ঠা জুলাই তারিখে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বলেছিলেন, যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার মনস্থ করেছে তারা সব সময় নিজেদের ফকির বলে মনে করবে। মনে ভাববে তোমাদের বন্দুক নেই, ট্যাঙ্ক নেই, বিমান বা অস্ত্রশস্ত্র

ও রসদ নেই, বিলাসিতা করার মত অঢেল টাকা নেই। নেতাজীর দিল্লী অভিযানের প্রতিদানস্বরূপ আমি তোমাদের দিতে পারি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম আর পরিশেষে মৃত্যু···স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ তোমরা আমায় তোমাদের রক্ত দাও, আমি তোমাদের দেশের স্বাধীনতা এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা তখন উত্তর করেছিল, নেতাজী, আমাদের রক্তপাতের দ্বারা যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তাহলে আমরা এমন রক্তপাত করব যাতে মনিপুরের বুকের উপর দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে যাবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বীর সৈনিকরা সত্যিই কথা রেখেছিল তাদের। পরের বছর মনিপুরে যখন যুদ্ধ হয় তখন সত্যি সত্যিই আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের রক্তে নদী বয়ে গিয়েছিল মনিপুরের সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়ে। প্রায় চার হাজার সৈনিক নিহত হয় সেই ভীষণ যুদ্ধে। তার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান সব ধর্মের লোকই ছিল। সকলের লক্ষ্য ছিল এক—এক অখণ্ড স্বাধীন ভারত।

ডিসেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় ডিভিসন গঠিত হলো। এর পর তৃতীয় ডিভিসনের কথাও ভাবা হলো। তবে অনভ্যস্ত দৈহিক কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেক সৈনিক শিক্ষার সময় পালিয়ে যেতে লাগল। তখন এক হুকুমনামা জারি করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হলো, অন্যান্য সৈন্য বাহিনার মত আজাদ হিন্দ ফৌজের দলত্যাগ ও ষড়যন্ত্র মৃত্যুদণ্ডনীয় অপরাধ। সৈন্যদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা আনার জন্য প্রচার অভিযান চালাতে লাগলেন নেতাজী।

টোকিও থেকে ফিরে এসেই পাঁচ দিনের সফরে জাভা ও সুমাত্রা যেতে হলো নেতাজীকে। ওখান থেকে যেতে হবে আন্দামান। সেখান থেকে রেঙ্গুন যাবার আগে শ্যাম।

সুমাত্রা ও জাভা দুটি দ্বীপে ভারতীয়দের বহু জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। বহু ধনী ভারতীয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করলেন। তার ফলও ভালই পেলেন। নগদ ও প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে পনের লক্ষ গিলডার চাঁদা তুললেন।

১৯শে ডিসেম্বর তারিখে আন্দামান দ্বীপের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে নামলেন নেতাজী। জাপানী নৌসেনাধ্যক্ষ স্বাগত জানালেন তাঁকে। আগে বৃটিশ চীফ কমিশনার যে কুঠিতে থাকত সেইখানে রাখা হলো তাঁকে।

পৌরপ্রধানের কাছ থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের স্বাধীনতা নিজের হাতে গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ সরকারের দখল সূচিত করলেন। দ্বীপের প্রতিরক্ষা পরিদর্শন করার পর জেলখানা দেখতে গেলেন। যে সব জেলখানায় একদিন তিনি নিজে ও ভারতের বহু বিপ্লবী আবদ্ধ থেকেছেন দিনের পর দিন, সেই সব জেলখানা দেখতে দেখতে আবেগে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের একজন প্রবীণ অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল লোকনাথন। তাঁকেই চীফ কমিশনার নিযুক্ত করার কথা ভাবলেন নেতাজী। ঠিক হলো আন্দামানের বেসামরিক শাসনভার থাকবে ভারতীয় চীফ কমিশনারের হাতে। তবে যতদিন যুদ্ধ চলবে পুরো সামরিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা চলবে না। জাপানী সেনাধ্যক্ষ জানিয়ে দিলেন।

পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সোজা গেলেন ব্যাঙ্ককে। একবার রেঙ্গুনে গিয়ে পড়লে কাজের চাপে আর এখন বেরোতে পারবেন না। কোথাও যাওয়া হবে না। তাই শ্যামদেশ সফরের কাজটা এখনই সেরে ফেলতে হবে।

শ্যাম সরকারের রাজকীয় অতিথিরূপে অভ্যর্থনা জানানো হলো নেতাজীকে। তাঁকে কাছে পেয়ে খুশিতে ফেটে পড়ল শ্যামের অধিবাসীরা। আনন্দ ও উৎবের সমারোহ পড়ে গেল তাঁকে ঘিরে।

॥ ছাব্বিশ ॥

১৯৪৪ সাল। এই বছরেই ভারত আক্রমণ করতে হবে। ঠিক আক্রমণ বলা চলে না। বৃটিশের শাসনপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে ভারতকে। আর দেরি করা চলে না। আর সবুর সয় না। অন্তরে ধৈর্য আর ধারণ করে রাখতে পারেন না নেতাজী।

তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়ে নেতাজী রেঙ্গুনে এসে পৌছলেন ৪ঠা জানুয়ারি। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন ব্রিগেড থেকে বাছাই করা সৈন্যদের নিয়ে গঠিত প্রথম ডিভিসন বা সুভাষ ব্রিগেড। সৈন্যরা এর আগেই এসে গেছে সিঙ্গাপুর থেকে। সুভাষ ব্রিগেডের সৈন্যরা দুটি দলে ভাগ হয়ে গত নভেম্বর মাসে তাইপিং থেকে রওনা হয় রেঙ্গুনের পথে।

তাইপিং রেল স্টেশানে যেদিন সৈন্যরা যাত্রা শুরু করে, সেদিন স্টেশানে এক সকরুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। সে দৃশ্য বড়ই মর্মান্তিক। যে সব আহত ও শরীরের দিক থেকে অসমর্থ সৈন্যদের ডাক্তার তাইপিংয়েই থেকে যেতে বলেছে তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য জেদ ধরে। তারা ট্রেনের সামনে লাইনের উপর গিয়ে বসে পড়ে। তাদের যেতে না দিলে ট্রেন ছাড়তে দেবে না। তারা বলল, আমরা ত নেতাজীকে বলেছি, যে আমাদের দেশমাতার জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করব। কেন তবে আমাদের এখানে ফেলে রেখে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে?

আহত ভারতীয় সৈনিকদের দেশপ্রেম দেখে সেদিন অবাক হয়ে যায় অনেকে। সবাই বুঝতে পারল একমাত্র নেতাজীর জন্যই পরাজিত ও আহত সৈনিকদের নীতিবোধ এতখানি উন্নত হয়েছে; দেশাত্মবোধে তাদের সমগ্র সত্তা এমন করে সংহত হতে পেরেছে;

নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ছেড়ে যন্ত্রণাকাতর দেহগুলিকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে এমন করে।

তাইপিং থেকে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছতে সৈন্যদের লাগল পাঁচ সপ্তাহ। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিক দেশপ্রেমে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে তখন যে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে চায়। যে কোন ধরনের দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে অবলীলাক্রমে সহ্য করতে চায়।

একটি দীর্ঘ পথ একবার আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা আশী পাউণ্ড ওজনের বোঝা কাঁধে দুই দিনে হেঁটে শেষ করে। অথচ সেই একই পথ জাপানী সৈন্যরা পাঁচ দিনে হেঁটে শেষ করে। একদিন জাপানী সামরিক কর্তা তেরাউচি জাপ সৈন্যদের মত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা কষ্ট সহ্য করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন নেতাজীর কাছে। কিন্তু দেখা গেল সে সন্দেহ একেবারে ভুল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসনের সৈন্যরা সব এসে গেছে। তারা যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যানবাহন ও খাওয়া পরার কতকগুলি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। প্রথম সমস্যা হলো, অস্ত্রশস্ত্র ও আহতদের বহন করার জন্য কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয়ত চিন পাহাড় ও কালাদান উপত্যকায় যেখানে গিয়ে তাদের যুদ্ধ করতে হবে সেখানে বড় শীত। অথচ তাদের একটি করে গরম শার্ট আর একটি করে সূতীর চাদর ছাড়া আর কিছুই নেই। কালাদান উপত্যকায় মশা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অত্যন্ত ভয়াবহ। কিন্তু সৈন্যদের কোন মশারি নেই। তাদের জরুরী অবস্থাকালীন কোন রেশনের ব্যবস্থাও নেই।

রেঙ্গুনে তাঁর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করার কাজ সেরেই ব্রহ্মদেশে জাপ প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে বসে আসন্ন ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিলেন।

কাওয়াবে বললেন, জাপানী সৈন্যরা এগিয়ে যাবে। আর আজাদ হিন্দ বাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে মিশে থাকবে। এই একটি ডিভিসনের সৈন্যদের দিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধক্ষমতা যাচাই হবে।

নেতাজী কিন্তু তা মানতে পারলেন না। তিনি বললেন, তাহলে আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকবে না। তবে সুভাষ ব্রিগেডকে বড় জোর তিনটি ব্যাটেলিয়ানে ভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু এই সব ইউনিটের ভার ভারতীয় অফিসারদের হাতেই থাকবে। আজাদ হিন্দ বাহিনীগুলি এক একটি স্বতন্ত্র বাহিনীরূপেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে। তবে তারা জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে একই যুদ্ধ কৌশল অনুসরণ করে যাবে।

ব্রহ্মদেশে জাপানীদের সৈন্যসংখ্যা তখন দুই লক্ষ তিরিশ হাজার আর আজাদ হিন্দ ফৌজের সুভাষ ব্রিগেডের সৈন্যসংখ্যা মাত্র তিন হাজার। তবু আজাদ হিন্দ ফৌজকে তুচ্ছ ভাবতে পারলেন না কাওয়াবে। তবু তাঁকে নেতাজীর কথাই মেনে নিতে হলো অপ্রতিবাদে। নেতাজী অবশ্য ভারতীয়দের নিয়ে আরও কতকগুলি ডিভিসন গড়ে তুলতে চান। প্রথম ডিভিসন যুদ্ধে নামছে। আরও দুটি ডিভিসন তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়াও আরও পাঁচটি ডিভিসন গড়ে তোলার ইচ্ছা আছে নেতাজীর।

জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে সব সামরিক কথাবার্তা ঠিক করে এবার সৈন্যদের সুবিধা সুযোগের দিকে নজর দিলেন নেতাজী। সঙ্গে সঙ্গে টাকা যোগাড় ও নতুন সৈন্য সংগ্রহের কাজও চলতে লাগল।

এই সময় দিন রাত খাটতেন নেতাজী। রোজ সৈন্যদের কুচকাওয়াজ ও মহড়া দেখতেন। রাত্রিতে অফিসের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন।

জাপানীদের বর্মা অভিযানের পরিকল্পনা হয় প্রথম ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে। জাপ বাহিনীর সেনাপতি মুতাগুচিই প্রথম ইম্ফল

আক্রমণের কথা ভাবেন। তাঁরই হাতে আক্রমণের ছক তৈরি হয়। কিন্তু ইম্ফল আক্রমণের আগে করতে হবে আরাকান আক্রমণ। সীমান্তবর্তী পাহাড়গুলিতে জাপানের ঘাঁটিগুলিতে রক্ষাব্যূহ রচনা আর বৃটিশের বর্মা আক্রমণ রদ করাই ছিল জাপানী অভিযানের লক্ষ্য। ১৯৪৪ সালে বৃটিশের বর্মা আক্রমণের কথা আছে।

আরাকান আক্রমণ করলেই বৃটিশ চট্টগ্রাম ও পূর্ববঙ্গে সীমান্ত রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে আর সেই সুযোগে জাপ সৈন্যরা ইম্ফল ও কোহিমা দখল করে নেবে। নেতাজী আরও এগিয়ে যেতে চান।

সুভাষ রেজিমেন্টের প্রথম দল রওনা হলো ৩রা ফেব্রুয়ারি। তিন দিনের মধ্যে সব দলগুলিই রওনা হয়ে যাবে রণাঙ্গনের পথে। তাদের বিদায় দিতে গিয়ে আবেগে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে নেতাজীর। আয়ত চোখ দুটি অবাধ্য অশ্রুধারায় ভিজে যায়। তবু কিছু বলতে হয়। সাহস দিতে হয়। নিজের আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করে দিতে হয় ওদের মধ্যে। নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিদায় দিয়ে বললেন,

রক্তের ডাক এসেছে। শুধু জাগো। এক মুহূর্তও আর দেরি করো না। অস্ত্র হাতে নাও। আমাদের পথপ্রদর্শকরা যে রাস্তা গড়ে গেছেন তোমার সামনে, সেই পথ দিয়েই আমরা যাব। শত্রুপক্ষের সারি ভেদ করে আমরা পথ করে নেব। আর ঈশ্বর যদি চান, আমরা মৃত্যুবরণ করে শহীদ হব। আমাদের বাহিনী যে পথে দিল্লী যাবে, চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে সেই পথ আমরা চুম্বন করব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। দিল্লী চলো।

এর আগে ২৭শে জানুয়ারি জেনারেল শাহ নওয়াজ জাপ প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁকে বলা হয়, তোমার সুভাষ ব্রিগেডই প্রথম আজাদ হিন্দ বাহিনী যাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে। সুতরাং তাদের গতিবিধি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করা হবে

এবং দেখা হবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা জাপানী সৈন্যদের মত কষ্ট সহ্য করে যুদ্ধ করতে পারবে কি না।

শাহ নওয়াজ বললেন, আমরা যে কোন কষ্টের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত।

তখন জাপ সেনাপতি দরকারী নির্দেশাদি দিয়ে দিলেন। ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তে বৃটিশদের অবস্থিতি ও তাদের শক্তির সম্ভাব্য পরিমাণের কথাও বললেন। জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর করণীয় কর্তব্যগুলি বুঝিয়ে দিলেন।

এক নম্বর সুভাষ ব্রিগেড তিনটি ব্যাটেলিয়নে ভাগ হলো। প্রথম ব্যাটেলিয়ন গেল প্রোম আর বাকি দুটি ব্যাটেলিয়ন গেল মান্দালয়। সুভাষ ব্রিগেডের সৈন্য ছাড়াও আরও কিছু খুচরো সৈন্য গেল। তারা আট দশ জনের এক একটি দলে ভাগ হয়ে জাপ বাহিনীর সঙ্গে ছড়িয়ে থেকে নাশকতা ও গুপ্তচরের কাজ করে যাবে।

ফ্রন্টে যাবার পথে জাপানী সৈন্যরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করত। দিনের বেলায় জঙ্গলে বিশ্রাম করত সবাই। ভারতীয় ও জাপ সৈন্যরা পরস্পরের ভাষা বুঝত না। দোভাষী ছিল। তবু মাঝে মাঝে দোভাষীর সাহায্যেই গল্প হত। বিশেষ করে জাপানী মিলিটারি অফিসাররা অল্প অল্প যে ইংরিজি জানতেন তাই দিয়ে ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে বেশ গল্প জমিয়ে তুলতেন।

জাপানী ভাষায় আজাদ হিন্দ বাহিনীকে বলা হত, 'ইণ্ডো কোকো মিনগুণ,' সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপানীরা বলত চন্দ্র বোস আর রাসবিহারী বসুকে বলত বিহারী বোস। নেতাজীকে তারা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। একদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন ডাক্তার মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে কথাপ্রসঙ্গে নেতাজী সম্বন্ধে একজন জাপানী অফিসার বলেছিল, He is a great man.

I can die thousand times if I can once shake hand with him.

একবার তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে পেলে আমি হাজার বার মরতে পারি। এক জন জাপানী সামরিক অফিসারের কাছ থেকে একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান ডাক্তার বসু।

১৭ই জানুয়ারি নেতাজীর 'এগিয়ে চলো' শীর্ষক একটি লেখা আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে বিলি করা হয়। তাতে লেখা ছিল, ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তে আমরা শুধু একা যাচ্ছি না। আমাদের বন্ধুরা যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করছেন, তাঁরাও আসছেন আমাদের পিছনে। ভারতে প্রবেশ ও আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা আমাদের দেহ মন উৎসর্গ করেছি। পথ আমাদের বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য আমাদের এক, যে কোন পথই নিয়ে যাবে আমাদের একই গন্তব্য স্থলে। আর সে গন্তব্যস্থল হচ্ছে দিল্লী, ভারতের রাজধানী।

লেখাটিতে আরও বলা হয়, আমরা আমাদের মিত্রপক্ষের উপর পূর্ণ আস্থা রাখি, এবং আমরা যে শেষে জয়লাভ করবই এ বিষয়ে নিশ্চিত।

ব্রহ্মদেশে আসার কিছুদিন পরই নেতাজী খবর পান গান্ধীজীর স্ত্রী শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী পুনার একটি জেলে আবদ্ধ থাকার সময় মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর।

নেতাজী কস্তুরবা সম্বন্ধে বললেন, সমগ্র ভারতবাসীর কাছে তিনি ছিলেন মায়ের মত, মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। শোকসন্তপ্ত গান্ধীজীর প্রতি জানাচ্ছি আমার গভীরতম সহানুভূতি। কস্তুরবা শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি চার মাস ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন। ভারতবাসী তাঁর অসুখের কারণে তাঁকে মুক্তি দেবার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে কাতর আবেদন জানানো সত্ত্বেও সে আবেদনে সাড়া দেয়নি বৃটিশ। তারা সুপরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ডা

মাথায় কস্তুরবাকে মেরেছে। তারা ভেবেছিল কস্তুরবাকে এই ভাবে মারতে পারলে গান্ধীজীর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়বে এবং তিনি বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। যারা মুখে স্বাধীনতা, নীতি ও ন্যায়বিচারের জন্য যুদ্ধ করছি বলে মানুষকে এমন সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করে সেই সব বর্বরদের আমি ঘৃণা করি।

বর্মা থেকে ভারতবর্ষ কাছে। তাই বর্মা অভিযানকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষে ঢুকতে চেয়েছিলেন নেতাজী। তিনি ভেবেছিলেন, ভারতে আজাদ হিন্দ ফৌজ ঢুকলেই সেখানেও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গড়ে উঠবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের মনোবল ও দেশপ্রেম দেখে ইংরেজের অধীনস্থ ভারতীয় সৈন্যরাও ইংরেজের বিরুদ্ধে বেঁকে বসবে।

কিন্তু আর দেরি করা চলে না। যুদ্ধে অক্ষশক্তির অবস্থা খুব ভাল নয়। তাই ভারতবাসীর মনোবল কমে আসছে। তারা আপোষ করতে পারে বৃটিশের সঙ্গে।

তবে এই অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ থাকবে সবচেয়ে সামনে। সামনে থেকে তারা যাবে এগিয়ে। জাপানীরা থাকবে পিছনে। জাপানী সৈন্য আগে থাকলে ভারতবাসীরা ভাববে জাপান ভারত আক্রমণ করতে এসেছে। ভারতবাসীরা বৃটিশকে শত্রু বলে মনে করলেও জাপানকে মিত্র বলে মনে করে না। সুতরাং সেটা ঠিক হবে না।

ঠিক হয়, আগামী মার্চ মাসের প্রথমেই আজাদ হিন্দ ও জাপ-বাহিনী সম্মিলিতভাবে ভারত আক্রমণ করবে। এই আক্রমণে জাপানের ১৫তম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত তিনটি ডিভিসনকে কাজে লাগানো হবে।

তিনটি ডিভিসনকে স্থাপন করা হবে চিন্দোউইন নদীর বাঁদিকে। একটি ডিভিসন ইম্ফলের উত্তরে কোহিমা আক্রমণ করবে। আর একটি ডিভিসন পূর্বদিক থেকে ইম্ফল আক্রমণ করবে। আর

একটি ডিভিসন আগেই চিন্দোউইন নদী পার হয়ে ইম্ফলের দিকে এগিয়ে গেছে।

সব ডিভিসনই প্রস্তুত হয়ে আছে। শুধু হুকুমের অপেক্ষা। আজাদ হিন্দ ফৌজও জাপ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাজ করে যাবে। তাদের সাহায্য করবে। কথা আছে আজাদ হিন্দ ফৌজের সব ব্যাটেলিয়ানগুলিই সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন হয়ে রণাঙ্গনে যাবে।

এক একটি ব্যাটেলিয়ান আসে আর নেতাজী তাদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে তাদের উৎসাহ দেন। প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে তাদের শিরায় শিরায় সঞ্চালিত করে দেন দেশাত্মবোধের উত্তেজনা। তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দের সৈন্যরা চীৎকার ওঠে 'দিল্লী চলো, চলো দিল্লী।'

একবার একটি ঘটনায় নেতাজীর সাহস দেখে অবাক হয়ে যায় সবাই। এক দিন সৈন্যদের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন নেতাজী। নেতাজীর বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। এবার সৈন্যদের প্যারেড শুরু হবে; এমন সময় হঠাৎ বিমান আক্রমণের সতর্ক ধ্বনি শোনা গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুবিমান উড়ছে মাথার উপর।

সভায় অনেক ব্রহ্মদেশীয় নেতা ছিলেন। তাঁরা সতর্ক ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে যার নিরাপদ জায়গায় পালাবার জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন। জাপ সামরিক অফিসাররা তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কিছু তাঁরা যখন মঞ্চে নেতাজীর দিকে তাকালেন তখন দেখলেন, নেতাজী শান্তভাবে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্থির অবিচল ও অকম্পিত। তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের নির্দেশ দিলেন, সৈন্যদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও।

সেদিন সেই অবস্থায় নেতাজীকে যাঁরা দেখেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে না পারলে কখনো এতখানি নির্ভীক হতে পারে না।

খবর আসে আরাকানে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম অভিযান সফল হয়েছে। আরাকানের মায়ু উপত্যকায় আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ ভারতের ৭ম ডিভিসনকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন মেজর এন, এস, মিশ্র, আর মেজর মেহার দাস আরাকানে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। তিনি কৌশলে শত্রুদের একটি ঘাঁটি ঘিরে ফেলে দখল করে নেন। নেতাজী এখবর শুনে মন্তব্য করেন, জাপানের বিজয় অভিযানের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খবর পেয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের উৎসাহ আর উদ্দীপনা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। জাপ সৈন্যরাও সাহস পায়।

এই আরাকান ফ্রন্টে যুদ্ধে বীরত্ব দেখানোর জন্য লেফটেন্যান্ট হরি সিং শের-ই-হিন্দ পদক লাভ করেন। এই পদকের সম্মান বৃটিশের ভিক্টোরিয়া- ক্রসের সমান। হরি সিং একা সাত জন বৃটিশ অফিসারকে হত্যা করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নম্বর গেরিলা বাহিনী তখন তিনটি দলে ভাগ হয়ে আরাকান, বিষেণপুর ও কোহিমা অঞ্চলে যুদ্ধ করছিল।

নেতাজী তখনও রেঙ্গুনে। ভারতে গুপ্তচর পাঠাবার জন্য কতকগুলি ট্রেনিং স্কুল খুলেছিলেন নেতাজী। স্কুলগুলি চলত নেতাজীর নির্দেশে। প্রথমে জাপানীরা আপত্তি জানায়। পরে যখন খবর আসে গুপ্তচররা সাফল্যের সঙ্গে ভারতে গিয়ে ও সেখান থেকে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এসে অভিযানে সাহায্য করছে বিশেষভাবে তখন আর আপত্তি করল না।

আজাদ হিন্দ ও জাপ বাহিনীর সম্মিলিত অভিযানের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল শত্রুপক্ষ। ভয়ও পেল প্রচুর। ওদিকে সম্মিলিত বাহিনী অবাধে চিন্দোউইন নদী পার হয়ে গেল। সৈন্যদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল আরও।

এর পর তারা যাবে ইম্ফল হয়ে ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তে। ঠিক এই সময় কর্ণেল পি, কে সাইগলের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি

দল জাপ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য হাকা কালাম অঞ্চল ত্যাগ করে ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তের পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেল। ২২শে মার্চ তারিখে রেঙ্গুন হতে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়করূপে এক বিবৃতি প্রচার করে তাঁর ভারত অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের জন্ম হয়েছে। তার পরই আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা তাদের দেশমাতার মুক্তির জন্য ব্রহ্মদেশের আরাকানে প্রথম মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে।

এবার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে দ্বিতীয় অভিযান শুরু করেছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করেছে এবং দিল্লীর পথে এগিয়ে চলেছে।

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার ভারতের জনগণকে অনুরোধ করছে, তাঁরা যেন এই সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দান করেন এবং ইঙ্গ-আমেরিকার যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে নাশকতামূলক কাজের দ্বারা ব্যর্থ করে দেন। তাঁরা যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের জন্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেন।

আজাদ হিন্দ সরকার আরও বলে, যে সব ভারতীয় সৈন্য বৃটিশ সৈন্যদলের পক্ষে কাজ করছেন তাঁরা যেন অত্যাচারী শাসকদের হয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন এবং আমাদের দিকে চলে আসেন। যে সব ভারতীয় অফিসার বৃটিশ সরকারের অধীনে কাজ করবেন তাঁরাও যেন আমাদের এই ধর্মযুদ্ধে সাহায্য করেন। আমরা ভারতীয় জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি একমাত্র যারা বৃটিশের হাতের পুতুল তারা ছাড়া আর কারো ভয়ের কোন কারণ নেই। আমরা কথা দিচ্ছি, যে সব অঞ্চল বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হবে সেই সব অঞ্চলেই আমরা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত করব। আমরা অনুরোধ করছি, সব ভারতবাসী যেন ইঙ্গ-আমেরিকার বিমান বন্দর, অস্ত্র

কারখানা ও সামরিক ঘাঁটিগুলি থেকে দূরে দূরে থাকেন, তাহলে আমাদের আক্রমণের ফলে তাদের আহত হবার কোন ভয় থাকবে না।

আমাদের ভাই বোনেরা! আজ আমাদের বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হবার সময় এসেছে। তোমরা সকলেই যদি যুদ্ধে যোগ দাও তাহলেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারি। এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা সকল ভারতবাসীকে তাঁদের কর্তব্য পালনের জন্য আহ্বান করছি।

জাপান আগেই বলে দিয়েছে যুদ্ধে যে সব অঞ্চল সম্মিলিত বাহিনী জয় করবে তা সব আজাদ হিন্দ সরকারের দখলে আসবে। নেতাজী বলেছেন, সে সব অঞ্চলে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সরকার বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনা করবে। যেমন করছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

যুদ্ধের সময় বিজিত অঞ্চলে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার কতকগুলি পুনর্গঠনের দায়িত্ব থাকে। এই দায়িত্ব পালনের কাজ শেখাবার জন্য সিঙ্গাপুরের পুনর্গঠন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন নেতাজী। কিন্তু সেই সব শিক্ষনপ্রাপ্ত লোকরা এসে না পড়ায় নেতাজী লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জিকে বিজিত অঞ্চলগুলির প্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

বিজিত অঞ্চলগুলি শাসন করা কঠিন কাজ। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার করা, ভারতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজগুলি খুব তাড়াতাড়ি সারতে হয়। নেতাজীর ইচ্ছা ভারত যদি সত্যি সত্যিই জয় করতে পারা যায় তাহলে সেখানে যত দিন না গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যতদিন একটি রাজনৈতিক দল তার এক বিশেষ রাষ্ট্রাদর্শ, এক একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী ও পরিকল্পনা নিয়ে শাসন ভার গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে না আসে ততদিন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারই সেখানে

শাসনকার্য চালিয়ে যাবে। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি তৈরি করবে।

গত ২৪শে জানুয়ারি রেঙ্গুনে জাপানীদের একজন সামরিক বড়কর্তা জেনারেল কাটাকুরার সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার অধিবেশন হয়। সেখানে নেতাজী আর জেনারেল কাটাকুরা ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল শাহ নওয়াজও ছিলেন। আসন্ন অভিযানে জাপানীরা কি কি সমরকৌশল প্রয়োগ করবে তা খুলে বলে নেতাজীকে। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে নেতাজীর জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হয়ে যান জেনারেল কাটাকুরা। নেতাজীর অনেক পরামর্শ মেনে নেন।

জেনারেল কাটাকুরা একবার বলেন, পদাতিক সৈন্যদল ভারতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জাপান বিমান আক্রমণ শুরু করে দেবে কলকাতায়। নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করবে।

নেতাজী তাতে আপত্তি জানিয়ে বললেন, সেটা ঠিক হবে না। বেসামরিক লোকদের উপর অযথা বোমাবর্ষণ করলে লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাদের দুঃখকষ্ট বেড়ে যাবে। ফলে আমার উপর ভারতীয়দের আস্থা যাবে কমে।

তখন কাটাকুরা নেতাজীর কথা মেনে নিলেন।

শুধু আরাকানে নয়, খবর পাওয়া গেল আজাদ হিন্দ বাহিনী কোহিমা অঞ্চলেও খুব ভাল কাজ করছে। সেখানে মেজর মেহার দাস ছাড়াও আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালনা করছিলেন, গুরবচন সিং, সোহনলাল, মহম্মদ হোসেন ও লেফটেনাণ্ট আসিফ।

সুভাষ ব্রিগেডের এক নম্বর ব্যাটেলিয়নের পি, এস, রাতুরির নেতৃত্বে যে দলটি ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারি রেঙ্গুন থেকে ট্রেনে করে প্রোম রওনা হয়েছিল তারা প্রোমে এসে দেখল, শত্রুদের বোমাবর্ষণের ফলে রেল লাইন, ব্রীজ ও রাস্তাঘাটের ক্ষতি হয়েছে সেখানে।

প্রোম থেকে তংগাপ একশো মাইলের পথ। হেঁটে যেতে হলো সেনাদলকে। তংগাপের শিবিরের উপর হলো আবার বোমাবর্ষণ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ষোল জন প্রাণ হারালেন। নদীপথে যে সব নৌকোগুলো সৈন্যদের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেই নৌকোগুলো অনেকগুলি বোমা ও মেশিনগানের গুলির আঘাতে ডুবে গেল। তংগাপ থেকে যেতে হবে মিও হয়ে পুরো দেড়শো মাইলের পথ।

দিনকতক পর খবর এল বৃটিশদের পক্ষ থেকে পশ্চিম আফ্রিকার সৈন্যদের এক বিরাট ডিভিসন কালাদান নদীর দক্ষিণ দিক বরাবর এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা নির্মাণ করে আসছে। আর একটি রাস্তা তৈরি হচ্ছিল পশ্চিম উপকূলে। এই দুটি রাস্তাকে যুক্ত করে কালাদান নদীর উপর একটি পুল তৈরি করছিল নিগ্রোরা। জায়গাটার নাম তেতমা গাঁ।

পি, এস, রাতুরির উপর হুকুম হলো শত্রুপক্ষের নিগ্রোরা কালাদান নদী অতিক্রম করার আগেই তাদের বাধা দাও।

হুকুম পেয়ে রাতুরি তিনশো জনের তিনটি গেরিলা দল নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন, তার আগেই ওরা নদী পার হয়ে এপারে এসে পাহাড়ের মাঝখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।

তবু তাদের আক্রমণ করবেন বলে ঠিক করে ফেললেন রাতুরি। তেতমা গাঁয়ের দুদিকে শত্রুরা ঢুকে ছিল। তাই ঘন বাঁশবনের ভিতর দিয়ে গাঁটাকে সাঁড়াশির মত ঘিরে ফেলে দখল করে ফেললেন রাতুরি। কিন্তু শুধু তেতমা গাঁ দখল করলেই হবে না। আরও এগিয়ে যেতে হবে। যেতে হবে কালাদান উপত্যকায়। খবর পেলেন সেখানে একটি পাহাড়ে শত্রুপক্ষের একটি গোটা ব্যাটেলিয়ান ঘাঁটি করে আছে।

মেজর রাতুরি রাত্রিকালে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু ঘাঁটির উপর। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা চীৎকার করে উঠল, ভারত মাতা কি জয়, নেতাজী কি জয়।

দেশপ্রেমের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা এমন ভাবে যুদ্ধ করতে লাগল যে শত্রুরা একে একে পিছু হটতে

লাগল। অবশেষে তারা ঘাঁটি ছেড়ে নদীতে ছুটে গেল। সেখানে নৌকো করে ওপারে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা নৌকোয় চাপলেই এধার থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা মেশিনগান থেকে গুলি করে অনেক নৌকো ডুবিয়ে দিল। তারা ওপারে গিয়ে ওপার থেকে দারুণভাবে কামান দাগতে লাগল। ফলে আজাদ হিন্দের চৌদ্দজন মারা গেল এবং বাইশ জন আহত হলো।

অন্যদিকে শত্রুদের আড়াইশো জন মারা গেল। তাছাড়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হলো।

সকাল হতেই অনেক জাপানী সৈন্য এসে গেল।

॥ সাতাশ ॥

এপ্রিল মাস পড়তেই জাপানী সৈন্য ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগল। কোহিমাতে শত্রুদের প্রধান ঘাঁটি এসে পড়ল জাপানীদের হাতে ৬ই এপ্রিল তারিখে। জাপানীদের ১৫তম ডিভিসন আর আজাদ হিন্দ ফৌজের কিয়ানি ডিভিসন দুদিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছিল ইম্ফলের দিকে। এইভাবে সম্মিলিত বাহিনী দুদিক থেকে অবরোধ করল ইম্ফলকে। নিশ্চিত হয়ে উঠল ইম্ফলের পতন।

৪ঠা এপ্রিল তারিখে আর একটি প্রচারপত্র বিলি করলেন নেতাজী। তাতে ভারতবাসীদের জানালেন, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার তোমাদেরই সরকার। এই সরকারের একমাত্র কাজ হলো অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি হতে বৃটিশ ও আমেরিকানদের তাড়িয়ে দেয়া এবং ভারতীয় জনগণের ইচ্ছা অনুসারে এক স্থায়ী সরকার গড়ে তোলা। ভারত পুরোপুরি স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী সরকার সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

কাজের মাঝে ডুবে থাকলেও মাঝে মাঝে মোহন সিংএর কথাটা মনে পড়ে নেতাজীর। সিঙ্গাপুর থেকে আসবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর ব্যাপারটার কোন নিষ্পত্তি করতে পারেননি।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং সত্যিই একজন যোগ্য লোক, দূর প্রাচ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ইতিহাসের সঙ্গে অমর হয়ে থাকবে তাঁর নাম। কিন্তু বর্তমানে জাপানীরা তাঁর উপর রেগে আছে, তাছাড়া তিনি অসুস্থ। তাই ভাল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাসহ কোন এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি নেতাজী।

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর মালয়ে বৃটিশের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকেই বহু ভারতীয় সৈন্য বৃটিশের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়। ক্যাপ্টেন মোহন সিং নামে একজন ভারতীয় মিলিটারি অফিসার মিত্রার কাছে যুদ্ধে জাপানীদের হাতে ধরা পড়েন।

যে সব ভারতীয় সৈন্য ধরা পড়ত তাদের বন্দী করে রাখত না জাপানীরা। জাপানীরা ঠিক তাদের শত্রু বলেও দেখত না। ভাবত ওরা বৃটিশদের অধীনস্থ প্রজা হিসাবে বাধ্য হয়েই তাদের পক্ষে যুদ্ধ করছে। এই সব ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে তারা পুলিশের কাজ করাত। আবার যুদ্ধের কাজও করিয়ে নিত। জাপানীরা যখন মালয়ের পর সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে তখন এই ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের অনেক সাহায্য করে।

ক্যাপ্টেন মোহন এই সব ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরে বৃটিশ পক্ষ থেকে জেনারেল পারসিভ্যাল জাপানী সেনাপতি ইয়ামাশিতার কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পক্ষের অনেক ভারতীয়

সৈন্যও জাপানীদের হাতে ধরা দেয়। তখন জাপানীদের পক্ষ থেকে মেজর ফুজিয়ারা সমস্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ভার মেজর মোহন সিংএর হাতে তুলে দেন।

মোহন সিং এই সব ভারতীয় সৈন্যদের সংহত করে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' বা ভারতের জাতীয় বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীই হলো পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিত্তি। তখন কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ সরকারীভাবে গঠিত হয়নি আর জাপান সরকারও সরকারীভাবে মেনে নেয়নি এ ফৌজ।

পরে মালয়ে ভারতীয়দের এক সভা আহ্বান করা হয়। সে সভায় জাপানীদের তরফ থেকে মেজর ফুজিয়ারা বলেন, তোমরা আই, এন, এর অধীনে একত্র হয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। জাপান সে যুদ্ধে তোমাদের সব দিক দিয়ে সাহায্য করবে।

ভারতীয়েরা কিন্তু জাপানীদের এ প্রস্তাবটাকে ভালভাবে নিতে পারেনি। তারা ভেবেছিল, এটা বোধহয় জাপানের দুরভিসন্ধি। তার মানে ভারত থেকে বৃটিশকে তাড়িয়ে জাপান নিজেই সেখানে কায়েম হয়ে বসতে চায়। একটা সাম্রাজ্যবাদীকে তাড়িয়ে অন্য আর এক সাম্রাজ্যবাদীর কবলে পড়ে লাভ কি? তাই সেদিন ফুজিয়ারার কথায় বিশেষ সায় দেয়নি মালয়ের ভারতীয়েরা।

বাংলার বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসু তখন জাপানের টোকিওতে ছিলেন। তিনি কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারলেন না জাপানীদের কথাটাকে। তিনি টোকিওতে মালয় ও শ্যাম দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক সভা আহ্বান করলেন। একটি বিমান ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্যাঙ্কক থেকে টোকিও যাবার পথে দুর্ঘটনায় পড়ে এবং তাতে স্বামী সত্যানন্দ, প্রীতম সিং প্রভৃতি চারজন ভারতীয় প্রতিনিধি মারা যান। তা সত্ত্বেও ২৮শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত সম্মেলন ঠিকই হয় আর তাতে জাপান, চীন, মালয় ও

শ্যামদেশের বহু ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাসবিহারী বসু।

এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়, দূর প্রাচ্যের ভারতীয়েরা 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ' নামে এক সরকারী দল গঠন করবেন। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা। এই স্বাধীনতার অর্থ হলো, ভারতভূমি থেকে যে কোন ধরনের বিদেশী অধিকার ও প্রভাবের উচ্ছেদ করা।

আরও ঠিক হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে ভারতীয়দের একটি নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করা হবে।

এর পর এই সভার একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জুন মাসে ব্যাঙ্ককে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিদের আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় শ্যামদেশ ছাড়া সুমাত্রা, জাভা, ইন্দোচীন, হংকং, বর্মা ও মালয় থেকে একশো জন ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করেন। ভারতীয় যুদ্ধবন্দী শিবির থেকেও অনেক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন সেই সভায়।

এই সভায় সরকারীভাবে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লীগের আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হয় তিনটি কথা—একতা, বিশ্বাস ও বলিদান। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের জন্য কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান থাকবে। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস থাকবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যথাসর্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বলি দেবার জন্য সভ্যরা প্রস্তুত থাকবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটি স্বাধীন সেনাদল গঠন করে একটি সমর পরিষদের উপর তার ভার দেয়া হয়। ঠিক হয় এই সেনাদল জাপানী সেনাদলের সমপর্যায়ে গঠিত হবে এবং স্বাধীন সেনাদল হিসাবে এ সেনাদলকে মেনে নিতে হবে। এই সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হবে আর শুধু ভারতের

স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই এই সেনাবাহিনী ব্যবহৃত হবে, অন্য কাজে নয়।

একজন সভাপতি ও চারজন সভ্য নিয়ে সমর পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সভাপতি হন রাসবিহারী বসু আর সভ্য নির্বাচিত হন ক্যাপ্টেন মোহন সিং, এন, রাঘবন, কে, পি, কে, মেনন ও জি, কিউ, গিলানী।

আরও ঠিক হয় ভারতীয়দের জাপানীরা শত্রু জাতি হিসাবে গণ্য করতে পারবে না এবং কোন ভারতীয়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না।

ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

সুভাষচন্দ্র বসুকে বার্লিন থেকে পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে আসার জন্য জাপানীদের অনুরোধ করা হবে।

টোকিও থেকে রাসবিহারী বসু চলে এলেন সিঙ্গাপুরে। পুরো দমে চলতে লাগল লীগের কাজ। চারদিকে খোলা হলো লীগের শাখা প্রশাখা। এক মহান উদ্দেশ্যে একত্রিত করা হলো এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়দের।

এদিকে সৈন্যদের সামরিক শিক্ষার কাজও শুরু হলো। ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর প্রভাব ছিল সৈন্যদের উপর। তাঁর অধীনে সৈন্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে লাগল। তাঁর কথায় বন্দী শিবির থেকে আরও সৈন্য এসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করল।

সব কিছু ভালই চলছিল। কিন্তু গোল বাধল একদিনের একটি ঘটনায়। লীগের গঠনতন্ত্রে আছে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হবে। সেখানে জাপানী অফিসারদের খবরদারি চলবে না।

বহু বেসামরিক লোক ভারতীয় লীগের সভ্য হন। তাঁদের সামরিক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা শিবির খোলা হয়। পেনাঙে

এমনি একটি স্বরাজ ইনস্টিটিউট নামে শিক্ষা শিবির খোলা হয়। বহু ভারতীয় যুবক সেখানে শিক্ষালাভ করত।

একদিন রাত্রে ভারতীয় অফিসারদের না জানিয়ে হঠাৎ জনকতক বড়দরের জাপানী মিলিটারি অফিসার পেনাঙের শিক্ষাশিবিরে গিয়ে কয়েকজন স্বাস্থ্যবান শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবককে লরিতে করে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

লীগের পক্ষ থেকে এই কাজের প্রতিবাদ করা হয়। তখন জাপানীরা বলে, পঞ্চম বাহিনীর কাজ করার জন্য এই সব যুবককে সাবমেরিণে করে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছে।

লীগের তরফ থেকে তখন বলা হয়, সমর পরিষদকে আগে এ ব্যাপারে জানানো উচিত ছিল।

সমর পরিষদের বিনা অনুমতিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজে এ ভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয়নি জাপানীদের। এই কাজের প্রতিবাদ হিসাবে সমর পরিষদের সভ্যরা একযোগে পদত্যাগ করেন।

ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর প্রতিবাদ হয়ে ওঠে সবচেয়ে তীব্র। কারণ তিনিই আজাদ হিন্দ ফৌজকে সর্বপ্রথম নিজের হাতে গড়ে তোলেন। তিনি দেখলেন জাপানীদের এই স্বেচ্ছাচারিতা এখন অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে না পারলে পরে লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সব আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবে। তাই জাপানীদের পক্ষ থেকে এর একটি সুস্পষ্ট প্রতিকার দাবী করেন মোহন সিং।

কিন্তু হঠাৎ মোহন সিংকে বন্দী করে যুদ্ধবন্দী শিবিরে পাঠিয়ে দেয় জাপানীরা। মোহন সিংকে বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ত্যাগ করে অনেক সৈন্যও স্বেচ্ছায় বন্দী শিবিরে ফিরে যায়। রাসবিহারী বসু মিটমাটের অনেক চেষ্টা করেন। টোকিও গিয়ে প্রধানমন্ত্রী টোজোর সঙ্গেও দেখা করেন। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় না। মোহন সিংকে ছাড়তে চায় না জাপানীরা।

এই ঘটনার পর থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসাররা সন্দেহ করতে থাকেন জাপানীদের এবং সুভাষচন্দ্রকে বার্লিন থেকে আনার জন্য চাপ দিতে থাকেন। তাঁদের ধারণা, নেতাজী বোস এসে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভারতীয়দের মন থেকে সব সন্দেহ ঘুচে যাবে। আরও অনেক ভারতীয় সৈন্য যোগদান করবে আজাদ হিন্দ ফৌজে।

ক্যাপ্টেন মোহন সিংও তাই ভেবেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় বন্দীশিবিরে তখন তিনি দিন কাটালেও মনের জোর কিছুমাত্র কমেনি তাঁর। নেতাজীর অধীনে তিনিও কাজ করতে চান। ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন সফল করতে চান।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারে মোহন সিংকে নেয়া হয়নি। তা না হোক। নেতাজীকে তখনও তিনি চোখে দেখতে পাননি। তা না পান। তবু তিনি কাজ করতে চান। মুক্তি চান। অবশেষে যখন শুনলেন নেতাজী ফ্রন্টে চলে যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নেই তখন আর থাকতে পারলেন না মোহন সিং। মোহন সিংএর ব্যাপারে কিছু করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েক জন উঁচু দরের অফিসার চাপ দিতে থাকেন নেতাজীকে। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরাও অস্বস্তি বোধ করছিলেন অনেক দিন ধরে। তাঁদের কথায় মোহন সিংএর কাছে গিয়ে দেখা করেন নেতাজী। কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে সৈন্যদলে সেই মুহূর্তে নিতে পারলেন না। তাঁর হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বন্দীশিবির থেকে কোন এক স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

মোহন সিংএর কথাটা বেশী করে মনে পড়ল নেতাজীর ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে। হিকারি কিকান দলের নতুন নেতা জেনারেল ইশোদার সঙ্গে একটি ব্যাপারে যখন তীব্র মতবিরোধ হলো নেতাজীর, তখন তিনিও ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর মতই তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন।

এপ্রিল মাসে ভারতীয় সৈন্যদের জন্য হিকারি কিকান কয়েকটি ইস্তাহার ছাপায়। যে এলাকায় ইস্তাহারগুলি বিলি করা হয় সেই এলাকার জাপানী সেনাপতির স্বাক্ষর ছিল ইস্তাহারে। নেতাজী বা তাঁর কোন প্রতিনিধির স্বাক্ষর তাতে নেয়া হয়নি। নেতাজীকে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। ইস্তাহারটি তাঁকে দেখানো না হওয়ায় অত্যন্ত রেগে যান নেতাজী। ইশোদাকে ডেকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন। সাবধান করে দেন, ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের কাজ না হয়।

জাপান সরকারের উপর মহলে নেতাজীর প্রভাব কতখানি তা ইশোদা জানতেন বলেই নেতাজীর সমস্ত তিরস্কার মাথা পেতে সহ্য করলেন তিনি।

প্রথম ডিভিসনের আরও দুটি ব্যাটেলিয়নের যুদ্ধে যেতে বাকি ছিল। তারা যাত্রা শুরু করল মার্চ মাসের গোড়ার দিকে। সৈন্যবাহী ট্রেনগুলি বিদায়ের জন্য স্টেশনে প্রস্তুত হতেই বক্তৃতা দিতে হয় নেতাজীকে। মনোবল সঞ্চার করতে হয় সৈন্যদের মধ্যে। খবর দিয়ে ফ্রন্ট থেকে মেজর মিশ্রকেও আনানো হয়। মেজর মিশ্র এসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা আরাকান ফ্রন্টে কেমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে তা বর্ণনা করেন। বীর যোদ্ধাদের অনেকে পদক পেয়ে সম্মানিত হলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সাফল্যের কথা শুনে উত্তেজিত হয় সৈন্যরা। ওরা যাবে প্রথমে মান্দালয়। তারপর ইম্ফল। নেতাজী নিজে যাবেন দিনকতক পরে।

১৯শে মার্চের পর থেকে জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মিলিত বাহিনী ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে ভারত সীমান্তের দিকে। দুর্বার হয়ে ওঠে তাদের গতি। অধিকৃত অঞ্চলগুলি আগের চুক্তি অনুসারে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের শাসনাধীনে আসে। কর্ণেল চ্যাটার্জী আগেই অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত

হয়েছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেসামরিক সরবরাহ ও শাসনের সব ব্যবস্থা করতে হয় তাঁকে।

নেতাজী তখনও রেঙ্গুনে। ২৪শে মার্চ অধিকৃত অঞ্চলের দখল ও শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে নেতাজী ও জেনারেল কাওয়ারের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জাপ-ভারত শ্রমিক বোর্ডের সভাপতি কে হবে তাই নিয়ে মতবিরোধ হয় দুজনের মধ্যে।

জাপানীরা চায় বোর্ডের সভাপতি হবে তাদেরই কেউ।

নেতাজী আপত্তি জানিয়ে বললেন, অধিকৃত অঞ্চল যখন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে তখন সেই সরকারই ঠিক করবে কে সভাপতি হবে।

মান্দালয়ের কাছে মেমিও নামে ছোট্ট একটি পাহাড়ী শহর আছে। সেখানে আজাদ হিন্দ দল পৌঁছল মার্চের শেষের দিকে। ছোটখাটো একটা হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতে হবে সেখানে। নেতাজী এসে পৌঁছবেন এপ্রিলের প্রথমে।

কিন্তু আজাদ হিন্দ দল মেমিওতে পৌঁছে দেখল, জাপানীদের একটি অর্থনৈতিক কমিশন বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারত যাবার উদ্যোগ করছে। আজাদ হিন্দ দলের লোকেরা খোঁজ নিয়ে জানেন, নেতাজীকে বিষয়টি জানানো হয়নি।

দলের লোকদের হাতে জাপানীদের কয়েকটি গোপন দলিল এল তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তাঁরা। সেই দলিলগুলি পড়লে ভারত সম্বন্ধে জাপানীদের কতকগুলি আপত্তিকর অভিসন্ধির কথা জানতে পারা যায়।

আজাদ হিন্দের নেতারা এ বিষয়ে নেতাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। রেঙ্গুনে খবর দিলেন। ব্রহ্মদেশের মত ভারতকেও হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে চেয়েছিল জাপান। তাদের মতে যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধের প্রয়োজনে অধিকৃত এলাকায় মোটামুটি একটা সামরিক কর্তৃত্বের দরকার হয়।

সব কথা শুনে নেতাজী বললেন, এতে অতখানি ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। জাপানীদের আসল অভিসন্ধি যাই থাক, আমাদের ভয়ের কিছু নেই।

নেতাজী ভালভাবেই জানেন তাঁর যা রাজনৈতিক প্রভাব আছে তা দিয়ে জাপানীদের যে কোন অভিসন্ধিকেই বানচাল করে দিতে পারবেন তিনি।

রেঙ্গুন থেকে মেমিওতে এলেন সুভাষচন্দ্র ৭ই এপ্রিল তারিখে। এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ রেঙ্গুনে তখন ভীষণ গুমোট গরম। তার তুলনায় মেমিও তখন বেশ ঠাণ্ডা।

খবর পাওয়া গেল ইম্ফল অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি অংশ তখন নেমে পড়েছে। আর একটি অংশ এগিয়ে চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। আশা করা যাচ্ছে ইম্ফলের পতন ঘটতে সপ্তাহ তিনেক লাগবে।

কিন্তু ইম্ফলের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপও দারুণ বাড়বে। বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজকে আরও বড় করে তুলতে হবে। আরও বড় অভিযানের জন্য তৈরি হতে হবে।

নেতাজী ঘোষণা করলেন, ইউরোপে এর আগে যে ভারতীয় বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে সে বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজেরই একটি অংশ। নাম্বিয়ারকে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীপদ দেয়া হলো।

আন্দামানে নেতাজী যে চীফ কমিশনার নিযুক্ত করেছেন তিনি বেশ ভালই কাজ চালাচ্ছেন।

ইম্ফল আর বেশী দূরে নেই। ওদিকে আজাদ হিন্দ বাহিনী যতই ভারতের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে উষ্ণনিবিড় এক আনন্দের উত্তেজনায় ততই সারা দেহ কাঁপতে থাকে

নেতাজীর। আশার ঢেউ ফুলে ফুলে উঠতে থাকে মনে। ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। আর দেরি নেই।

মেমিও থেকেই ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করল আজাদ হিন্দ সরকার। তাতে বলা হলো, ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র বৈধ সরকার হলো অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার। আজাদ হিন্দ ফৌজকে ও অস্থায়ী সরকারের নিযুক্ত বেসামরিক কর্মচারিদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য ভারতীয় জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে অস্থায়ী সরকার।

এই সঙ্গে ভারতীয়দের ধনপ্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এই ঘোষণাপত্রটি ১৯৪৪ সালের ৩০শে এপ্রিল আজাদ হিন্দ গেজেটে প্রকাশিত হল।

মেমিওতে তখন মুতাগুচি ও নেতাজী দুজনেই ছিলেন। নেতাজী তখন জনসভায় বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও শাসন ব্যবস্থার কতকগুলি দিক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ডাক টিকিট তখন ছাপা হচ্ছে। জাপানী ব্যাঙ্ক মারফৎ কাজ চলবে না। মুদ্রাপ্রচলন ও অর্থ সংক্রান্ত সব ভার থাকবে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের উপর। ব্যাঙ্ক নোটের নমুনাও ছাপা হতে চলেছে। কর্ণেল চ্যাটার্জীকে জাপ ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করছেন এ বিষয়ে।

নেতাজী সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকেন। কোন সময় বসে থাকেন না কিন্তু মুতাগুচি বড় আরামপ্রিয় আর অলস। তিনি নিজে একজন সেনাপতি। তাঁর সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করছে। কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর কোন মাথা ব্যথা নেই। শুধু কি হচ্ছে না হচ্ছে দিনে একবার খবরটা শুনেই ক্ষান্ত।

মুতাগুচি ফুল ভালবাসেন। তিনি তাঁর কোয়ার্টারে গোলাপ ফুলের বাগান নিয়ে ব্যস্ত। যুদ্ধ সম্বন্ধে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যা করবার আমার অফিসাররাই করছে ; আমি কিছু জানি না।

নেতাজী এক সময় মুতাগুচিকে বললেন, ইম্ফল-কোহিমার সংযোগ পথ যেন বিচ্ছিন্ন না করা হয়। কারণ পালাবার পথ পেলে বৃটিশ ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করবে। তাই তাদের পালাবার পথ ঠিক রাখা উচিত।

কিন্তু নেতাজীর এ পরামর্শ নিলেন না মুতাগুচি। তিনি বললেন, ইম্ফল এমন একটা মস্ত বড় খাল যেখানে আছে প্রকাণ্ড এক মাছ। আমি জাল ফেলে সেই মাছটাকে তুলতে চাই।

জালের মতই ইম্ফলকে চারিদিক হতে ঘিরে ফেলতে চান মুতাগুচি। তাছাড়া ইম্ফলের পতন সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় তিনি নিশ্চিত। অতি-আশা ভাল নয়। কিন্তু সেই অতি আশা পেয়ে বসেছিল মুতাগুচিকে।

তবে তার কারণও ছিল।

মনিপুরের ভিতর দিয়ে জাপানীরা তখন অব্যাহতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা কালাদান পার হয়ে পালতোয়া দখল করে ফেলেছে। এ ছাড়া টিডিম, তোংজাং, পালাম, আর কোর্ট হোয়াইট একে একে দখল করতে শুরু করেছে। বৃটিশদের সতের নম্বর ডিভিসন পালিয়ে যাচ্ছে। ইম্ফল-শিলচর পথ বিচ্ছিন্ন।

এই ধরনের এক বুলেটিন বৃটিশ অফিসারদের নামে চালানো হল জাপানীদের পক্ষ থেকে।

কিন্তু যা আশা করা হয়েছিল তা হলো না। এপ্রিলের শেষের দিকে মুতাগুচি দেখলেন, শুধু জাপ-বাহিনীর দ্বারা আর হবে না।

এবার আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাটেলিয়নকেও যুদ্ধে নামাতে হবে।

নেতাজী ভাবলেন, তা হয় ত হোক। ভালই। আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধে নেমে জাপানীদের জিতিয়ে দিলে তাদের গুরুত্ব বেড়ে যাবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন ইম্ফল থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। সেখান থেকে ডিভিসন কমাণ্ডার কিয়ানি লিখে পাঠালেন নেতাজীকে, সুভাষ রেজিমেন্টকেও তাঁদের সঙ্গে আবার যোগ দেয়া উচিত।

সুভাষ রেজিমেন্টের দুটি ব্যাটেলিয়ন তখন চিন পাহাড় এলাকায়। তাদের পরিচালনা করছিলেন জেনারেল শাহ নওয়াজ। তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চাইতেই তিনি তাঁদের দুরবস্থার কথা সব জানালেন। খাদ্য সরবরাহ নেই। মাল বহনের কোন ব্যবস্থা নেই। খাদ্য যেমন পরিমাণে কম, তেমনি গুণের দিক থেকে খারাপ। তার উপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও ওষুধপত্রের অভাব।

যাই হোক মুতাগুচি কথা দিলেন, সুভাষ রেজিমেন্ট যাতে কিয়ানির দলের সঙ্গে ইম্ফলে গিয়ে যোগ দিতে পারে তিনি তার ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে সরবরাহ ও যানবাহনের অভাবের কবলে তখন গোটা সৈন্যদলটাই পড়েছে।

মুতাগুচি আর মেমিওতে নেই। তাঁর ফুলের নেশা আর অতিরিক্ত জয়ের আশা ছুটে গেছে। তিনি যাওয়ার পর থেকে যুদ্ধের খবরাখবর পেতে কষ্ট হয় নেতাজীর। ছোট্ট শহর। তাই ১৯শে মে তারিখে রেঙ্গুনে ফিরে গেলেন নেতাজী। সেখানে অনেক কাজ জমে আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য এখনও অনেক সৈন্যবল ও অর্থবল দরকার। এই সময় সারা ব্রহ্মদেশে আই, এন, এর খরচ মাসে বিশ লক্ষ টাকা। তাছাড়া অধিকৃত এলাকায়

পুনর্গঠনের জন্য খরচ ক্রমশই বাড়ছে। অথচ জাপানী টাকার মূল্য কমছে।

২৯শে মে রেঙ্গুনে একটি জনসভায় নগদ ও দামী জিনিষ মিলিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত তুললেন নেতাজী। একজন ব্যবসায়ী সব সম্পত্তি দান করল। মেয়েরা গলার হার, কানের দুল প্রভৃতি সব গয়না ও টাকা যা কিছু সঞ্চয় ছিল তা সব দিয়ে দিল। টৌঙ্গুর কাছে একটি সুগার এস্টেটের ভারতীয় মালিক গোটা এস্টেটটি নেতাজীর হাতে তুলে দেন। নেতাজী এস্টেটটি ভারতীয় সম্পত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ঠিক হয় ওর যা কিছু লাভ আজাদ হিন্দ সরকারের রাজস্ব হিসাবে ধরা হবে। সমর পরিষদের একজন সদস্য রাঘবনকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে অর্থ দপ্তরের ভার দিলেন।

জুন মাস পড়তেই একটি দুঃসংবাদ শুনে রেঙ্গুন থেকে হঠাৎ সিঙ্গাপুর চলে যেতে হলো নেতাজীকে। পেনাং এ গুপ্তচর বৃত্তি শিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। ক্যাপ্টেন দুররানী ছিল তার প্রধান। সেই স্কুল থেকে গত মার্চের শেষের দিকে একদল ছাত্রকে জাপানীরা সাবমেরিণে করে ভারতে পাঠায় গুপ্তচরবৃত্তির জন্য। সেখানে যাওয়ার পর তারা বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। শুধু তাই নয় নয়াদিল্লী বেতারকেন্দ্র হতে প্রচার করতেও শুরু করে দেয়।

সবাই বলল, এটা ক্যাপ্টেন দুররানীর ষড়যন্ত্র। দুররানীর নির্দেশেই ওই ছাত্ররা আত্মসমর্পণ করেছে শত্রুদের কাছে। আসল কুবুদ্ধিটা যুগিয়েছে দুররানী।

খবর পেয়ে নেতাজী নিজে তদন্ত করার জন্য সিঙ্গাপুর চলে এলেন। এটা একটা গুরুতর অভিযোগ। বিদ্যাদরী যুদ্ধবন্দী শিবিরে একদিন দুপুর রাতে দুররানীর সঙ্গে দেখা করলেন নেতাজী। দুররানী যদি নিজে থেকে তার দোষ স্বীকার করে তাহলে ভাল। না করলে তার ভাগ্যে কষ্ট আছে।

নেতাজী দুররানীকে বললেন, আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ

হওয়া উচিত। আমি তোমাকে জাপানীদের গুলির হাত থেকে রেহাই দিয়েছি। তোমায় ভারতীয়েরা গুলি করবে। এজন্য তোমার গর্ব অনুভব করা উচিত।

তুররানী দোষ স্বীকার করল না। বলল, সে নির্দোষ। তখন আই, এন, এর অফিসাররা নানারকমের প্রশ্ন করে কথা বার করবার জন্য চেষ্টা করলেন। তাতেও ফল না হওয়ায় পীড়নের আদেশ দিলেন। নেতাজী এই সব পীড়ন অন্তরের সঙ্গে চাননি। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। তুররানীর ব্যাপারে তাঁরও একটা দায়িত্ব আছে। এ জন্য তার উপর কঠোর না হয়ে উপায় নেই।

আর একবার কঠোর হতে হয়েছিল নেতাজীকে। গত ২২শে এপ্রিল কে, পি, কে মেননকে জাপানী পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং সামরিক আদালতে বিচারে তার ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কে, পি, কে মেননের বয়স তখন ষাট বছর। তিনি আগে লীগের সমর পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে তিনি পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে লীগের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সব সময় জাপানকে ও নেতাজীকে প্রকাশ্যে গালাগালি দিয়ে বেড়াতেন।

জাপানকে অবিশ্বাস করতেন এবং নেতাজীকে সন্দেহ করতেন। নেতাজীকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। জাপানের থেকে নেতাজীর উপর মেননের রাগটা বেশী ছিল যেন। তিনি প্রায়ই সব লোককে ধরে ধরে বলতেন, তোমরা বল, বোস খুব কাজের লোক। হ্যাঁ খুব কাজের লোক, যেমন কাজের লোক আমার পোষা বাঁদরটা, এমন কাজের লোক যে তিনি সব সময় আগে কাজ করেন, পরে চিন্তা করেন।

নেতাজী বলতেন, ভারতকে স্বাধীন করার পর তার উন্নতির জন্য কিছু দিনের জন্য স্বৈরতন্ত্র চালাতে হবে। মেনন এটা বুঝতে পেরে বলল, নেতাজী ফ্যাসিবাদী।

এই সব অপরাধের জন্য মেননকে গ্রেপ্তার করে জাপানীরা খবর দেয় নেতাজীকে। কিন্তু নেতাজী এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে বা কোন কথা বলতে চাননি।

রেঙ্গুনে তখন বর্ষা পড়েছে। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা থাকে সব সময়। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে। তবু জয়ের আশা কমে না কিছুমাত্র। কোন সংশয়ের ছায়া দেখা যায় না কারো মনে।

রেঙ্গুনে নেতাজী সপ্তাহ পালনের আয়োজন চলে। সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে চলে আসেন নেতাজী। যুদ্ধের খবরাখবর রেঙ্গুন থেকেই সব-চেয়ে ভাল জানা যায়। নেতাজী এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলিকে মোট তিন ভাগে ভাগ করে দেন। প্রথমতঃ পূর্ব এশিয়ায় তাঁদের সরকারের যে সামরিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সেটাকে সুদৃঢ় করা, দ্বিতীয়তঃ অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে উন্নত ধরনের শাসন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা; তৃতীয়তঃ যে সব অঞ্চল এখনও শত্রুদের অধিকারে, সেগুলি দখল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।

নেতাজী খবর পেলেন, সুভাষ ব্রিগেডের মত আজাদ হিন্দ ফৌজের গান্ধী ব্রিগেডও ভাল কাজ করছে। প্রশংসনীয় বীরত্ব দেখিয়েছে টামু ফ্রন্টে প্যালেল বিমানঘাঁটি আক্রমণের সময়।

সুভাষ ব্রিগেডের ডাকে ও জাপানীদের অনুরোধে আজাদ হিন্দের গান্ধী ব্রিগেড এল, জে, কিয়ানির নেতৃত্বে ইম্ফল রওনা হয় এপ্রিল মাসে। কিন্তু তারা কিছুদূর যাবার পর জাপানীরা বলল, তোমাদের আসতে বড় দেরি হয়ে গেছে। তোমাদের ওখানে পৌছবার আগেই হয়ত ইম্ফলের পতন ঘটবে। অতএব এখন আর দেরি করো না। ভারী জিনিষ সব রেখে দিয়ে শুধু একটা করে রাইফেল আর একটা করে চাদর নিয়ে ছুটে চলে যাও। বাকি জিনিষ ওখানেই সব পাবে।

টামুতে এসে গান্ধী ব্রিগেড শোনে ইম্ফলের পতন তখনও হয়নি। ইম্ফল ফ্রন্টে তখন দারুণ যুদ্ধ হচ্ছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক

নম্বর ডিভিসনকে টামু-প্যালেল রোডে নতুন ঘাঁটি করে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

এই টামু-প্যালেল রোডের কাছে ছিল একটি বৃটিশ বিমানঘাঁটি। প্যালেল বিমানবন্দরের গুরুত্ব খুব বেশী বলে সেখানে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছিল বৃটিশরা। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নম্বর ডিভিসনের সঙ্গে জাপ সৈন্যরা মিলে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করছে।

মে মাসের প্রথম দিকে মেজর ফুজিয়ারা গান্ধী ব্রিগেডের নেতা কিয়ানিকে বললেন, জাপানী সৈন্যরা শত্রুপক্ষের প্যালেল বিমানঘাঁটি আক্রমণ করতে চায়। তিনি জানতে চান আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেবে কিনা।

মেজর ফুজিয়ারা কিয়ানিকে আরও বললেন, অবশ্য প্যালেল বিমানঘাঁটি আমরা দখল করবই। তবে আমি চাই আজাদ হিন্দ ফৌজ এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে জয়ের গৌরব অর্জন করুক। ফ্রণ্টে গিয়ে যুদ্ধ করার কথা হতে সব সৈন্যদের মনই উত্তেজনায় দুলে ওঠে। এই যুদ্ধের জন্যই গান্ধী ব্রিগেড এত কষ্ট করে এত পথ হেঁটে এসেছে।

কিয়ানি বললেন, এ ত সুখের কথা। নিশ্চয়ই এ আক্রমণে অংশ নেবে আমাদের ফৌজ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্যালেওয়াতে গান্ধী ব্রিগেডের সৈন্যরা জাপানীদের কথা শুনে তাড়াহুড়ো করে মেশিনগান ও হাতবোমাগুলো ফেলে রেখে এসেছে। তবু কিয়ানি ঠিক করলেন, মেজর প্রীতম সিংএর নেতৃত্বে তিনশো জন সৈন্যের একটি দল আক্রমণ করতে যাবে প্যালেল বিমানঘাঁটি।

অবশেষে শুরু হলো যাত্রা। আয়োজন উপকরণ বিশেষ কিছুই নেই। আছে শুধু উৎসাহ আর উদ্দীপনা, উদ্দেশ্য আর আদর্শের প্রতি অনমনীয় অখণ্ডনীয় সততা। হাতে রইল একটা করে রাইফেল আর স্বয়ংক্রিয় একটা করে যন্ত্র আর একদিনের করে রসদ। তাই দিয়ে শুরু হলো যাত্রা।

সামনে চল্লিশ মাইলের খাড়াই পাহাড়ী পথ। মাঝে মাঝে গভীর জঙ্গল আর খাদ। স্বচ্ছন্দে এই দুর্গম পথ পার হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা ঢুকল শত্রু এলাকার মধ্যে। চলে গেল প্যালেল বিমানঘাঁটির আশপাশের অঞ্চলে। ওরা ভাবল, শত্রুসৈন্য ও তাদের যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামের তুলনায় ওরা নিতান্তই নগণ্য। বিমানঘাঁটিতে ও আশেপাশে আছে প্রচুর সৈন্য আর যুদ্ধজাহাজ।

সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজ ঠিক করল, ওরা রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুদের উপর। গেরিলা যুদ্ধে কাবু করে দেবে শত্রু সৈন্যদের। তাই দিনের বেলায় জঙ্গলে ঢাকা একটা খাদের মধ্যে লুকিয়ে রইল ওরা।

রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতেই এগিয়ে গেলেন প্রীতম সিং তাঁর দলবল নিয়ে। এগিয়ে গেলেন বিমানঘাঁটির দিকে। দেখলেন, শত্রুসেনাদের জোর পাহারা বসে রয়েছে বিমানঘাঁটির চারিদিকে। সেই সব পাহারা ভেদ করে ঘাঁটিতে ঢোকা অসম্ভব।

প্রীতম সিং সাধু সিং নামে একজন অফিসারের অধীনে কিছু সৈন্য দিয়ে বললেন, শত্রুসৈন্যদের একটি পিকেটকে ঘিরে ফেল।

তারপর বাকি সৈন্যদের অন্য একজন অফিসারের নেতৃত্বে বিমানঘাঁটিতে ঢুকে গিয়ে আক্রমণ করার হুকুম দিলেন।

শত্রুপক্ষের পিকেটে অনেক সৈন্য। তাদের হাতে মেশিনগান ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে রাইফেলের সঙ্গীন উঁচিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রু সৈন্যদের উপর।

হঠাৎ আক্রমণে বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে পড়ল শত্রুসৈন্যরা। তারা হাত তুলে হিন্দুস্থানী ভাষায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে বলল, সাথী, আমাদের মেরো না।

নিজেরা আগে আক্রান্ত না হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন

সৈন্য যাতে কোন ভারতীয় সৈন্যকে না মারে সেবিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার লাল সিং তাই আত্মসমর্পণ-কারী সৈন্যদের না মেরে বিমানঘাঁটিতে ঢুকে পড়লেন দলের লোকদের নিয়ে। লাল সিংএর পিছনে আর একজন অফিসার লেফটেন্যান্ট মোহন সিং গেলেন আর একটি দল নিয়ে।

লাল সিংএর হাতে ছিল মাত্র একটি নাগা বর্শা। লাল সিংকে দেখে শত্রুপক্ষের সেনাপতি বলল, তোমরা এখন কি চাও ?

লাল সিং বললেন, যে দুজন বৃটিশ অফিসার ভিতরে লুকিয়েছে আমরা তাদের রক্ত চাই। এই বলে তাদের তাড়া করে এগিয়ে যেতেই ভিতর থেকে শত্রুরা গুলি করতে লাগল। কিন্তু লাল সিংএর দেহটা লুটিয়ে পড়বার আগেই সেই দুজন বৃটিশ অফিসারকে বর্শা দিয়েই মেরে ফেললেন লাল সিং।

এবার বোঝা গেল প্রথমে যে সব শত্রুসৈন্য আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে হাত তুলেছিল তারা ভাণ করেছিল মাত্র। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভিতরে গিয়ে তারা গুলি করতে শুরু করে।

তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। বেশ আলো ফুটে উঠেছে শুধু পাহাড় আর বনের মাথায় বেশ কিছু কুয়াশা জমে রয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজও তখন ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু দেখল সারা বিমানঘাঁটিটা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে এমন ভাবে ঘেরা আছে যে সেটাকে কিছুতেই দখল করা যাবে না। প্রীতম সিং তাই সৈন্যদের নিয়ে তাঁদের সেনাবাহিনীর সদরে ফিরে যাবার ঠিক করলেন।

প্রীতম সিং একথা মনে করতে না করতেই আজাদ হিন্দ ফৌজের আর একটি দল ভিতরে দখল করে ফেলে বিমানঘাঁটিটিকে। কিন্তু তারা ভিতরে গিয়ে জাপানী সৈন্যদের কোন পাত্তা পেল না। ঘাঁটিটিকে দখলে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে শত্রুপক্ষের

প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি করে ও তাদের সব বিমানগুলিকে ধ্বংস করে বেরিয়ে এল তারা।

এদিকে কর্ণেল কিয়ানিও তখন মেজর প্রীতম সিংকে সাহায্য করার জন্য অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। কিন্তু সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের বোমারু বিমানগুলি ক্রমাগত বোমা বর্ষণ করতে লাগল। ফলে ফেরার পথে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো আজাদ হিন্দ ফৌজের গান্ধী ব্রিগেড। সেদিন গান্ধী ব্রিগেডের প্রায় আড়াইশো জন সৈন্য নিহত হয়।

তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার ছিল মিথুন খুনৌতে। প্যালেল বিমানঘাঁটি আক্রমণের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের সব সৈন্য মিথুন খুনৌতে ফিরে এল।

শত্রুপক্ষ এটা জানতে পেরে মিথুন খুনৌ আক্রমণের জন্য তৈরি হতে লাগল। একজন বৃটিশ অফিসার প্রায়ই রাত্রিবেলায় লুকিয়ে এসে আজাদ হিন্দ ফৌজের পাহারাদার সৈন্যদের গুলি করবার চেষ্টা করত। কিয়ানি একদিন নিজে লুকিয়ে থেকে অতর্কিত আক্রমণে অফিসারটিকে হত্যা করেন।

দিনকতকের মধ্যেই বৃটিশপক্ষের একটি বড় সৈন্যদল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিথুন খুনৌ আক্রমণ করল। একজন তরুণ অফিসার সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আজাই সিংএর অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি সৈন্যদল সে আক্রমণকে প্রতিরোধ করল।

বৃটিশপক্ষের সৈন্যদলের সবাই ছিল শ্বেতাঙ্গ। তাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র জাতক্রোধে আগুন হয়ে উঠল যেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা। গান্ধী ব্রিগেডের সৈন্যরা এই প্রথম শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করছে। সুতরাং তাদের উৎসাহের আর শেষ নেই।

পরস্পর পরস্পকে যুদ্ধে আহ্বান করে খুব কাছাকাছি যুদ্ধ করতে লাগল। যুদ্ধ করতে করতে শত্রুপক্ষের সৈন্যরা প্রায় আজাদ

হিন্দ ফৌজের অধিকৃত পরিখাগুলির কাছে এসে পড়ল। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা তাদের তেড়ে নিয়ে গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা এতখানি বীরত্ব দেখাতে পারবে কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। বৃটিশ সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হলো সে বীরত্বের তীব্রতায়।

প্রথম চোটে হেরে গিয়ে পরে আরও অনেক ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর উড়োজাহাজ নিয়ে আবার আক্রমণ করল বৃটিশপক্ষ। আজাই সিংএর নেতৃত্বে আবার তাদের তেড়ে নিয়ে গেল আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা। এবার না পেরে শত্রুসৈন্যরা অনেকখানি পিছু হটে গেল। পরে দেখা গেল, যুদ্ধ বন্ধ করে ঘাঁটিতে ঢুকে পড়েছে তারা।

এত সহজে কিন্তু ক্ষান্ত হলেন না আজাই সিং। মৃত ও আহত শত্রুসৈন্যদের কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে নতুন করে তৈরি হয়ে এগিয়ে গেলেন আজাই সিং। শত্রুদের ঘাঁটির কাছে গিয়ে যুদ্ধ আহ্বান করলেন শত্রুসৈন্যদের কাছে।

আজাই সিং চীৎকার করে শত্রুদের লক্ষ্য করে বললেন, বেরিয়ে এসো। কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে নিরাপদ জায়গায় কাপুরুষের মত লুকিয়ে আছ কেন?

অবশেষে বৃটিশ পক্ষ বেরিয়ে না এসে পারল না। আবার যুদ্ধ হলো। এবারও হেরে গেল বৃটিশপক্ষ।

সন্ধ্যে হতেই বিজয়গৌরবে ফিরে এলেন আজাই সিং। সে দিন তরুণ যুবক আজাই সিংএর বীরত্ব আজাদ হিন্দ সম্বন্ধে বৃটিশদের ধারনা পাল্টে দিয়েছিল একেবারে। সেদিনকার সেই ভীষণ যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের মাত্র দশজন সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু শত্রুপক্ষের নিহত হয় পঞ্চাশ জন সৈন্য। আহতও হয় অনেকে। শত্রুপক্ষের অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করল আজাই সিং।

বৃটিশরা বলত ভারতের সব প্রদেশের লোকেরা যুদ্ধ করতে পারে

না। সামরিক যোগ্যতার দিক থেকে ভারতবাসীকে বৃটিশরা সামরিক ও অসামরিক এই দুই ভাগে ভাগ করে। বৃটিশদের মতে দক্ষিণ ভারতের লোকেরা যুদ্ধ পটু নয়। কিন্তু সেদিন দেখা গেল, আজাই সিংএর অধীনে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা মালয়ের তামিলভাষী ভারতবাসী।

আজাই সিং সেদিন দেখিয়ে দিলেন, উপযুক্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলে যে কোন ভারতবাসী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, তারা জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য চরম ত্যাগ করতে পারে।

এবার এধারেও জোর বর্ষা পড়ল। বর্ষার ফলে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহের খুব অসুবিধা হতে লাগল। উপযুক্ত খাদ্য ও ওষুধের অভাবে সৈন্যদের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে তাদের মাইল কতক হাঁটবারও ক্ষমতা নেই।

জুন মাসের মাঝামাঝি যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। আরও বহু সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ এনে বিশেষভাবে জোরদার করে তুলেছে ইম্ফলের ঘাঁটিকে। এবার তারা আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে সব দিক দিয়ে।

বৃটিশ পক্ষ প্রথমে চাইল মিথুন খুনৌতে যে উঁচু জায়গাটি দখল করে রেখেছে গান্ধী ব্রিগেড সেই জায়গাটি যুদ্ধের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেই মালভূমিটি প্রথমে দখল করতে চায় বৃটিশরা।

একদিন বৃটিশপক্ষের তিন হাজারের একটি সৈন্যদল আজাদ হিন্দ ফৌজকে আক্রমণ করল। ক্যাপ্টেন রাওএর অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই দলটিতে ছিল মাত্র ছয়শো সৈন্য। তাও আবার বেশীর ভাগ সৈন্যই অসুস্থ ও অর্ধভুক্ত।

অন্যদিকে বৃটিশ সৈন্যরা শুধু সুস্থ সবলই ছিল না, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল পরিমাণে বেশী আর উন্নত ধরনের। বৃটিশসৈন্যরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঘিরে ফেলল। ব্রিগেড কমাণ্ডার কিয়ানি

দেখলেন সেই উঁচু মালভূমিতে গোটা সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে যেতে না পারলে ওরা সব ধ্বংস করে ফেলবে। সমস্ত ঘাঁটিটাই বেদখল হয়ে যাবে। তাই লেফটেন্যাণ্ট মনস্থুখলালকে তিনি হুকুম দিলেন, ওধার থেকে শত্রুপক্ষরা যে উঁচু জায়গাটাকে দখল করেছে ওটাকে পুনরুদ্ধার করো।

মনস্থুখলালের অধীনে মাত্র তিরিশ জনের একটি ছোট সৈন্যদল ছিল। তাও আবার সৈন্যরা সবাই দুর্বল। তবু তাই নিয়ে শত্রুদের কামানের সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন মনস্থুখলাল। তাঁর গায়ে পর পর তেরটা গুলি লাগল। গা বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তবু সেই মালভূমিতে উঠে চলেছেন মনস্থুখলাল। ওটা দখল করতেই হবে।

আর একটু বাকি আছে। কিন্তু আর পারলেন না মনস্থুখলাল। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয়ের জন্য টলতে টলতে পড়ে গেলেন। মনস্থুখলাল পড়ে যেতেই তাঁর দলের সৈন্যরা কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

তা দেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে তাঁর দলের লোকদের বললেন মনস্থুখলাল, তোমরা এগিয়ে যাও, আমার জন্য ভাবতে হবে না।

বলতে বলতে তেরটা বুলেটের ক্ষত নিয়ে মনস্থুখলাল নিজেই উঠে গেলেন সেই মালভূমির চূড়ায়।

ওদিকে ক্যাপ্টেন রাওএর দল তখন যুদ্ধ করছে। কিন্তু রাওএর দলকে তখনও ঘিরে আছে বৃটিশপক্ষের সৈন্যরা। মনস্থুখলালের দলের সঙ্গে যুদ্ধে অনেক বৃটিশ সৈন্য নিযুক্ত হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে আজাই সিং একদল সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন রাওকে মুক্ত করবার জন্য ছুটে এলেন। এসেই বৃটিশসৈন্যের যে দলটি আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর ঘাঁটি ও ক্যাপ্টেন রাওকে ঘিরে রেখেছিল সেই গোটা দলটাকেই ঘিরে ফেললেন। তাদের পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিলেন।

আজাই সিংএর তেজ ও বীরত্বের কাছে টিকতে না পেরে ঘেরাও ছেড়ে পিছু হটবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোন পথ নেই। ফলে তাদের বহু সৈন্য নিহত ও আহত হলো। সেদিনকার যুদ্ধে প্রায় আড়াইশো জন বৃটিশ সৈন্য মারা যায়।

সন্ধ্যে হতেই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে নিজেদের ঘাঁটিতে চলে যায় বৃটিশ সৈন্যরা।

॥ আঠাশ ॥

জুন মাসের শেষাশেষি বর্ষা আরও ভীষণ হয়ে উঠল। প্রবল বৃষ্টি ধারায় ভেসে যেতে লাগল সব পথঘাট। ও দিককার একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা টামু-প্যালেল রোড জলে ডুবে যেতে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সব। খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ সব বন্ধ হয়ে গেল। এবার না খেয়ে মরতে হবে। কোন উপায় নেই।

এমন সময় কর্ণেল কিয়ানি এক বুদ্ধি বার করলেন। তাঁরা তখন যে অঞ্চলে ছিলেন সেটা আজাদ হিন্দ ফৌজ অধিকৃত ভারতভূমি। ও অঞ্চলের অধিবাসীরা সব নাগা। কর্ণেল কিয়ানি নাগা নেতাদের ডেকে বললেন, আমাদের রসদ নেই, সরবরাহ আসার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে যদি খাদ্য না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের টামুর দিকে চলে যেতে হবে।

নাগা প্রধানরা বলল, আপনারা ভারতের মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধা; আপনারা এখান থেকে যাবেন না। আমাদেরও অবশ্য খাদ্যের খুব কষ্ট যাচ্ছে। তবু যেমন করেই হোক আপনাদের খাদ্য আমরা যোগাড় করে দিচ্ছি।

কিছু চাল যোগাড় হলো। কিন্তু কোন তরকারি নেই।

চারিদিক জলে তকতক করছে। এদিকে কতকগুলো ডুমুর গাছে ডুমুর ধরে ছিল। ডুমুর সিদ্ধ আর ভাত পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল সৈন্যরা।

পিছু হটার জন্য কর্ণেল কিয়ানি খুব দুঃখিত। কিন্তু কোন উপায় নেই। এখন এখান থেকে যাবারও কোন পথ নেই। সামনে টামু নদীতে তখন প্রচণ্ড বান। জলের স্রোতে নদীর পুল ভেসে গেছে। সামরিক এঞ্জিনীয়াররা তার বেঁধে দড়ি খাটিয়ে নদী পার হবার চেষ্টা করছে। নৌকো স্রোতে টিকছে না।

কিছুদিন আগে শত্রুদের এক পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চে একটি আমেরিকান ম্যাগাজিন পান আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন অফিসার। তাতে নেতাজী সম্বন্ধে একটি লেখা ছিল। বৃটিশরা নেতাজীকে জাপানীদের 'পাপেট' বলে বিদ্রূপ করলেও আমেরিকানরা তাঁকে ভয় করত। তাঁর অস্থায়ী সরকার তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল।

ওই ম্যাগাজিনটিতে রাসবিহারী বসুর কথাও ছিল। তাতে লেখা ছিল, Two Boses not related to one another, One Rash Behari Bose and other Subhas Chandra Bose have formed a Government of their own. Under this Government they have trained a large number of Indians formed one army which is known as Indian National Army. Their Government has been recognised by Axis powers. Indian Government should keep an eye on this movement.

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার সম্বন্ধে আমেরিকানরা সচেতন করে দিতে চায় বৃটিশকে।

দুই একদিন পর টামু নদী পার হয়ে ক্রমাগত পিছু হটতে লাগল আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যরা। মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুপক্ষের বিমান উড়ে যাচ্ছে। তাই দলবদ্ধভাবে

যাবার উপায় নেই। সৈন্যরা তাই দু চারজন করে খণ্ড খণ্ড ভাবে পথ হাঁটতে লাগল।

পথে মাঝে মাঝে এক একটি গাঁ পড়তে লাগল। কিন্তু গাঁয়ে কোন আশ্রয় মিলল না। বৃষ্টির জলে জামা কাপড় সব ভিজে গেছে। রসদ বলতে আছে শুধু অল্প কিছু চাল। আর কাঁধে একটা করে পিঠু।

ব্রহ্মদেশীয় এই গ্রাম অঞ্চলগুলোতে আগেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ হয়ে গেছে। বাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সব ভাঙ্গা বাড়িতে আহত জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা বাসা নিয়েছে। আহত সৈনিকদের মাঝে মাঝে মৃতদেহগুলো ফুলে উঠেছে। আহতদের সেবা করার কেউ নেই।

তিলে তিলে অজস্র সৈন্য ক্ষতবিক্ষত দেহে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবু দেশের প্রতি ভালবাসা তাদের বিন্দুমাত্র কমেনি। এতটুকু বীতশ্রদ্ধ হয়নি তারা তাদের প্রিয় নেতার প্রতি। মনে তাদের এক চিন্তা ভারতের স্বাধীনতা। মুখে তাদের এক কথা, ভারতমাতা কি জয়। নেতাজী কি জয়।

একদিন গান্ধী ব্রিগেডের সৈন্যদের একটি ছোট দল একটি গাঁয়ে গিয়ে দেখল একটি ভাঙ্গা বাড়িতে একজন আজাদ হিন্দ সৈন্য মৃতপ্রায় অবস্থায় যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। কিন্তু তাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার সব যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে জোরে বলে উঠল, জয় হিন্দ।

বলল, আমরা ভারতের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না। তোমরা যেমন করে হোক ভারতকে স্বাধীন করো।

কে কার মুখে জল দেবে। আহত সৈনিকদের পাশে মৃতদেহ। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তার উপর। কোথাও একটু শোয়া বা বসার জায়গা নেই। সারা রাত গাছতলায় বসে কাটাতে হলো সব সৈনিকদের। ভিজে মাটিতে বসারও

উপায় নেই। পিশু নামক একরকম পোকা কামড়ায়। তার উপর আছে মশার উপদ্রব।

যাই হোক, কোন রকমে বসে দাঁড়িয়ে সারা রাত ভিজে পোষাকে কাটিয়ে পরের দিন রান্নার ব্যবস্থা করল আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা। সঙ্গে সম্বল শুধু অল্প কিছু চাল। এখান সেখান থেকে কিছু জ্বালানী কাঠ যোগাড় করে ভাত আর শাক রান্না হলো। তাই তারা পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেল। দু তিন দিন তাদের কোন কিছু খাওয়া হয়নি।

ওদিকে জাপানী সৈন্যদেরও ওই একই অবস্থা। বৃষ্টি ও বানের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে সব রসদ সরবরাহ। যাবার পথে এক জায়গায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা দেখল, চারজন ক্ষুধার্ত জাপানী সৈনিক দিনকতক কিছুই খেতে পায়নি। না খেয়ে খেয়ে এতদূর দুর্বল হয়ে পড়েছে যে হাঁটার ক্ষমতা নেই।

এমন সময় সৈন্য চারজন দেখতে পেল, তাদের থেকে কিছু দূরে একটি মরা কুকুর পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু কাঠ যোগাড় করে সেই মরা কুকুরের ছালটাকে ছাড়াল। তারপর মাংসটা কেটে আগুনে পোড়াল। তারপর কাঠির ডগায় গেঁথে চপ স্টিক করে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল। তাই খেয়ে তারা জল খেয়ে আবার পথ হাঁটতে লাগল।

জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। ইম্ফলে জোরদার হয়ে উঠছে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি। তবু রেঙ্গুনে কোন হতাশার চিহ্ন নেই। সেখানে নেতাজী এমন সাহস ও শক্তি সঞ্চার করেছিলেন তাদের মনে যাতে কিছুমাত্র কমেনি তাদের জয়ের আশা।

এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের তৃতীয় বাহিনী আজাদ ব্রিগেডও পিছু হটতে শুরু করেছে। গান্ধী ব্রিগেড মালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার কিছু পরেই আজাদ ব্রিগেডও যাত্রা শুরু করে। এপ্রিলের শেষের

দিকে রেঙ্গুন পৌঁছায় আজাদ ব্রিগেড। সেখানে একটু বিশ্রাম নেয়ার পরই কালেওয়ার মধ্য দিয়ে টামুর পথে রওনা হয়।

টামুতে পৌঁছে আজাদ ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার গুলজারা সিং বিভাগীয় কম্যাণ্ডার কর্ণেল কিয়ানির কাছ থেকে নির্দেশ আনবার জন্য চামোলে যান। কিয়ানি নির্দেশ দেন। আজাদ ব্রিগেড প্যালেল অঞ্চলে বিশেষ করে টামু-প্যালেল রোডের উত্তর দিকে বৃটিশ পক্ষের বিরুদ্ধে ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে যাবে।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেল। আজাদ ব্রিগেড কাজ শুরু করতে না করতেই বর্ষা পড়ে গেল। একটা বড় রকমের আক্রমণের কথা ভাবছিল আজাদ ব্রিগেড। কিন্তু তা আর হলো না। ভীষণ বর্ষায় সব যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় বিভাগীয় কম্যাণ্ডারের নির্দেশে গান্ধী ব্রিগেডের মত আজাদ ব্রিগেডকেও পিছু হটতে হলো।

এই পিছু হটার পথে গান্ধী ও আজাদ ব্রিগেডের প্রায় দুই হাজার সৈন্য দারুণ খাদ্যাভাবের মধ্যে পড়ে।

ইম্ফলের চারিদিকের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে নাগা জাতির বাস। এই অঞ্চলগুলি তখন জাপানীদের অধিকারে এবং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের শাসনাধীনে। অধিকৃত অঞ্চলের পরিমাণ দুশো বর্গমাইল।

নাগা প্রধানরা সত্যিই ভারতভূমির স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতাকে জড়িয়ে দেখত। তারা ছিল যেমন বৃটিশবিরোধী তেমনি আজাদ হিন্দ ফৌজের ভক্ত। সেদিন নাগা প্রধানরা কর্ণেল কিয়ানিকে খাদ্য সম্বন্ধে যে কথা দিয়েছিল তা তারা রেখেছিল। দুই হাজার সৈন্যকে অনেক দিন ধরে খাইয়েছিল তারা।

নাগা প্রধানরা নেতাজীকে বলত তাদের রাজা। রাজার মতই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত নেতাজীকে। বৃটিশকে তারা একেবারেই

দেখতে পারত না। তারা প্রায়ই বলত, আমাদের রানীকে বৃটিশরা গ্রেপ্তার করে ভারতে নিয়ে গেছে।

বৃটিশদের মত জাপানীদেরও দেখতে পারত না নাগারা। ওরা বলত, আমরা যেমন বৃটিশকে চাই না, তেমনি জাপানকেও চাই না। আমাদের এলাকায় কোন জাপানীকে আসতে দেব না। আমরা শুধু চাই আমাদের রাজা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে।

এই সময় বি, জে, এস, গারেওয়াল নামে একজন মেজর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বৃটিশ দলে যোগদান করে। মালয়ে গান্ধী ব্রিগেডের ট্রেনিংএর সময় প্রচুর খেটেছিলেন গারেওয়াল। সেই থেকে গান্ধী ব্রিগেডেই সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সব সৈন্যই মর্মাহত হন।

জুলাইএর প্রথম দিকে যখন বৃষ্টির জন্য জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছু হটতে থাকে তখন শত্রুপক্ষ নতুন করে আক্রমণ শুরু করে। আঘাতে, অনাহারে, অসুখে আজাদ হিন্দ ফৌজের ফ্রণ্ট লাইনের সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা দু হাজার থেকে এক হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেজর গারেওয়ালের পরিবর্তে তখন আবিদ হোসেন এসেছেন গান্ধী ব্রিগেডে। তিনি আসতে না আসতেই শুরু হলো শত্রুপক্ষের আক্রমণ। গোটা গান্ধী ব্রিগেডকে ঘিরে ফেলল তারা। একে একে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারগুলিকে আক্রমণ করল। এই আবিদ হোসেন, ক্যাপ্টেন রাও ও ক্যাপ্টেন তাজ মহম্মদ যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে সদর-ই-জয় উপাধি লাভ করেন।

রাত্রিবেলায় জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং শত্রুপক্ষের বহু ক্ষয়ক্ষতি করে।

জুলাই মাস পড়তেই সময় আরও খারাপ হতে থাকে। যে সব জাপানী সৈন্য ও আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সব দল কোহিমা

অবরোধ করে ছিল তারা তামুর দিকে ফিরে চলল। আরও যে সব সম্মিলিত সৈন্যদল পশ্চিম দিক থেকে ইম্ফল আক্রমণ করছিল তারাও টিড্ডিমের দিকে পিছু হটতে থাকে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানীদের সঙ্গে কোহিমা ছেড়ে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশরা প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইম্ফলে এসে আক্রমণ শুরু করে। আশঙ্কা করা গেল গান্ধী ব্রিগেডের পালাবার পথও হয়ত বিচ্ছিন্ন করে দেবে তারা।

তবু ৪ঠা জুলাই থেকে রেঙ্গুনে শুরু হলো নেতাজী সপ্তাহ পালনের সমারোহ। প্রায় দুই মাস ধরে রণাঙ্গনগুলি পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছিলেন নেতাজী। নিজে সাহস ও প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন সৈন্যদের মনে। কিন্তু নেতাজী সপ্তাহ পালনের উদ্যোক্তাদের ডাকে তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ২রা জুলাই রেঙ্গুনে ফিরে আসতে হলো তাঁকে।

আজ হতে এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৩ সনের ৪ঠা তারিখে পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নেতাজী। সেদিন তিরিশ লক্ষ ভারতীয় নেতাজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করে।

নেতাজী সপ্তাহ শুরু হয় ৪ঠা জুলাই থেকে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয় রেঙ্গুনের জুবিলি হলে। হলের ভিতরে ও বাইরে প্রচুর লোক সমাগম হয়। সেই বিশাল জনসভায় নেতাজী গত এক বছরের মধ্যে তাঁরা কি কি করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে দশ দফা কৃতিত্ব দাবি করেন।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের কর্মসূচী অনুসারে প্রচুর অর্থ ও লোক সংগ্রহ করেছি। আমরা সৈন্যদের শিক্ষা দিয়েছি এবং সৈন্যদল সম্প্রসারিত করেছি। ঝাঁসির রানী নামে একটি নারী বাহিনীও গঠন করেছি। আজি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ নামে আমাদের নিজস্ব সরকার আমরা গঠন করেছি এবং নয়টি রাষ্ট্র থেকে স্বীকৃতি পেয়েছি। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আমাদের

যা আছে ঠিক আছে। আমাদের সদর সপ্তর ব্রহ্মদেশে নিয়ে গিয়েছি, এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করি এবং মার্চ মাসে আমরা গর্বের সঙ্গে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করি আমাদের সৈন্যদল ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছে। প্রচার কার্যও আমরা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়েছি। স্বাধীন ভারতে শাসন ও পুনর্গঠনের কাজের জন্য আমরা আজাদ হিন্দ দল নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেছি। ব্রহ্মদেশে আমরা আজাদ হিন্দ লিমিটেড নামে একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছি এবং স্বাধীন ভারতে প্রচলনের জন্য আমরা নোট তৈরির হুকুমত দিয়েছি। আমাদের সৈন্যদল ধীরে ধীরে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এমন এক সময় ছিল যখন লোকে সন্দেহ করত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা যুদ্ধ করতে পারবে না, করলেও জয়লাভ করতে পারবে না কোন যুদ্ধে। আজ কিন্তু সে সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

নেতাজী আরও বলেন, ভারতের ভিতরকার অবস্থা এখন আমাদের অনুকূলে। কংগ্রেস যদি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ না করে বা আত্মসমর্পণ না করে তাহলে ভারতীয় জনগণের মনোভাব বৃটিশবিরোধী রয়ে যাবে। আমাদের সৈন্যবাহিনী যতই ভারতের ভিতর এগিয়ে যাবে ভারতীয় জনগণ বুঝতে পারবে যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা লাভের অন্য কোন পথ নেই। তখন তারাও আমাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়বে।

নেতাজী এটা ভালভাবেই জানতেন যে জাপান বা অক্ষশক্তির জয়লাভের আশা কম। তিনি জানতেন তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের শক্তিও খুবই কম। জাপানও ভারতসীমান্তে আক্রমণ চালাতে চায়নি। নেতাজীর অনুরোধেই তারা মত দিয়েছিল। নেতাজী ভেবেছিলেন জাপানী ও আজাদ হিন্দের সম্মিলিত বাহিনী

কোনরকমে বৃটিশ পক্ষের পাঁচ ডিভিসন ভারতীয় সৈন্যকে বন্দী করলেই তাঁর কাজ মিটে যাবে। পাঁচ ডিভিসনে থাকবে অন্ততঃ দেড় লক্ষ সৈন্য। বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বুঝিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজে ঢুকিয়ে তাদের দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল করে তুলতে হবে।

৬ই জুলাই মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দিলেন নেতাজী। তিনি কেন দেশ থেকে এসে জাপানের সাহায্য নিয়েছেন তার কারণ বিশ্লেষণ করার পর তাঁর আজাদ হিন্দ সরকার সম্বন্ধে বলেন,

মহাত্মাজী! এবার আমি আমাদের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমাদের অস্থায়ী সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃটিশের কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। আমাদের দেশ থেকে শত্রুরা বিতাড়িত হলে ও শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলেই আমাদের অস্থায়ী সরকারের কাজ যাবে ফুরিয়ে। আমাদের সমস্ত ত্যাগ ও দুঃখকষ্টের পুরস্কারস্বরূপ আমরা শুধু চাই আমাদের জন্মভূমির স্বাধীনতা। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্র হতে অবসর গ্রহণ করবেন।···

ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তারা এগিয়ে যাচ্ছে ধীর গতিতে। যতদিন পর্যন্ত না সমস্ত বৃটিশ দেশ থেকে চলে যাচ্ছে এবং নতুন দিল্লীর লাট ভবনের উপর ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়ছে ততদিন এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে।

৯ই জুলাই তারিখে এক বিশাল জন সমাবেশে হবিব নামে একজন মুসলমান ধনীকে 'সেবক-ই-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। হবিব তাঁর টাকাকড়ি গয়না ও ভূসম্পত্তি মিলিয়ে প্রায় দেড় কোটি

টাকার মত নেতাজীকে দান করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের পক্ষ থেকে এই দান গ্রহণ করেন নেতাজী।

১০ই জুলাই ২৫ হাজার জনতার এক মিছিলের সামনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নেতাজী সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, শত্রুশক্তিকে কখনও ছোট ভাবতে নেই। শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা ও রসদ প্রচুর। আমরা তাদের সব জায়গায় হারাতেও পারিনি। তবু জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কারণ বিপ্লবী সেনাদলের শক্তি মদ, মাংস ও আরাম উপভোগ থেকে আসে না; তারা শক্তি পায় বিশ্বাস, বীরত্ব আর ত্যাগের আদর্শ থেকে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসাররাও বলাবলি করতে লাগলেন, বৃটিশ মরণ কামড় দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে ভারতকে। কারণ ভারতই হচ্ছে তাদের গোটা সাম্রাজ্যের মধ্যে শক্তি ও সম্পদের প্রধানতম উৎস। সুতরাং যুদ্ধ এখন চলবে। বৃটিশ সহজে ভারত ছাড়বে না।

এদিকে জুলাইএর শেষের দিকে দেখা গেল, শুধু বর্ষা বা সরবরাহ সংকট নয়, কোহিমা ও ইম্ফল সীমান্তে জাপান ও আজাদ হিন্দের পিছু হটার সবচেয়ে বড় কারণ হলো বিমানবাহিনীর অভাব। জাপানের উন্নত ধরনের প্রায় সব বিমানবাহিনীই প্রশান্ত মহাসাগরে আটকে থাকায় বর্মা যুদ্ধে কোন সাহায্যই পাওয়া গেল না। জাপানী বিমানবাহিনী না থাকায় আরাকান সীমান্ত থেকে পুরো একটি ডিভিসন সৈন্য নিরাপদে ইম্ফলে নিয়ে এল বৃটিশ। জাপানী বিমানবাহিনী তৈরি থাকলে তাদের বাধা দেয়া হত। সুতরাং তারা তা পারত না।

তাছাড়া ইম্ফল অবরোধের সময় বৃটিশপক্ষের 'বাক্স প্রতিরক্ষার' নীতিটাকে বরবাদ করে দেবারও কোন উপায় ছিল না জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের।

পালাবার কোন পথ না থাকায় ইম্ফলে বৃটিশরা এক একটি

বিশেষ জায়গায় নিজেদের বাক্সবন্দী করে রাখে। অর্থাৎ চারিদিকে ট্যাঙ্ক ও কামান সাজিয়ে তার মাঝখানে সৈন্যরা থাকত আর শত্রুরা এগিয়ে এলেই গোলাবর্ষণ করত। ফলে তাদের কাছে এগোন সম্ভব হত না। কিন্তু বিমান বাহিনী থাকলে উপর থেকে বোমাবর্ষণ করে সহজেই তাদের জব্দ করা যেত।

॥ **উনত্রিশ** ॥

অক্টোবরের প্রথমেই মেমিও গেলেন নেতাজী। সেখানে মিলিটারি বেস হাসপাতালটি পরিদর্শন করলেন। দেখলেন প্রায় দুই হাজার রুগ্ন সৈনিক গুলির ক্ষত, আমশয় ও ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার, নার্স ও ওষুধপত্রের দারুণ অভাব। ঝাঁসির রাণী বাহিনীর মেয়েরা নার্সের কাজ করছে।

এই সব নার্সদের মধ্যে বেলা দত্ত নামে ষোল বছরের একটি বাঙ্গালী মেয়ে নার্সের কাজে বিশেষ নাম করে। সে একা পঁচাশি জন আমাশয়ের রোগীর সেবা করত। মাঝে মাঝে হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণ করত শত্রুরা। তবু মনোবল এতটুকু ভেঙ্গে যায়নি ঝাঁসির রাণী বাহিনীর মেয়েদের। বেলার কাজের বিশেষ প্রশংসা করেন নেতাজী। নায়িক থেকে হাবিলদারের পদে উন্নীত হয় বেলা।

একজন সৈনিক বেড়িবেড়ি রোগে ভুগছিল। তার মুখ হাত পা সব ফুলে গিয়েছিল, নেতাজী সব রোগীদের এক এক করে দেখতে দেখতে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখন সেরে উঠবে?

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, নেতাজী, আপনি যেদিনই আবার যুদ্ধে যাবার হুকুম দেবেন, আমি সেইদিনই ভাল হয়ে উঠব।

মেমিওর পর একে একে সব আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবির ও হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করলেন। প্রায় প্রতিটি রুগ্ন সৈনিকের সঙ্গে কথা বললেন। অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নেতাজীকে দেখে কাছে পেয়ে সব সৈনিকরা মনে সাহস পেল।

নেতাজী বুঝলেন, উত্তর বর্মার এই সব রণাঙ্গনগুলিতে আরও অনেক আগে তাঁর আসা উচিত ছিল। তাঁকে আগে হতে যুদ্ধের এই ভয়াবহ অবস্থার কথা জানানো হয়নি। জাপানীরাও তাঁকে আসতে দিতে চায়নি। কেবলি বলেছে, আপনার যাবার এখন দরকার নেই।

কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। সর্বত্রই আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যরা পিছু হটছে। আজ তাদের অনেকেই হাসপাতালে মৃত্যুর দিন গুণছে। নেতাজী আরও বুঝলেন, জাপানীরা প্রথম থেকে ঠিকমত সাহায্য করেনি তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজকে। অস্ত্রশস্ত্র ঠিকমত দেয়নি। খাদ্য, পোষাক ও ওষুধপত্র সব তিনি নিজে টাকা তুলে সরবরাহ করেছেন।

তারপর ২৬শে জুলাই জাপান প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে জানাল, ইম্ফল অভিযান আপাততঃ বন্ধ থাকবে। ঐদিন জাপানের প্রধানমন্ত্রী টোজো পদত্যাগ করেন।

আগস্ট মাস পড়তেই অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করলে বৃটিশ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যরা তাদের তাড়া করে। এই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসনের অনেক সৈন্য দল ত্যাগ করে।

পশ্চাদপসরণরত সৈন্যদের খাদ্য, পোষাক, কম্বল আর বুট পাঠাবার জন্য ১২ই আগস্ট মান্দালয় থেকে নেতাজীর কাছে খবর পাঠানো হয়। তাঁর প্রথম ডিভিসনের প্রকৃত অবস্থা একমাত্র তখনই জানতে পারেন নেতাজী, উত্তর বর্মায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুন থেকে গুদামজাত উদ্বৃত্ত রসদ ও বাজারের জিনিষপত্র আগে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর জামা কাপড়, বুট, কম্বল ও যানবাহন যোগাড় করে পাঠিয়ে দেয়া হলো। নতুন একটি জরুরী হাসপাতাল খোলা হলো।

বিপদের উপর বিপদ। ১৯শে আগস্ট দ্বিতীয় ডিভিসনের কাছ থেকে আবার খবর এল, সাহায্য পাঠাও। পিছু হঠার সময় বৃষ্টি ও বানের জলে আটকে পড়ে গেছে যে দলটি, সেই দলের কয়েকশো লোক অনাহারে ও অসুখে ভুগছে।

নেতাজী আগে আসল ব্যাপারটা না জানায় স্বীকার করতে পারেননি। এবার তিনি আপাতত অভিযান স্থগিত ও কৌশলগত পশ্চাদপসরণের কথা স্বীকার করলেন। সেই সঙ্গে একটি ঘোষণায় বললেন, বৃটিশ সৈন্যবাহিনী অনেক বেশী সুসজ্জিত ; কিন্তু প্রতিটি লড়াইতে আমরা তাদের হারিয়েছি।...বর্ষা শুরু হওয়ায় ইম্ফলে বৃটিশ খুব জোর বেঁচে গেছে। কিন্তু আবহাওয়া ভাল হওয়ার পর নতুন করে যখন আবার প্রচণ্ড অভিযান শুরু হবে তখন পরাজয় বরণ করা ছাড়া শত্রুপক্ষের কোন গত্যন্তর থাকবে না। যারা ঠিকমত কর্তব্য পালন করেছে তাদের পুরস্কৃত করবারও ব্যবস্থা হলো।

২৮শে আগস্ট ঘোষণা করলেন নেতাজী, যারা বৃটিশ সৈন্যদের হত্যা করেছে বা বন্দী করেছে তাদের নতুন একটি করে পদক দেয়া হবে।

৮ই সেপ্টেম্বর একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠান হলো রেঙ্গুনে। সেই অনুষ্ঠানে এপ্রিল ও জুলাই মাসের ঘোষণা অনুযায়ী কয়েকটি পদক দান করলেন। ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষে যে সব প্যারাসুটবাহী গুপ্তচর পাঠানো হয়েছিল তাদের ফাঁসি হয়েছিল। সেই সব গুপ্তচরদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ২১শে সেপ্টেম্বর 'শহীদ দিবস' ঘোষিত হয়।

এই সময় দলত্যাগের কথাটিও কানে আসে নেতাজীর। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রায় কয়েকশো লোক দলত্যাগ করে শত্রুপক্ষে চলে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে রেঙ্গুনে তিনি আই, এন, এ অফিসারদের ডেকে কঠোর সমালোচনা করলেন অফিসারদের। বললেন, অফিসারদের দুর্নীতি ও আরামপ্রিয়তার জন্যই সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে এবং তারা দলত্যাগ করেছে। যারা লড়াই করতে চায় না, তারা এই মুহূর্তে আই. এন, এ থেকে বেরিয়ে যাক।

যাই হোক, দেরি হয়ে গেলেও যেতে হবে। আরও আগে গেলে বা আরও আগে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাটা জানতে পারলে কাজ হত। কিন্তু যে কোন কারণেই যখন তা হয়নি তখন আর উপায় কি। এদিককার সব কাজ সেরে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে রেঙ্গুন ছেড়ে উত্তর বর্মার রণাঙ্গনগুলির দিকে রওনা হলেন নেতাজী। সঙ্গে গেল তাঁর নিজস্ব স্টাফ, ডিভিশন কম্যাণ্ডার ও ব্রিগেড কম্যাণ্ডার। ঘুরতে ঘুরতে অক্টোবরের গোড়ার দিকে আসেন মেমিওর সামরিক হাসপাতালে।

মেমিও থেকে মান্দালয়। সেখানে যাবার পর ৯ই অক্টোবর জাপান সরকারের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণপত্র পান নেতাজী। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেতাজীর সঙ্গে আলোচনা করতে চান জাপান সরকার; তাই নেতাজীকে টোকিও যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

নেতাজীর রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচয় পেয়ে জাপান সরকার তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। ভারতবর্ষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপার ছাড়াও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করত জাপান সরকার।

নেতাজীর কাছে জাপান সরকারের আমন্ত্রণ আসায় আজাদ

হিন্দ ফৌজের অফিসাররাও খুশি হলেন। এবার নিশ্চয় নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের যোগ্যতার পরিচয় নিশ্চয় এতদিনে পেয়েছে জাপান সরকার।

১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দালয় থেকে প্রথমে রেঙ্গুনের পথে রওনা হলেন নেতাজী। রেঙ্গুনে পৌঁছে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভার একটি বৈঠক ডাকলেন। যুদ্ধের যে অবস্থা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন সে বিষয়ে সব কিছু মন্ত্রীসভার সামনে বললেন,

তিনি বললেন, আমাদের কাজ শুরু করতে সত্যিই খুব দেরি হয়ে যায়। যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই বর্ষা পড়ে গেল। আমাদের পক্ষে ভীষণভাবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এ বর্ষা। রাস্তাঘাট সব ডুবে যায়। পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থা সব অচল হয়ে যায়। নদীস্রোত উল্টো দিকে থাকায় জলপথেও কোন কাজ হয় না। আমরা যদি জানুয়ারি মাসে ইম্ফল আক্রমণ করতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সফল হতাম।

অথচ আমাদের তুলনায় শত্রুপক্ষের অবস্থা সব দিক দিয়েই খুব ভাল ছিল।

বর্ষার আগে সব যুদ্ধেই আমরা জিতেছি। আমরা ক্রমাগত এগিয়ে গিয়েছি। আরাকান অঞ্চলে আমরা শত্রুদের পরাস্ত ও বন্দী করেছি। কালাদান অঞ্চলেও আমরা শত্রুসৈন্যদের পরাভূত করে এগিয়ে গিয়েছি। টিড্‌ডিম, প্যালেল ও কোহিমা অঞ্চলেও আমরা এগিয়ে গিয়েছি অব্যাহত গতিতে। শত্রুপক্ষের লোকবল ও অর্থবল থাকা সত্বেও আমরা অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করেছি।

বর্ষা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইম্ফল আক্রমণ স্থগিত রাখতে হয় আমাদের। শত্রুরা তখন বিমানে করে প্রচুর সৈন্য এনে কোহিমা-

ইম্ফল রাস্তাটি দখল করে নেয়। সে যাই হোক, এই অভিযান থেকে আমরা শিক্ষালাভও করেছি প্রচুর। আমাদের সৈন্যদের সাহস, মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। অস্ত্রের মশলা ফুরিয়ে গেলে সৈন্যরা শুধু রাইফেলের সঙ্গীন উঁচিয়ে শত্রুদের একে একে আক্রমণ করছে। অনেক সময় জয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তাছাড়া আমরা এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

এ যুদ্ধের আগে জাপানীদের কোন আস্থা ছিল না আমাদের সৈন্যদের যোগ্যতার প্রতি। কিন্তু এবার আমাদের অফিসার ও সৈনিকদের যোগ্যতা দেখেছে। আমাদের অফিসাররাও যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

আমাদের গলদগুলির কথাও আমরা জানতে পেরেছি। পথের দুর্গমতার জন্য সরবরাহ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ করতে পারেনি। তাছাড়া রণাঙ্গনগুলিতে আমাদের কোন প্রচারকার্য ছিল না। আমরা লাউডস্পীকার চেয়েছিলাম জাপানীদের কাছে; কিন্তু তারা তা দিতে পারেনি। এবার থেকে আমাদের সৈন্যদের প্রতিটি ইউনিটে একটি করে প্রচার বিভাগ থাকবে।

নেতাজীর বিবৃতি দানের পর মন্ত্রীসভায় সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রথমে ঠিক হলো, দেশের স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ অবিরাম যুদ্ধ করে যাবে। তারা যেখানেই বৃটিশের দেখা পাবে সেখানেই যুদ্ধে নেমে পড়বে। শত্রুপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে; সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজও তার নিজের চেষ্টায় শক্তি বৃদ্ধি করবে।

ইম্ফল যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের সবচেয়ে যে বড় দুর্বলতার কথা জানতে পারে মন্ত্রীসভা তা হলো খাদ্য, ওষুধ, অস্ত্র প্রভৃতির ব্যাপারে জাপানীদের উপর অত্যধিক নির্ভরতা। এই ত্রুটি দূর

করবার জন্য আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভায় একটি সরবরাহ দপ্তর খোলা হয় এবং শ্রীপরমানন্দকে সেই দপ্তরের ভার দেয়া হয়।

আর একটি প্রস্তাবে আজাদ হিন্দ সরকার ও জাপান সরকারের মাঝখানে হিকারি কিকান নামে সংযোগ বিভাগটি তুলে দিয়ে জাপান সরকারের সঙ্গে সরাসরি প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়। এই সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের মধ্যে বৈদেশিক দপ্তর খোলা হয় এবং জেনারেল চ্যাটার্জিকে এই দপ্তরের মন্ত্রী করা হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালনার জন্য একটি সমর পরিষদ নির্বাচিত হয়। এর আগে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভাই যুদ্ধের ব্যাপারও দেখাশোনা করত ; কিন্তু তাতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই পরিষদে বারো জন সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁরা হলেন নেতাজী, ভোঁসলে, চ্যাটার্জি, এম, জে, কিয়ানি, আজিজ মহম্মদ, ঈশান কাজির, হবিবুর রহমান, গুলজারা সিং, পরমানন্দ, রাঘবন, এল, জে, কিয়ানি ও শাহ নওয়াজ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সৈন্য সংগ্রহ অভিযানের উপর জোর দেয়া হলো। কুয়ালালামপুর, পেনাং, সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনে সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়।

এর আগে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসনে তিন হাজার ও বাকি ডিভিসনে দুই হাজার করে সৈন্য ছিল। কিন্তু এই সৈন্য সংগ্রহ অভিযানের ফলে সৈন্যসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। বাড়তে বাড়তে তার মোট সংখ্যা দাঁড়াল পঞ্চাশ হাজার।

টোকিও যাবার জন্য রেঙ্গুন থেকে রওনা হলেন নেতাজী নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে। তাঁর সঙ্গে গেলেন জেনারেল কিয়ানি ও কর্ণেল হবিবুর রহমান।

ঠিক হয় নেতাজীর অনুপস্থিতির সময় কর্ণেল আজিজ আহম্মদ সর্বোচ্চ সেনানায়কের কাজ চালাবেন আর জেনারেল কিয়ানির জায়গায় প্রথম ডিভিসনের কম্যাণ্ডার হবেন জেনারেল শাহ নওয়াজ।

পিনমনাতে নতুন বিভাগীয় শিবির খোলা হলো। নেতাজী হুকুম দিয়ে গেলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সব সৈন্যদল এবার পিনমনাতে এসে জড়ো হবে।

টোকিওতে গিয়ে নেতাজী যা যা বললেন জাপান সরকার তাই মেনে নিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের যোগ্যতার যে বিবরণ দিলেন নেতাজী তাতে খুশি হলো। এর পরে সব যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজকে পাঠাবার হুকুম দিল।

নেতাজী বললেন, জাপান সরকারের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের ফলে যে রদবদল হল তাতে আজাদ হিন্দ সরকারের কিছু যাবে আসবে না। জাপান সরকারের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের সম্পর্ক আগের মতই ঠিক থাকবে।

নতুন জাপানী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কোইসো বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে নেতাজীর সব দাবিগুলিই মেনে নিলেন। ঠিক হলো আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র সৈন্যদলের খরচ জাপানীরা বহন করবে আর শিক্ষারত সৈন্যদলের খরচ নেতাজী বহন করবেন।

নেতাজীর কথামত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো। ২৬শে নভেম্বর জাপান সরকার এ কথা ঘোষণা করল। নতুন জাপানী রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন হাচিয়া। তিনি মাসখানেক পরে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

আরও ঠিক হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সামরিক আইনের আওতায় আসবে না ; তাদের নিজস্ব সামরিক বিধি তারা মেনে চলবে। এমন কি জাপানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করলেও এর অন্যথা হবে না।

টোকিওতে সব কাজ সেরে কয়েকটি বেতার বক্তৃতা দেন নেতাজী। এই বেতার বক্তৃতাগুলি দেন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণকে সম্বোধন করে।

ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে তিনি এসেছেন ভারত ও জাপানের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবার জন্য। বর্মায় যুদ্ধাভিযান আবার শুরু হবে।

চীনের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, ১৯৩৭ সালের পর জাপানের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছে।

জাপানীদের সম্বোধন করে বললেন, জাপানী জাতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পার, সুদিনে অথবা দুর্দিনে আমরা তোমাদের পাশে থাকব।

সবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বললেন, মার্কিন বন্ধুদের আমি বলতে চাই যে, এশিয়ার সারা প্রান্তে চলেছে আজ বিপ্লবের উন্মাদনা।···আমরা তোমাদেরই মত মানুষ। আমরা চাই স্বাধীনতা। যে কোন উপায়ে সে স্বাধীনতা অর্জন করব আমরা। আমাদের সাহায্য করবার সুযোগ ছিল তোমাদের; কিন্তু তোমরা তা করোনি। জাপান এখন আমাদের সাহায্য করতে চাইছে এবং তাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাসী হবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। তাই আজ আমরা তার পাশে থেকে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

তোমাদের বিরুদ্ধে এবং আমাদের মারাত্মক শত্রু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে আমরা জাপানকে সাহায্য করছি না। আমরা নিজেদেরই সাহায্য করছি, সাহায্য করছি এশিয়াকে।

এর পর টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দেন নেতাজী। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর নীতি নতুন করে বিশ্লেষণ করে বলেন,

ভারতবর্ষকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। একমাত্র তাহলেই সে তার আত্মরক্ষার জন্য আধুনিক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে পারবে; বিদেশ থেকে সাহায্য নিতে পারলে তবেই তা সম্ভব।

দেশরক্ষার পরেই দরকার দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা সম্ভব নয় বলেই রাষ্ট্রকে তার ভার নিতে হবে। অর্থাৎ এর জন্য চাই এমন সমাজতন্ত্র যা সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত ও মৌলিক সংস্কার সাধন করতে পারবে। চাই এমন একটি জবরদস্ত সরকার যা কাজ করবে কোন একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়। কাজ করে যাবে জনসাধারণের সেবক হিসাবে।

সে রাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার কোন সমস্যা থাকবে না। জাতীয় সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের যা কিছু ভাল আছে তা নিতে হবে। জাতীয় ঐক্য আর পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি স্বাধীন ভারতে মেলাতে হবে। একদিকে ধনতন্ত্রবাদ ও অন্যদিকে মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক দিকের উপর অতিরিক্ত চাপ এই দুটি চরম দিক এড়িয়ে চলতে হবে।

কিন্তু এই জবরদস্ত সরকারের ভিত্তি হিসাবে ভারতে তখন কোন নতুন দল গড়তে চাননি নেতাজী।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে শান্তি ও আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন নেতাজী। কিন্তু লীগ অফ নেশন্‌স এর নীতি ও যোগ্যতার প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। কারণ তখন লীগ অফ নেশন্‌স এর নেতারা জাতীয় স্বার্থের খাতিরে আন্তর্জাতিকতাকে ব্যবহার করে যাচ্ছিলেন। নেতাজী চেয়েছিলেন সম স্বার্থ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে আঞ্চলিক ভাবে এমন এক আন্তর্জাতিকতা গড়ে তুলতে যা ক্রমশ ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হয়ে একটি বিশ্ব সংগঠনের রূপ নেবে।

তিনি বলতেন, বৃটিশ কমনওয়েলথকে স্বাধীন জাতিসমূহের সঙ্ঘে পরিণত হতে হবে। তা না হলে কমনওয়েলথের ধ্বংস অনিবার্য।

তিনি সেই সঙ্গে আরও বলেছিলেন, জাপান যদি নিঃস্বার্থভাবে পরিচালনা করতে পারে তাহলে অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন হিসাবে সম-সমৃদ্ধির এলাকা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

জাপান সরকার নেতাজীর সব কথা সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছিল। তাঁর সব দাবি ও অনুরোধ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মাত্র একটি অনুরোধ তাঁর রক্ষা করতে পারেনি জাপান সরকার।

টোকিও থেকে চলে আসার আগে জাপান সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন নেতাজী, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাঁকে আপোষমূলক আলাপ আলোচনা করতে দেয়া হোক। কারণ তাঁর বিশ্বাস ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের সঙ্গে রাশিয়ার ভাব ছুটে যাবে। কাজেই রাশিয়ার সঙ্গে তখন মিলে মিশে কাজ করতে কোন আপত্তি থাকবে না। রাশিয়া জার্মানীর কোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে যোগ দিয়েছে। এটা তার সামরিক কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাপানের কাছে প্রস্তাব দিলেন নেতাজী, রাশিয়ায় তাঁকে বেসরকারী দূত হিসাবে পাঠানো হোক। তাতে কোন লজ্জা বা সংকোচের কিছু থাকবে না। কিন্তু জাপান তাঁর এ প্রস্তাব মানতে পারেনি।

টোকিও থেকে মালয় রওনা হলেন নেতাজী সব কাজ সেরে ও সব কথা বলে। পৌঁছতে ১৪ই নভেম্বর হয়ে গেল। তারপর সিঙ্গাপুর। সেখানে যেতেই আন্দামানের চীফ কমিশনার দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। বললেন শাসনকাজে অসুবিধা হচ্ছে। একমাত্র শিক্ষা ছাড়া আর কোন বিভাগ জাপানীরা ছাড়তে চাইছে না। আন্দামানে ভারতীয়দের উপর ভীষণ অত্যাচার চালাচ্ছে জাপানীরা। বৃটিশের গুপ্তচর এই মিথ্যা অজুহাতে পঞ্চাশ জন ভারতীয়কে

মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে ভারতীয়দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোর করে টাকা আদায় করছে। চীফ কমিশনারের কাজে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছে।

মহা ভাবনায় পড়লেন নেতাজী। অনেক ভেবে তিনি ঠিক করলেন, এখন আন্দামান নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। এখন বর্ষা কেটে গেছে। আগেকার অসুবিধা অনেক দূর হয়েছে। এবার নতুন বছর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করে আবার নতুন যুদ্ধাভিযান শুরু করা যায়, সেই কথাই ভাবতে লাগলেন।

এদিকে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের পিছু হটার খবর পেয়ে মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতির লোকেরা মুষড়ে পড়েছিল অনেকখানি। ধনী ব্যবসায়ীদের মজা হলো। তারা ভাবল আজাদ হিন্দ সরকারকে আর টাকা দিয়ে কাজ নেই। লীগে নতুন সদস্য ভর্তির সংখ্যা কমে গেল। সম্পত্তির উপর ধার্য কর লোকে আদায় দিল না। এমন কি যারা যে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা সেই প্রতিশ্রুত টাকাও দিল না। কেউ কিছু কিছু দিল ; সব দিল না।

নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সব জানানো হলো। ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নেতাজী আই, এন, এ-র পদস্থ অফিসারদের ডেকে তাদের সঙ্গে এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন।

এরপর সফরে বেরোতে হবে নেতাজীকে। একদিকে সংগঠনকে শক্তিশালী করা ও টাকা যোগাড় করা আর অন্যদিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি—দুটো কাজই এক সঙ্গে করতে হবে তাঁকে। প্রথমে পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের তহবিলের টাকা যাতে পুরো আদায় হয় তার চেষ্টা করলেন। পরে যুদ্ধক্ষেত্রের পথে রওনা হবেন।

এবার আর আগের মত ভুল করবেন না নেতাজী। জাপানীদের কথা শুনে আত্মপ্রসাদে বিভোর হয়ে পিছনে বসে থাকবেন না।

নিজে যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও সৈন্যদের সুবিধা অসুবিধা সব নিজের চোখে দেখবেন। যতদূর সম্ভব তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন।

সফরে বেরোবার আগে টাকা তোলা ও বকেয়া টাকা আদায় করার নতুন উপায় বার করা যায় কিনা সে বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বললেন। নেতাজী অফিসারদের কথাপ্রসঙ্গে বললেন, সৈন্যরা রক্ত ঢালছে। প্রতিরক্ষার জন্য জীবন দান করছে। অথচ যারা বেসামরিক লোক তারা নিরাপদে আরামে বসে রয়েছে। যারা ধনী লোক তারা এই নিরাপত্তার দাম দিক। বেসামরিক লোকদের কাছে আলবৎ আমরা দাবি জানাব।

যাবার আগে পেনাঙে অনাদায়ী টাকার জন্য একজনকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর সিঙ্গাপুরে ফিরে দশজন লোককে গ্রেপ্তারের ভয় দেখালেন।

চ্যাটার্জি তখন ছিলেন ব্যাঙ্ককে। লীগের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। যুদ্ধের হাওয়ার মোড় ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীগের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরেছিল। নেতাজীকে কাছে পেয়ে সব কথা তাঁকে জানালেন চ্যাটার্জি।

ব্যাঙ্কক থেকে রেঙ্গুন ফিরতে হবে নেতাজীকে। কিন্তু তাঁর যাবার আগে ১১ই জানুয়ারি এক জনসভার আয়োজন করা হলো ব্যাঙ্ককে। সেই জনসভায় নেতাজী বললেন, যারা আমার বিপক্ষে, তারা খোলাখুলি বলুন, তাহলে বৃটিশের সঙ্গে তাদেরও বন্দী শিবিরে রাখা হবে এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি তারা রেহাই পেতে চায় তাহলে তাদের সম্পত্তির উপর ধার্য কর জমা দিতে হবে।

নেতাজী দেখলেন, এমন অনেক লোক আছে বিশেষ করে যারা দূর গাঁয়ে থাকে তারা হুমকিকে ভয় খায় না, যাদের দেশের স্বাধীনতার প্রতি কোন দরদ নেই, যারা টাকা আর ব্যক্তিগত

সুখ সমৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই চায় না, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। শাস্তি পেলে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে না।

নেতাজী ব্যাঙ্কক ছেড়ে চলে যাবার আগে জাপানী পুলিশদের হাতে নামের একটি তালিকা দিয়ে গেলেন। তার মধ্যে দশজনকে গ্রেপ্তার করতে হবে আর আশী জনের উপর নজর রাখতে হবে।

এর ফলে ভাল কাজ হলো। ১৯শে জানুয়ারি তিরিশ লক্ষ টাকার উপর প্রতিশ্রুতি পেলেন চ্যাটার্জি, আর ৬ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেই টাকার একের তিন ভাগ উঠে গেল। লীগকে নতুন করে গড়ে তোলার ব্যাপারেও সুবিধা হলো চ্যাটার্জির।

নতুন করে আবার অভিযান শুরু করা হবে। সব ঠিক ঠাক হয়ে গেল। খুশি হলেন নেতাজী। খুশি হলো আজাদ হিন্দ ফৌজ। ১৯৪৪ সালের শেষ তিন মাস ক্রমাগত পিছু হটেছে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা। এবার হারানো গৌরব উদ্ধার করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

নেতাজী জানতেন ইউরোপের যুদ্ধে অক্ষশক্তির অবস্থা ভাল নয়। তা না হোক, তবু ভারত সীমান্তে ক্রমাগত হানা দিয়ে বিব্রত করে তুলতে হবে মিত্রশক্তিকে। ভারত সীমান্তে জাপান ও আজাদ হিন্দের সম্মিলিত বাহিনী আক্রমণ করলে বৃটিশ ও আমেরিকার সম্মিলিত বাহিনীর একটি মোটা অংশ ব্যস্ত থাকবে। তাছাড়া ইউরোপে জাপানী ও জার্মান বাহিনী জিততে না পারলেও পূর্ব এশিয়ায় যে জিততে পারবে না এমন কোন কথা নেই। নেতাজী বিপ্লবী এবং বরাবরই আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই তিনি কখনও মুষড়ে পড়েন না।

তাই নতুন যুদ্ধাভিযানের কথা হতেই নতুন আশায় মনটা দুলে উঠল তাঁর। ঠিক হলো, এবার প্রথম লড়াই শুরু হবে ইরাবতী নদীর ধারে। প্রথম ঠিক হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নম্বর ডিভিসনের

ছুটি রেজিমেন্ট ও গোটা দ্বিতীয় ডিভিসনকে কাজে লাগানো হবে।

কিন্তু যুদ্ধ ফেরত সব সৈন্যরা তখন ক্লান্ত। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অনাহারে ও অসুখে দুর্বল। লড়াই-না-করা চতুর্থ রেজিমেন্টকেই একমাত্র সুস্থ অবস্থায় পাওয়া গেল বলে তাদের মিংইয়ানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ইম্ফল ফেরত রেজিমেন্টগুলি ম্যালেরিয়া, আমাশায় প্রভৃতি রোগে ভুগে ও অপুষ্টিজনিত দুর্বলতায় একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। তাদের নতুন করে তৈরি করে আর যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো সম্ভব নয়। তাদের তাই পীনমনায় এনে রাখা হলো। দ্বিতীয় ডিভিসনের ছুটি রেজিমেন্ট রেঙ্গুনে তৈরি হয়ে আছে। মালয় থেকে বাকি রেজিমেন্টগুলি এসে পড়বে।

গত বছর আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক সৈন্য যুদ্ধের সময় দলত্যাগ করে বৃটিশ পক্ষে যোগ দিয়েছে। এবারও যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা হলো। এবার যারা যুদ্ধে যাচ্ছে তারা সবাই নতুন, তাদের তাই ইম্ফল ফেরত সৈন্যদের সংস্পর্শে আসতে দেয়া হলো না। তাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের কথা বলা হলো, দলত্যাগের কথা একেবারে বলা হলো না। বৃটিশের হাতে ধরা পড়ে আই, এন, এ সৈন্যদের কি দুরবস্থা হয়েছে তার কথাও বলা হলো। যুদ্ধে যাবার আগে সেনাপতিরা তাদের সৈন্যদের মনোবল ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন। তারপর নিশ্চয়তা দেবেন তাঁদের সৈন্যরা মনের দিক থেকে প্রস্তুত।

আর একটা কথা সৈন্যদের জানিয়ে দেয়া হলো। যদি কোন সৈনিক মনে করে দেহ বা মনের দিক থেকে সে অযোগ্য তাহলে সেকথা অকুণ্ঠভাবে বলতে পারে। তাহলে তাকে রেহাই দেয়া হবে। যুদ্ধে না গিয়ে পিছনে থাকার সুযোগ পাবে সে এবং তাতে তার সামরিক জীবনের কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু দলত্যাগের কথাটা শেষ পর্যন্ত আর চেপে রাখা গেল না

সৈন্যদের কাছে। দলত্যাগ রোধের জন্য একটি আদেশ জারি করা হলো, লক্ষ্য করা গেছে আজাদ হিন্দ ফৌজে দলত্যাগের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে এটা লজ্জার কথা।...ভবিষ্যতে যাতে আর দলত্যাগ না হয় তার জন্য সেনাপতিরা সৈন্যদের মানসিক উন্নতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন।

ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডাররা পরীক্ষা করে এমন সব সৈন্যদের একটি নামের তালিকা তৈরি করেছিলেন যারা মনের দিক থেকে ঠিক ততখানি শক্ত নয়। এই তালিকা অনুসারে চতুর্থ রেজিমেণ্ট থেকে দেড়শো জন সৈন্যকে পিছনে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

সফর তাড়াতাড়ি শেষ করে রেঙ্গুনে ছুটে এলেন নেতাজী। যুদ্ধের খবর ভাল নয়। মায়ু ও কালাদান উপত্যকায় জাপানীরা হেরেছে। বৃটিশ পক্ষের পশ্চিম আফ্রিকান বাহিনী মায়ু উপত্যকা জাপানীদের কবল থেকে মুক্ত করে কালাদানের নিচের দিকে এসে পড়েছে। ১লা জানুয়ারি বৃটিশ পক্ষ আকিয়াব দখল করেছে। কালাদান নদীর পূর্বদিকে মিউহাউঙ্গও যেতে বসেছে।

বৃটিশরা অবিরাম এগিয়ে আসছে। জাপানীরা কেবল পিছু হটছে আর বৃটিশরা তাদের পিছু ধাওয়া করছে। পিছু হটতে হটতে জাপানীরা ইরাবতী নদীর এপারে চলে এসেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

আরও শোনা গেল বৃটিশরা ইরাবতী নদী পার হয়ে মেকটিলা জয়ের চেষ্টা করছে। অথচ তার জন্য তৈরি ছিল না জাপানীরা।

এদিকে রেঙ্গুনে নেতাজী যখন কেবল যুদ্ধের ভাবনা ভাবছেন তখন ২৩শে জানুয়ারি নেতাজীর জন্মবার্ষিকী পালন করার জন্য উৎসবে মেতে উঠল সারা রেঙ্গুন শহর। নেতাজীর ইচ্ছা ছিল না। তবু শহরবাসীরা কোন কথা শুনল না।

রেঙ্গুনের জুবিলি হলে উৎসবের আয়োজন করা হলো। সভায়

বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনারও ব্যবস্থা করা হলো। শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা রূপোর থালা ভর্তি করে নিয়ে এল সোনা, হীরে, মণিমাণিক্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু। অর্ঘ্য নিবেদন করল নেতাজীকে। রেঙ্গুনের সবচেয়ে বড় ধনী মুথিয়া চেট্টিয়া সংগ্রহ করে আনল কয়েক লক্ষ টাকা।

উৎসব শেষে ফ্রন্টে যাবেন নেতাজী। যাবার আগে জাপানীদের কাছ থেকে নতুন যুদ্ধের ছকটি দেখে নিলেন। এই যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসন অংশ গ্রহণ করবে। তারা তার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে রওনা হবে রেঙ্গুন থেকে। যতদিন না তারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছায় ততদিন চতুর্থ গেরিলা রেজিমেন্ট আই, এন, এ ঘাঁটি আগলাবে নিয়েঙ্গু থেকে বারো মাইল জুড়ে। এই মর্মে এক আদেশ দেয়া হয়েছে মেজর জি, এস, ধীলনকে। মেজর ধীলন আগে ছিলেন পাঞ্জাব রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট। আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন ধীলন।

ধীলনের হাতে ছিল মাত্র বারোশো সৈনিকের একটি রেজিমেন্ট। কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল বারো মাইল লম্বা নদীর তীর বরাবর সৈন্য মোতায়েন করে পাহারা দিতে হবে। ধীলন তাই তাঁর সৈন্যদলকে তিনটি ব্যাটেলিয়নে ভাগ করে একটিকে নিয়েঙ্গুতে, আর একটিকে পেগানে ও তৃতীয় ব্যাটেলিয়নটিকে তাঁর সদর কার্যালয়ে মোতায়েন করলেন।

জাপানী সৈন্যরাও এসে পড়ল। ঠিক ছিল ধীলন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সাহায্য করলেই শত্রুরা ইরাবতী নদী পার হয়ে এপারে আসতে পারবে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না। বৃটিশ পক্ষের ৭ম ভারতীয় পদাতিক বাহিনী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভোরে নিয়েঙ্গু থেকে এক মাইল উত্তরে নিঃশব্দে নদী পার হয়ে এল। আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা যখন জানতে পারল তখন

ছটা বেজে গেছে। জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। তখনও কিছু নৌকো নদী পার হচ্ছিল। গুলীর আঘাতে কতকগুলি নৌকো ভেসে গেল। অনেক সৈন্য নিচের দিকে স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে অবশেষে সাঁতরে পার হলো। বৃটিশদের ক্ষয় ক্ষতি সামান্যই হলো। তাতে মোটেই দমাতে পারা গেল না তাদের।

দিনের শেষে দেখা গেল আরও তিনটি বৃটিশ ব্যাটেলিয়ন এসে গেছে। এসেই গুলি বর্ষণ করতে লাগল আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর। তাদের আক্রমণের প্রবলতাকে রোধ করতে পারল না। ফলে ক্রমশই পিছু হটতে হলো এদের।

পেগানের অবস্থাও তাই হলো। প্রথম চোটে বৃটিশরা নদী পার হতে পারল না। কিন্তু পর পর কয়েকবার চেষ্টা করতেই আজাদ হিন্দ ফৌজের বাধা টিকল না। জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে সাহায্য করবে কোথায় না তারা আগেই পালিয়ে গেছে।

নিয়েঙ্গু ও পেনাঙে বৃটিশরা এসে ঘাঁটি তৈরি করল। ধীলন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মেকটিলা হতে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাঁর বিভাগীয় অঞ্চলে কিয়ায়ুকপাদঙে চলে গেলেন।

জাপানীরা তখন ইয়েনাংইয়ঙে সৈন্য সমাবেশ করেছে। বৃটিশরা যাতে মেকটিলা দখল করতে না পারে তারা তখন সেই চেষ্টা করছে।

ধীলনের অবশিষ্ট সৈন্য ছাড়া তখন পি, কে, তোগনের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনী এসে পড়ল কিয়ায়ুকপাদঙের কাছে। এর আট মাইল দূরে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু একটি খাড়াই পাহাড় আছে। পাহাড়টি বিচ্ছিন্ন এবং তার নাম পোপা পাহাড়।

পোপা পাহাড়ের পশ্চিম দিকের ঢালুতে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো আজাদ হিন্দ ফৌজকে।

কিন্তু এ লড়াই একান্তভাবে প্রতিরক্ষামূলক। বৃটিশপক্ষ ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

এই অঞ্চলটি রক্ষার জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল জাপানীরা। তারা তাদের ৭২তম বাহিনী সমাবেশ করল ইনেনাংইয়াঙে। জাপানী সেনাপতির সঙ্গে আলোচনা হলো ধীলনের। জাপ সেনাপতি তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিল।

রেঙ্গুন থেকে যুদ্ধের খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল নেতাজীর মন। এবারও পিছু হটবে জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীরা একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি। তাঁর সব আশা ভেঙ্গে যাচ্ছে একে একে। আশা নয় যেন বুকের এক একখানা পাঁজর।

পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করার জন্য জাপানীরা তাঁকে একটা বিমান দান করেছিল অনেক আগে। নেতাজী তাঁর নিজস্ব বিমানে করে ১৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে রওনা হলেন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। সঙ্গে কিছু জাপানী ও ভারতীয় অফিসার রইল।

সেই দিনই পীনমনায় পৌছলেন নেতাজী। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসন পরিদর্শন করলেন। প্রথম ডিভিসন তখনও যুদ্ধে নামেনি। যুদ্ধে নামার তখনও অযোগ্য তারা। যারা আবার শরীরের দিক থেকে সক্ষম তাদের হাতে অস্ত্র নেই। শতকরা মাত্র কুড়ি জনের হাতে অস্ত্র ছিল।

পীনমনাতে জেনারেল শাহ নওয়াজের সঙ্গে দেখা করলেন নেতাজী। তিনি বললেন, দ্বিতীয় ডিভিসন ফেব্রুয়ারির প্রথমেই যুদ্ধে নেমেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যুদ্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তার কম্যাণ্ডার আজিজ আহম্মদ বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন। সুতরাং এবার হতে আপনাকেই দ্বিতীয় ডিভিসনের সেনাপতিত্ব করতে হবে। দ্বিতীয় ডিভিসন এখন আছে পোপা পাহাড় আর কিয়ায়ুকপাদঙে।

তাঁর সৈন্যদলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেতাজীর সঙ্গেই রওনা হলেন জেনারেল শাহ নওয়াজ। একটি মোটর গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন তাঁরা। নেতাজীর সঙ্গে ছিল একজন জাপানী সামরিক অফিসার ও কুড়িজন সশস্ত্র সৈনিক যারা তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করত। দেহরক্ষী সৈনিকরা পিছনের আর একটি গাড়িতে যাচ্ছিল।

প্রথমে তাঁরা যাবেন মেকটিলা। তারপর সেখান থেকে পোপা পাহাড়। কিন্তু মেকটিলা যাবার পথে একটি গাঁয়ে এসে থামতে হলো তাঁদের। শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানগুলো সারা দিন ধরে এ অঞ্চলে এমন ভাবে অনবরত ঘুরে বেড়ায় যে দিনের বেলায় গাড়ি করে যাওয়া আসা করা সম্ভব নয়। রাত্রিবেলায় পথে আলো নিবিয়ে গাড়িগুলিকে যাতায়াত করতে হয়।

যে গাঁয়ে নেতাজী ও তাঁর দলবল এসে দিনের মত আশ্রয় নিল তার নাম ইণ্ডো। সারা দিন এই গাঁয়ে কাটিয়ে সন্ধ্যে হতেই আবার মেকটিলার পথে রওনা হলেন। মেকটিলা এখান থেকে কুড়ি মাইল।

ইণ্ডো গাঁয়ে বসেই যুদ্ধের কিছুটা খবর পেলেন নেতাজী। খবর পেলেন, নিয়েঙ্গু ও পেগানে জোর যুদ্ধ হচ্ছে। জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হচ্ছে। শত্রুরা মেকটিলার দিকে এগিয়ে আসছে।

মেকটিলা পৌঁছলেন নেতাজী ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যের দিকে। এসেই আরও খারাপ খবর শুনলেন। বৃটিশবাহিনী মান্দালয় দখল করে নিয়েছে। তারপর তারা মান্দালয়-মেকটিলা-রেঙ্গুন রোড ধরে ট্যাঙ্ক ও ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসছে।

যে সব জাপানী সেনাদল মান্দালয়ের কাছে যুদ্ধ করছিল তাদের অনেকেই ধরা পড়েছে। জাপানীদের হারতে থাকার একমাত্র কারণ হলো, বৃটিশদের তুলনায় ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধবিমান খুবই কম।

বৃটিশদের পদাতিক সৈন্য যখন যেখানে যাচ্ছে, সেইখানেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে বোমারু বিমানগুলি। উপর থেকে বোমারু বিমানগুলি সাহায্য করায় পদাতিক সৈন্যদের কাজ আরও সহজ হচ্ছে। তার উপর তাদের আছে প্রচুর ট্যাঙ্ক। দুর্ভেদ্য ট্যাঙ্কগুলি থেকে কামান দাগতে দাগতে সহজেই এগিয়ে আসছে বৃটিশ সৈন্যরা। সেই সব ট্যাঙ্কের সামনে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের পদাতিক বাহিনীরা টিকতে পারছে না।

বৃটিশ সৈন্য প্রচুর পরিমাণে ইরাবতী নদী পার হয়ে এপারে এসেছে। মিনগিয়ান, নিয়েঙ্গু ও পেগানে এখন জোর যুদ্ধ হচ্ছে। যুদ্ধ করতে করতে শত্রুপক্ষ ক্রমশই মেকটিলার পথে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

জাপানীরাও মেকটিলাকে রক্ষা করবার জন্য দারুণভাবে চেষ্টা করছে। কারণ মেকটিলা হচ্ছে ব্রহ্মদেশের মধ্যে জাপানীদের স্নায়ুকেন্দ্র। এই মেকটিলা হতে ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া যায়। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও রেলপথ মিলিত হয়েছে মেকটিলায়। সুতরাং এই মেকটিলা যদি একবার জাপানীদের হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে জাপানীরা হীনবল হয়ে পড়বে সারা ব্রহ্মদেশের মধ্যে।

পোপা পাহাড়েও তখন জোর যুদ্ধ চলছে। জাপানী ও আই, এন, এ অফিসাররা নেতাজীকে মেকটিলা ছেড়ে চলে যেতে বললেন। বললেন, এখানে আপনার থাকা আর ঠিক হবে না। পোপা পাহাড়ের দিকেও আর যেতে হবে না।

কিন্তু কারো কোন কথা শুনলেন না নেতাজী। বললেন, যাবার জন্য যখন বেরিয়েছি তখন যাবই।

তখন জেনারেল শাহ নওয়াজ একটা বুদ্ধি আঁটলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা স্যার, আমি আগে পোপা পাহাড়ে গিয়ে ওখানকার যুদ্ধের অবস্থাটা দেখে আসি। আমি এসে রিপোর্ট দিলে তবে

আপনি যাবেন। এর মধ্যে আপনি কালেওয়া গিয়ে সেখানকার হাসপাতালটা দেখে আসুন।

অবশেষে কথাটা মেনে নিলেন নেতাজী। জেনারেল শাহ নওয়াজ ও নেতাজীর মিলিটারি সেক্রেটারি মেজর মেহবুব আহম্মদ সেই রাত্রিতেই রওনা হলেন পোপা পাহাড়ের পথে। তখন বেশ বোঝা যাচ্ছিল, বর্মাযুদ্ধে জাপানীরা আর কিছু করতে পারবে না আর অক্ষশক্তিরও জয়ের কোন আশা নেই। তবু সেই রাত্রিতে শাহ নওয়াজ ও মেহবুবকে বিদায় দেবার সময় নেতাজী বললেন, অক্ষশক্তি আর যুদ্ধ না করলেও আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। যতদিন পর্যন্ত না বৃটিশ আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে, ততদিন আমাদের যুদ্ধ ঠিক চলবে।

আসলে নেতাজী চাইছিলেন, আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধে সব মরে গেলেও তারা দেশপ্রেম, ত্যাগ ও বীরত্বের এমন মহিমা রেখে যাবে যার দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধররা অনুপ্রাণিত হবে যুগ যুগ ধরে। আরও কত অজস্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠবে যাদের মেরে কোনদিনই শেষ করতে পারবে না বৃটিশ।

শাহ নওয়াজ বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন নেতাজী। আজাদ হিন্দ ফৌজ জীবিত থাকতে বৃটিশ কিছুতেই এগোতে পারবে না। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে।

ওখানে গিয়ে কর্ণেল ধীলনের সঙ্গে দেখা করলেন শাহ নওয়াজ। পুরো দ্বিতীয় ডিভিসনের ভার নিয়ে ব্রিগেড কম্যাণ্ডারদের নেতাজীর নির্দেশগুলি বুঝিয়ে দিলেন। তিন দিন পোপা পাহাড়ের হেড কোয়ার্টারে থাকার পর আবার ওঁরা মেকটিলায় ফিরে এলেন।

ফিরে এসে ওঁরা নেতাজীকে বুঝিয়ে বললেন, যুদ্ধের অবস্থা এখন ভাল নয়। ওখানে আপনার গিয়ে কাজ নেই।

রাত্রি তখন গভীর। একটি ফাঁকা জায়গায় কথা হচ্ছিল। জ্যোৎস্না রাত, দুধ রঙের চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে নীল আকাশ

থেকে। মাঝে মাঝে সেই নীল আকাশটা কামানের গোলার আগুনে লাল হয়ে উঠছে। তবু নীরবে বসে থেকে শাহ নওয়াজের সব কথা শুনলেন। এতটুকু বিচলিত হলেন না। একটা কথাও বললেন না।

এমন সময় একজন জাপানী অফিসার সেখানে এসে নেতাজীকে বলল, পিনবিন দখল করে শক্তিশালী বৃটিশ ট্যাঙ্কগুলো তংথার দিকে এগিয়ে আসছে। তংথা মেকটিলা হতে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে। এই তংথা আর মেকটিলার মাঝখানে আমাদের সৈন্যদল নেই। সুতরাং আপনি এই মুহূর্তে মেকটিলা ছেড়ে পীনমনার দক্ষিণ দিকে চলে যান। সেখানে আমাদের প্রথম ডিভিসনের সেনাদল আছে।

জেনারেল শাহ নওয়াজ বললেন, চল্লিশ মাইল পথ কিছুই নয়। দু ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে। তাদের বাধা দেবার মত আমাদের কোন সৈন্যদল নেই। আপনার সঙ্গে যে কুড়িজন দেহরক্ষী আছে তাদের হাতে আছে শুধু রাইফেল; একটি সশস্ত্র বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখার কোন ক্ষমতাই নেই তাদের।

এত অনুরোধ ও অনুনয় বিনয়েও টললেন না নেতাজী। চুপচাপ অবিচলিত ভাবে বসে রইলেন। যেন কিছুই হয়নি।

শাহ নওয়াজ আবার অনুরোধ করলেন নেতাজীকে মেকটিলা ছেড়ে যাবার জন্য। কিন্তু এবারও শুনলেন না নেতাজী।

তখন সমস্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন শাহ নওয়াজ। সাহস করে নেতাজীর মুখের সামনে বললেন, নেতাজী, আপনি বড় স্বার্থপর। আপনি আপনার ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখাবার জন্য আপনার জীবনকে বিপন্ন করছেন। কিন্তু এই ভাবে আপনার নিজের জীবনকে বিপন্ন করবার কোন অধিকার নেই আপনার; কারণ আপনার নিজের জীবন শুধু আপনার ব্যক্তিগত জিনিষ নয়, সারা ভারতের এক অমূল্য বস্তু। আমি সেই অমূল্য বস্তুর অস্তিত্বকে এইভাবে বিপন্ন হতে দেব না।

শাহ নওয়াজ চুপ করলেন। নেতাজী চুপ করে কী ভাবতে লাগলেন।

শাহ নওয়াজ আবার বললেন, নেতাজী, একবার ভেবে দেখুন যদি আপনার কিছু হয়, তাহলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কি হবে।

কোন একজন অফিসারের পক্ষে নেতাজীকে এভাবে বলার কোন অধিকার ছিল না। তবু শান্তভাবে শাহ নওয়াজের কথাগুলি শুনলেন নেতাজী। কারণ তিনি বুঝলেন, তাঁর নিরাপত্তার জন্য আকুল হয়েই শাহ নওয়াজ তাঁকে এখান থেকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নেতাজী বললেন, শাহ নওয়াজ, আমাকে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই। আমি পোপা পাহাড় যাবার মনস্থ করে ফেলেছি এবং আমি সেখানেই যাচ্ছি। আমার নিরাপত্তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি জানি সুভাষচন্দ্র বোসকে মারবার মত বোমা বৃটিশ এখনও তৈরি করতে পারেনি।

নেতাজীর শেষের কথাটি কতদূর সত্যি তার প্রমাণ সেইদিন বিকালেই পাওয়া গেছে। মেকটিলার যে জায়গাটিতে নেতাজী থাকতেন সেইখানে বিকালে শত্রুপক্ষের বিমান থেকে প্রচুর বোমাবর্ষণ করা হয়। নেতাজীর ঘরের আশেপাশে বহু বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে যায়, বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। অথচ নেতাজীর গায়ে একটু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।

শাহ নওয়াজ দেখলেন, নেতাজী যখন একবার যাবার ঠিক করে ফেলেছেন, তখন তিনি যাবেনই। কোন অবস্থাতেই মত পরিবর্তন করবেন না। মেজর রাওয়াত ও শাহ নওয়াজ দুজনেই খুব মুস্কিলে পড়লেন। রাত্রি তখন দুটো। রাত্রিকালে এই সময় বেরোন খুবই বিপজ্জনক।

তখন রাওয়াত এক মতলব আঁটলেন! রাওয়াত গোপনে

বললেন, নেতাজী যখন যাবেন এবং কারো কোন কথা শুনবেন না তখন তাঁর রওনা হতে যত দেরি হয় ততই ভাল।

নেতাজী রাওয়াতকে একটি চিঠি টাইপ করতে দিলেন। রাওয়াত অনেক দেরি করলেন। তারপর নেতাজীর ড্রাইভারকে সব কথা বলে বুঝিয়ে শিখিয়ে দিলেন রাওয়াত, মিছে করে সাহেবকে বল গাড়ির এঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে।

নেতাজী গাড়িতে উঠে বসে রওনা হবার জন্য তাড়া দিতে লাগলেন। কিন্তু রাওয়াত ও ড্রাইভার অনেক চেষ্টার ভাণ করে বলল, কিছুতেই পেরে উঠছি না স্যার। এঞ্জিনটা এমনভাবে বিগড়ে গেছে কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না।

সেই রাত্রিতেই আজাদ হিন্দের জেনারেল কিয়ানি ও জাপ প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে টেলিগ্রাম পাওয়া গেল। তাঁরা দুজনেই নেতাজীকে রেঙ্গুন ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। নেতাজীর নিরাপত্তার জন্য সবাই চিন্তিত।

এমনি করে দেরি করতে করতে ভোর সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। তখন সকলের অনুরোধে নেতাজী একটু বিশ্রাম করতে গেলেন। সারারাত জেগে কাটিয়েছেন। মেজর তাকাশী নামে একজন জাপানী অফিসার খবর আনতে গেলেন যুদ্ধের।

বেলা আটটার সময় তাকাশী ফিরে এসে বললেন, শত্রুরা মেকটিলার দশ মাইল উত্তরে এগিয়ে এসেছে। তারা মেকটিলা-মান্দালয় রোড ও মেকটিলা-কিয়ায়ুকপাদং রোড কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাদের বাধা দেবার মত কোন সৈন্যদল না থাকায় তারা মেকটিলা দখল করল বলে। মেকটিলা থেকে আরও অনেক আগে পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।

এখন আর কোন উপায় নেই। এখন হয় যে কোন দিকে পালাবার চেষ্টা করতে হয় অথবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শত্রুদের সঙ্গে

লড়াই করে মরতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় লড়াই করা অসম্ভব শত্রুদের সঙ্গে।

নেতাজী বললেন, রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দিলেও ওই পথেই পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করো। মরতে হয় সেখানেই মরবে।

দশ মিনিটের মধ্যেই যাবার সব ঠিক হয়ে গেল। নেতাজীর একখানি গাড়িতে মাত্র চার জন লোক ধরবে। একজন জাপানী সংযোগ অফিসার, নেতাজী নিজে, তাঁর মেডিক্যাল অফিসার রাজু আর শাহ নওয়াজ।

গাড়ি ছাড়ল। নেতাজী পেছনের সীটে কোলের উপর একটি টোটাভরা টমিগান নিয়ে বসে রইলেন। শাহ নওয়াজ নেতাজীর পাশে একটি ব্রেনগান নিয়ে বসে রইলেন। গাড়িতে বেশ কিছু বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে নেয়া হয়েছে। রাস্তায় শত্রুসৈন্যের কোন অবরোধ দেখলেই লড়াই করে পথ করে নিতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য! পথে কোন অবরোধ দেখা গেল না। ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে পথ চলে গেছে। তখন ফেব্রুয়ারির শেষ। শীতের আমেজ আছে হাওয়ায়। বেশ মিষ্টি ও নরম লাগছিল তাই দুপুরের রোদটা। আকাশে কোন বোমারু বিমানও দেখা গেঃ না।

ইণ্ডো গাঁয়ে গিয়ে গাড়ি থামল। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো শত্রুদের গোলা বর্ষণ। শত্রুদের যুদ্ধ বিমানগুলো খুব নিচে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এবং সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানে করে উপর থেকে গোলাবর্ষণ করছে! ইণ্ডো গাঁয়ে বৃটিশের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই গাঁয়ের ভিতর না গিয়ে গাঁয়ের বাইরে একটি ক্যাকটাস বনের মাঝখানে লুকিয়ে থাকা ঠিক করলেন শাহ নওয়াজ।

একবার একজন বৃটিশের গুপ্তচর এসে সন্দেহজনক ভাবে দেখে গেল। সুতরাং সে বন ছেড়ে ওঁরা অন্য বনে চলে গেলেন। কিন্তু এখন কোন বনে থাকাই নিরাপদ নয়। কারণ শত্রুদের যুদ্ধ বিমানগুলি প্রতিটি বনের উপর দিয়ে উড়ে বেড়িয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। নেতাজীর জন্য একটি ছোট ট্রেঞ্চ কাটলেন শাহ নওয়াজ। তারপর দুজনে ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকলেন। ঠিক সেই সময় একটি শত্রুবিমান গাছের মাথার উপর দিয়ে ধীর গতিতে উড়তে উড়তে বনটাকে ঘিরে ফেলল।

এমন সময় শাহ নওয়াজের হঠাৎ চোখে পড়ল ট্রেঞ্চের ভিতর নেতাজী যেখানে বসেছিলেন ঠিক সেইখানে মাটির গায়ে একটি বিরাট কালো কাঁকড়া বিছে নেতাজীর ঘাড়ের কাছ থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। কিন্তু তাকে তখন মারবার কোন উপায় নেই। কারণ তখন ট্রেঞ্চের ভিতর একটু নড়লেই শত্রুরা বিমান থেকে দেখে ফেলবে এবং নির্মমভাবে গোলা বর্ষণ করবে।

কিছুক্ষণ পর বিমানগুলো চলে গেলে বিছেটিকে মারলেন শাহ নওয়াজ। শত্রুদের বিমান আক্রমণ কমে গেলে নেতাজী বললেন, আমি একবার মেকটিলা যাব। আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি; কিন্তু আমাদের কিছু সৈনিক সেখানে এখনও পড়ে আছে। সেখানে গিয়ে তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

কিন্তু শাহ নওয়াজ বললেন, আপনি পীনমনা যান। আমি মেকটিলা গিয়ে সব খবর আনছি এবং যা ব্যবস্থা করার করছি। এ বিষয়ে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না।

শাহ নওয়াজের কথা মেনে নিলেন নেতাজী। শাহ নওয়াজ রাত্রি প্রায় দশটার সময় মেকটিলা পৌছিয়ে দেখলেম, শত্রুরা এসে গেছে শহরের ভিতর এবং তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। শহরের মধ্যে

জাপানীদের একটি হাসপাতাল ছিল। সেখানে প্রায় এক হাজার রোগী তখনও ছিল। শত্রুরা এত দ্রুত এগিয়ে আসছে যে হাসপাতালটাকে খালি করতে পারল না। তখন তারা একজন অফিসার ও গার্ডকে হুকুম দিয়ে গেল শত্রুরা এসে পড়লে যে সব রোগী পালিয়ে যেতে না পারবে তাদের গুলি করে মেরে ফেলবে।

শত্রুরা এসে গেলে এই আদেশ পালন করা হয়েছিল।

মেকটিলা থেকে সব লোকজন ও জিনিষপত্র সরিয়ে জেনারেল শাহ্ নওয়াজ পীনমনা গেলেন ১লা মার্চ। সেখানে গিয়ে দেখলেন, নেতাজী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

নেতাজী বললেন, আমি এখানে যুদ্ধের জন্য এক পরিকল্পনা করেছি। প্রথম ডিভিসনের অবশিষ্ট বাছাই করা সৈন্যদের নিয়ে একটি নতুন ব্রিগেড তৈরি করা হবে। বৃটিশরা আসবার আগেই তারা পীনমনার উত্তরে কয়েক মাইল গিয়ে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। শত্রুরা এলে তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মরবে কিন্তু পালিয়ে যাবে না। আমিও এখানে থেকেই শেষবারের মত বৃটিশের সঙ্গে লড়াই করব।

কর্ণেল ঠাকুর সিংকে সেই নতুন বাহিনীর ভার দেয়া হলো। ঠাকুর সিংএর জায়গায় প্রথম ডিভিসনের কম্যাণ্ডার হলেন আর, এম, আমেদ। নেতাজী তখন সব অভিজ্ঞ অফিসারদের ডেকে যাকে যা নির্দেশ দেবার দিয়ে দিলেন।

নেতাজীর কাজ সারা হয়ে গেলে অফিসাররা সবাই তাঁকে বললেন, স্যার, আপনার নির্দেশ সব যথাযথ পালন করা হবে। কিন্তু আপনার এখানে থাকার ত কোন দরকার নেই। আপনি বরং রেঙ্গুনে ফিরে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনটি ডিভিসনকেই নিয়ন্ত্রিত করুন। তাছাড়া আর একটা জিনিষ দেখুন, এখন শত্রুপক্ষ মেকটিলা দখল করবার পর তাদের ঘাঁটি সেখানে শক্ত

করবে। সুতরাং পনের দিনের আগে তারা নিশ্চই এখানে আসতে পারবে না।

এই পরামর্শটা মেনে নিলেন নেতাজী। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল শাহ নওয়াজকে ডেকে বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে রেঙ্গুন চলো। সেখান থেকে পোপা পাহাড় যাবে প্রোম-ইয়েনাংইয়ান কিয়ায়ুকপাদং হয়ে।

রেঙ্গুনে পৌঁছেই নেতাজী একটি দুঃসংবাদ শুনলেন। পোপা পাহাড় অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে দ্বিতীয় ডিভিসনটি যুদ্ধ করছিল তার চার জন স্টাফ অফিসার বৃটিশ পক্ষে যোগদান করেছে।

কথাটি শুনে মর্মাহত হলেন নেতাজী। গভীর রাতে শাহ নওয়াজকে ডেকে বললেন, এই সব স্টাফ অফিসারদের দলত্যাগে আমি সত্যিই লজ্জিত। যুদ্ধের মোড় বৃটিশদের অনুকূলে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন অফিসার নীতিবোধ হারিয়ে ফেলছে। দেখ, এ বিষয়ে কি করতে পার। তুমি যা ভাল বোঝ করো।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে জেনারেল শাহ নওয়াজ কয়েকজন স্টাফ অফিসারকে বাছাই করে নিলেন। তাঁরা হলেন, মেজর রামস্বরূপ, মেজর মেহার দাস, মেজর আজাইব সিং ও মেজর বি, এস, রাওয়াত। ঠিক হলো তাঁরা সবাই রেঙ্গুন থেকে রওনা হবেন ৭ই মার্চ সন্ধ্যের সময়।

যাবার আগে সব অফিসাররা নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে বসে ডিনার খেলেন নেতাজী। তার পর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, আমি জানি, বর্মা যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে। কিন্তু তাতে হতাশ হবার কিছু নেই। ভারতের সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ আমাদের অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের

ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে যুদ্ধ করে জয়ের গৌরব অর্জনের সুযোগ পেয়েছ তোমরা। আজ আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত মান সম্মান তোমাদের হাতে এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে যে বিশ্বাস তোমাদের উপর রাখা হয়েছে তার মর্যাদা তোমরা রক্ষা করবে।

সৈন্যরা বিদায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন নিচে নেমে যেতে লাগল, নেতাজী তখন গাড়িবারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে পলকহীন চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুক্তোর মত অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠল সে চোখে। এক বেসরকারী মমতায় বিষাদময় হয়ে উঠল সমস্ত মুখখানি। যে ভীষণ যুদ্ধে ওরা যাচ্ছে সেখান থেকে ওরা বোধ হয় কেউ আর ফিরবে না। এক অবুঝ অবাধ্য বেদনায় অন্তরটা মোচড় দিয়ে ওঠে নেতাজীর।

পোপা পাহাড় অঞ্চলে শাহ নওয়াজ তাঁর দলবল নিয়ে পৌঁছলেন ১২ই মার্চ তারিখে। জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা একযোগে প্রাণপণ লড়াই করে শত্রুসৈন্যদের মেকটিলা হতে ইরাবতী নদীর ওধারে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা তাদের সফল হয়নি। পোপা পাহাড় থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দেবার জন্য আজাদ হিন্দের সৈন্যরা যথেষ্ট চেষ্টা করল। কিন্তু শত্রুদের বোমারু বিমান আর ট্যাঙ্কের জন্য পেরে উঠল না।

বীরত্ব, বাহুবল ও সাহস বৃটিশপক্ষের সৈন্যদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল আজাদ হিন্দ সেনাদলের। কিন্তু বৃটিশ পক্ষের উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল এই সব কিছু। পোপা পাহাড় থেকে যখনই শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা তখনই বোমারু বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করছিল শত্রুরা। ভারী মর্টার, মেশিন গান ও ট্যাঙ্ক নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছিল বৃটিশ পদাতিকরা।

১৭ই মার্চ তংদিন গাঁয়ের কাছে ধীলনের সৈন্যদল বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেও হেরে গেল। এর পর লেফটেন্যান্ট কার্তার সিং ও লেফটেন্যান্ট জ্ঞান সিংএর নেতৃত্বে দুটি সৈন্যদল জীবন মরণ পণ করে যুদ্ধ করতে থাকে। আজাদ হিন্দ সেনাদলের হাতে ছিল কেবল রাইফেল, হাতবোমা আর কিছু মেশিনগান। শত্রু সৈন্যদের উন্নত ধরনের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের কাছে এসব কিছুই নয়। তবু তাই নিয়েই শত্রুসৈন্যদের চার্জ করতে বললেন এবং নিজে এগিয়ে গেলেন জ্ঞান সিং।

নেতাজী আগেই বলেছেন, বিপ্লবী সেনাদলের এর থেকে বেশী অস্ত্রশস্ত্র থাকে না। হাতে অস্ত্রশস্ত্রের থেকে মনে তাদের থাকবে আত্মশক্তি সাহস আর আদর্শের উত্তাপ। নেতাজী বলতেন, ইত্তেফাক, ইতমদ আর কুরবানী অর্থাৎ একতা, বিশ্বাস আর বলিদান। এই হবে বিপ্লবী সৈনিকদের মূলমন্ত্র।

জ্ঞান সিং বীরবিক্রমে এগিয়ে গিয়ে পিছনের সৈন্যদের ইঙ্গিত করে চীৎকার করে উঠলেন, নেতাজী কি জয়! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দের সব সৈন্যরাও চীৎকার করে উঠল এই বলে!

ভারত আর ভারতের স্বাধীনতার কথা স্মরণ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা এমন অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল যে শত্রুরা তা দেখে অবাক হয়ে উঠল। এমন সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মানুষ এত ভয়ংকরভাবে যুদ্ধ করতে পারে, তারা তা কখনও দেখেনি।

সমানে দু ঘণ্টা ধরে হাতাহাতি সামনাসামনি যুদ্ধ চলল। চল্লিশ জন আজাদ হিন্দ সৈন্য প্রাণ হারাল। শত্রুদের ক্ষতি হলো আরও অনেক বেশী। যুদ্ধবিমান এসে ওদের সাহায্য না করা পর্যন্ত পিছু হটতে লাগল শত্রুসৈন্যরা। দুটি সৈন্যদল বিধ্বস্ত হয়ে

যাবার পর তৃতীয় সৈন্যদলকে হুকুম দেবার সময় হঠাৎ একটি বুলেট এসে লাগল জ্ঞান সিংএর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন জ্ঞান সিং। আর উঠতে পারলে না। মুহূর্ত মধ্যে তাঁর সহকারী এসে দলের কর্তৃত্বভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। জ্ঞান সিং তাঁর সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে প্রায়ই বলতেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে প্রাণ দেব। তাঁর সে কথা পালন করেছেন জ্ঞান সিং।

২৫শে মার্চ আউংসানের নেতৃত্বে বর্মী জাতীয় বাহিনী জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে সে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করতে চাইলে আপত্তি করেন নেতাজী। তিনি বলেন, কোন বিপ্লবী সেনাদল অন্য কোন বিপ্লবী সেনাদলের বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের একজন মন্ত্রী এই সময় নেতাজীকে পরামর্শ দেন, আপনিও জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আপনার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করুন।

নেতাজী তখন বলেন, তাহলে মালয়ে ভারতীয়দের অবস্থা খুবই খারাপ হবে। আমি ও সব রাজনীতির খেলা খেলতে ভালবাসি না। আমি চাই শুধু আমার দেশের স্বাধীনতা।

মেকটিলা দখল করে বৃটিশ তখন বেশ শক্ত করে তুলেছে সেখানে তার ঘাঁটি। সেখান থেকে পীনমনার দিকে এগিয়ে আসছে দুর্বারবেগে।

পীনমনা তখন এক হাজার বৃটিশ সৈন্য কতকগুলো ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে আসছে। পীনমনার কাছে কাব্যুতে ক্যাপ্টেন বাগরীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি সৈন্যদল শত্রুদের সামনে এগিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে গেল একটি জাপানী সৈন্যদল।

ফাঁকা মাঠের মাঝখানে পরিখা কাটা হয়েছে। তাতে লুকিয়ে

আছে আজাদ হিন্দ ও জাপানী সৈন্যরা। কিন্তু উপরে কোন আচ্ছাদন নেই। হাতে কোন জোরাল অস্ত্র নেই। তবে কাটা গর্তে শত্রুপক্ষের দুটি ট্যাঙ্ক পড়ে অকেজো হয়ে যেতে কিছু উৎসাহ পেল আজাদ হিন্দ ও জাপানী সৈন্যরা।

কিন্তু মেসিনগান থেকে গোলা ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসতে লাগল বৃটিশ পদাতিক দল। আজাদ হিন্দ সেনাদল 'জয় হিন্দ, নেতাজীকি জঁয়' বলে শুধু রাইফেল হাতে নিয়ে সঙ্গীন উঁচিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করল। জাপানী সৈন্যদলটিতে মাত্র ছিল দেড়শো সৈন্য। কিন্তু প্রায় নব্বই জন জাপানী সৈন্য নিহত হলো সে যুদ্ধে।

শত্রুরা তখন জাপানী সৈন্যদের ঘিরে ফেলেছে। জাপানীরা তা দেখে আহত ও নিহতদের ফেলে রেখে প্রাণভয়ে পিছু হটে কোনরকমে পালিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন বাগরী তখন ভীষণভাবে গুলিবর্ষণ করতে লাগলেন শত্রুদের লক্ষ্য করে। শত্রুরা কিছুটা পিছিয়ে গেল। তখন আহত ও নিহত জাপানী সৈন্যদের তিনি এদিকে নিয়ে এলেন। রাত্রিকালে জাপানী সৈন্যদলের ব্রিগেডিয়ার এসে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আহত ও মৃত জাপ সৈন্যদের উদ্ধার করে আজাদ হিন্দ ফৌজ সত্যিই অশেষ উপকার করেছে তাঁদের।

এই সময় পীনমনার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অস্ত্রশস্ত্রবাহী এক জাপ ইউনিট এগিয়ে আসছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানের আক্রমণে তা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তখন পীনমনার যুদ্ধ বাধ্য হয়ে স্থগিত রাখতে হয়। নেহেরু ব্রিগেডের চার নম্বর গেরিলা বাহিনীও প্রস্তুত হয়ে ছিল পীনমনা আক্রমণের জন্য। সব ভেস্তে গেল।

বৃটিশরা তখন ইরাবতী নদীর উপর নিয়েঙ্গু ও পাকাকৌ নামে দু জায়গায় পুল করেছে। তার উপর মেকটিলা দখল করায় বর্মার

বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য ও রসদ পাঠাবার সুবিধা হয়েছে। সারা ব্রহ্মদেশে জাপানীদের তখন জয়ের আর কোন আশা নেই। তার উপর বিপ্লবী বর্মী সেনাদল বাধা সৃষ্টি করছে জাপানীদের বিভিন্ন কাজে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি যে সাত হাজার বর্মী সৈন্যের একটি বিরাট দল যুদ্ধের জন্য রেঙ্গুন থেকে প্রোমে যায়, তারা ইরাবতী নদী পার হয়ে হঠাৎ একই সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতা ও জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারপর তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সাদা পোষাকে ঘুরে বেড়িয়ে গেরিলা আক্রমণ চালাতে থাকে।

পোপা ও ম্যাগওয়েতে জাপানী অফিসাররা একবার বর্মী গেরিলাদের আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনীকে অনুরোধ করে। তখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর অফিসাররা সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা বলেন, আমাদের কাজ হলো ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বর্মীরাও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব কেন?

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই সব কথা বিপ্লবী বর্মী বাহিনীর নেতা আউং সান শুনে আজাদ হিন্দ ফৌজের নীতির বিশেষ প্রশংসা করেন এবং তাঁর দলের লোকদেরও নির্দেশ দেন তারাও যেন আজাদ হিন্দ ফৌজকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করে, তাদের বিরুদ্ধে কখনও লড়াই না করে।

১৯৪২ সালের আগে বৃটিশরা যখন ব্রহ্মদেশ শাসন করত তখন তারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এক তিক্ত বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে দেয় বর্মীদের মনে। এই বছর এপ্রিল মাসে জাপান যখন এগিয়ে আসতে থাকে তখন বহু সংখ্যক ভারতীয় বর্মা থেকে ভারতে চলে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বর্মীরা তাদের হত্যা করে। এই সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় এইভাবে নিহত হয়।

কিন্তু পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্মীদের সমস্ত বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। নেতাজী আসার পর হতে তাঁকে বর্মীরাও নিজেদের ও সারা পূর্ব এশিয়ার নেতা বলে মনে করত।

বিপ্লবী বর্মী সেনাদলের সাহায্য ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় ডিভিসনের পক্ষে প্রোম ও পেগু যাওয়া সম্ভব হত না।

১লা মে তারিখে সকালবেলায় জেনারেল শাহ নওয়াজ দ্বিতীয় ডিভিসনের কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে প্রোম ও পেগু অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যান। প্রথমে ইরাবতী নদীর পূব দিকে সৈন্য সমাবেশ করেন। পরের দিন সকালে প্রোমের পাঁচ মাইল উত্তরে একটি গাঁয়ে গিয়ে শোনেন, জাপানীরা প্রোম শহরটি কবে জ্বালিয়ে দিয়েছে আর বৃটিশরা তুংগু দখল করে নিয়েছে। জেনারেল শাহ নওয়াজের সঙ্গে অফিসারদের মধ্যে ছিলেন, মেজর রাম স্বরূপ, মেজর মেহার দাস, মেজর এ, পি, সিং, কর্ণেল ধীলন, মেজর রঙ্গনাথন আর কর্ণেল রোডারিগস।

শাহ নওয়াজ আরও শুনলেন, নেতাজী এখন মৌলমেনে আছেন। সুতরাং তিনিও ঠিক করলেন, তিনিও তাঁর বাহিনী নিয়ে মৌলমেনের দিকে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছিল রুগ্ন আর আহত সৈনিকদের নিয়ে। জাপানীদের মত পালাবার সময় আহত সৈনিকদের গুলি করে মারার পক্ষপাতী ছিল না আজাদ হিন্দ ফৌজ। তার চেয়ে তারা শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পণ করুক। শত্রুপক্ষ তাদের মারে মারুক। মারতে গিয়ে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিক। তাতে বৃটিশপক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের মন নিশ্চয়ই বিষিয়ে উঠবে।

প্রোম তখন শত্রুদের দখলে। রাত্রির অন্ধকারে প্রোমকে

ফেলে রেখে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন শাহ নওয়াজ। রুগ্ন আহতরাও সঙ্গে যেতে চায়। তারা আত্মসমর্পণ করবে না। যুদ্ধ করবে শেষপর্যন্ত। রেঙ্গুন-প্রোম রোড ধরে যেতে লাগলেন।

হাতের কাছে যানবাহন যা পাচ্ছে তাই নিয়ে জাপানীরা তখন পালাচ্ছে। তারা শুধু তখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা ভাববার সময় নেই।

এইভাবে দু তিন দিন চলার পর একটি গাঁ পেলেন শাহ নওয়াজ। জাপানীরা চলে গেছে পূব দিকে। সেখান থেকে মার্চ করে তাইকচি নামে একটি জায়গায় এলেন। গ্রামটি রেঙ্গুন থেকে মাত্র তিরিশ মাইল দূরে। সেখানে শুনলেন, রেঙ্গুন দখল করে বৃটিশ সৈন্য এই দিকেই এগিয়ে আসছে। শাহ নওয়াজ তখন ঠিক করলেন, তিনি বড় রাস্তা ছেড়ে পেগুর দিকে গিয়ে সিটাং নদী পার হয়ে মৌলমেন বা ব্যাঙ্ককে তাঁদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন।

এই উদ্দেশ্যে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পেগুর দক্ষিণ দিকে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন শাহ নওয়াজ। ১২ই মে তারিখে ওয়াটস গাঁয়ে এসে শুনলেন, শত্রুসৈন্যরা পেগু দখল করে নিয়েছে। তিনি আরও শুনলেন, জার্মানিরা মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করছে আর প্রচুর বোমাবর্ষণের ফলে জাপান পরাজয়ের মুখে।

এই কথা শুনে একটি ছোট সৈন্যদলকে পাশের গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলেন শাহ নওয়াজ শত্রুরা ঠিক কোথায় আছে তা জানবার জন্য। দলটি পরের দিনই ফিরে এসে বলল, আমাদের পালাবার আর পথ নেই। শত্রুরা চারিদিকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। পঞ্চাশ হাজার জাপানী সৈন্যদেরও ঘিরে ফেলেছে।

পরের দিন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ চলা শুরু হলো আবার।

রাত্রিবেলায় সমস্ত অফিসার ও সৈন্যদের ডেকে শাহ নওয়াজ বললেন, জার্মানির আত্মসমর্পণ, আনবিক বোমার আবিস্কার প্রভৃতি ঘটনার জন্য আমাদের যুদ্ধের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। ভারত যতদিন না স্বাধীন হয় যুদ্ধ আমাদের চলবেই। তবে সে যুদ্ধের রীতি ও কৌশলটা পরিবর্তন করতে হবে শুধু। আমার মতে এখন সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হলো মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে ভারতে যাওয়া। যারা বেঁচে থাকবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য নতুন করে সংগ্রাম শুরু করবে।

শাহ নওয়াজ ডিভিসনের প্রধান নেতা হয়ে এইভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না। তাই তিনি বললেন, এ ভাবে আমার কিন্তু আত্মসমর্পণ করা সম্ভব না। আমাকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মরতেই হবে। তবে আমি আমার সঙ্গে মাত্র পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছাসেবক চাই।

পঞ্চাশ জনের জায়গায় তিনশো জন সৈনিক আর সব অফিসার শাহ নওয়াজের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়ালেন। কর্ণেল ধীলন তখন তিনশো জনের মধ্যে পঞ্চাশ জনকে বেছে নিলেন।

বাকি লোকদের বিদায় দিয়ে শত্রুদের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণের আদেশ দিলেন শাহ নওয়াজ। কিন্তু তারা কিছুতেই যাবে না। তারা সবাই লড়াই করে একসঙ্গে মরতে চায়। এইভাবে দল ছাড়া হয়ে যাবে না। তাদের অনেকে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পাঁচজন রাইফেল তুলে 'জয়হিন্দ' বলে চীৎকার করে নিজেদের গুলি করে আত্মহত্যা করল।

তখন শাহ নওয়াজ সে দৃশ্য দেখতে না পেরে বললেন, এভাবে তোমরা আত্মহত্যা করলে আমিও তাই করব।

তখন সবাইকে ডেকে নতুন উপায় খুঁজতে লাগলেন। রাতটা সবাই মিলে একসঙ্গে কাটিয়ে সকাল হতেই এ, বি, সিং আর

জাগীর সিংএর একটি দল শাহ নওয়াজের নির্দেশমত বৃটিশদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য চলে গেল।

তারপর ধীলন, মেহার দাস প্রভৃতি জনকতক অফিসার আর সেই পঞ্চাশ জন বাছাই করা সৈনিক নিয়ে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চললেন শাহ নওয়াজ। পথে যেতে যেতে যে গাঁ-ই সামনে পান সেই গাঁ-ই বৃটিশের গুপ্তচরে ভর্তি।

সেদিন ১৭ই মে। জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় চারিদিক ভাসছে। মিলেমিশে এক হয়ে গেছে আকাশের নীল আর বনের সবুজ। আগের দিন জোর বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে। এ ধারে বর্ষা খুব তাড়াতাড়িই পড়ে। বর্ষা পড়লে আর রক্ষা নেই।

সেই রাতে একটি গাঁয়ে শাহ নওয়াজরা ঢুকতে যেতেই বৃটিশ সৈন্যরা গুলি করতে লাগল অতর্কিতে। কয়েকজন আজাদ হিন্দ সৈনিক মারা গেল। শাহ নওয়াজ ও অন্যান্যরা পিছু হটে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। পরের দিন সকাল হতেই শাহ নওয়াজ দেখলেন মাত্র পাঁচশো গজ দূরে শত্রুসৈন্যরা ঘাঁটি করেছে। চারিদিকেই শত্রু।

তখন সকলকে ডেকে শাহ নওয়াজ বললেন, পরিত্রাণের আর কোন উপায় নেই। এখন শুধু তিনটি পথ খোলা আছে আমাদের সামনে। প্রথম পথ হলো, আত্মহত্যা করে মরা। দ্বিতীয় হলো শত্রুদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মরা। আর তৃতীয় পথ হলো শত্রুদের হাতে মরা। দ্বিতীয় পথেই আছে প্রকৃত গৌরব। তবে তৃতীয় পথটির কথাও ভেবে দেখা দরকার। কারণ আমার মনে হয় বৃটিশ সৈন্য যদি আমাদের জীবন্ত ধরতে পারে তাহলে ভারতে চালান দেবে। সেখানে সামরিক বিচারের পর গুলি করে মারবে। তবে সেখানে একটা ক্ষীণ আশা আছে, মরবার আগে আমরা আমাদের দেশের লোকের কাছে আমাদের আজাদ

হিন্দ ফৌজের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলবার সুযোগ পেতে পারি।

কর্ণেল ধীলনও তৃতীয় পথটিই সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, আমরা নিজেদের খুন করতে যাব কেন, খুন করতে হয় বৃটিশ সৈন্যরা করুক। এই জঘন্য কাজ করতে গিয়ে বৃটিশ হেয় হবে লোকচক্ষে। আমাদের আত্মীয় স্বজনরা বৃটিশদের প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে উঠবে। তাছাড়া যুদ্ধ করে গৌরবের সঙ্গে বিদেশের মাটিতে মরার থেকে দেশের মাটিতেই মরা ভাল।

সবাই একমত হলেন এ বিষয়ে। এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা বিনা যুদ্ধে ধরা দিলেন। বৃটিশপক্ষের এক ভারতীয় বাহিনী তাঁদের বন্দী করে পেগুর জেলে পাঠিয়ে দিল।

পেগুর জেলে একজন বৃটিশ সামরিক অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল শাহ নওয়াজ বলেন, আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিলাম এবং ছাড়া পেলে আবার যুদ্ধ করব।

অফিসার আরও জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা তবে আত্মসমর্পণ করলে কেন?

শাহ নওয়াজ বললেন, তোমরা ডানকার্ক ও সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে কি করেছিলে?

অফিসার আবার প্রশ্ন করলেন, তোমাদের নেতাজী টাকা পেতেন কোথা হতে?

শাহ নওয়াজ বললেন, বেসামরিক ভারতীয় অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় দান করত।

পেগু থেকে শাহ নওয়াজকে পাঠানো হয় রেঙ্গুনে। সেখান থেকে কলকাতা, তারপর কলকাতা থেকে আবার দিল্লীতে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসনের কিছু সৈন্য আত্মসমর্পণ

করে জেয়াওয়াদিতে। আর বেশীর ভাগ সৈন্য গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কোহিমা হতে যাত্রা শুরু করেছিল। ব্যাঙ্কক যাবার জন্য তিন হাজার মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে তারা। সঙ্গে রেশনের ব্যবস্থা নেই, হাতে অস্ত্র নেই। কখনও গাছের ফল খেয়ে কখনও পাতা খেয়ে, কখনও ঘাস সিদ্ধ করে খেয়ে তারা দুর্গম জঙ্গল ভেদ করে আর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। তার উপর মাঝে মাঝে শত্রুদের গেরিলা আক্রমণ সহ্য করতে হত পাহাড় অঞ্চলে। তাদের সহিষ্ণুতা ও বীরত্ব দেখে শত্রুরাও প্রশংসা না করে পারেনি।

কিন্তু এত কষ্ট করে ব্যাঙ্কক পৌঁছানো তাদের আর হয়নি। তাদের পৌঁছানোর আগেই বৃটিশ সৈন্যরা ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাঙ্কক অধিকার করে ফেলে।

॥ ত্রিশ ॥

ওদিকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি তুংগুতে জাপানীরা হেরে যেতেই জাপানীরা নেতাজীকে রেঙ্গুন ছেড়ে যাবার জন্য অনুরোধ করে। প্রথমে যেতে চাননি নেতাজী। পরে প্রবীণ অফিসাররা তাঁকে বুঝিয়ে ব্যাঙ্কক যেতে রাজী করাল।

রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্কক যাবার জন্য জাপানীরা একটি বিমান দিল নেতাজীকে। কিন্তু নেতাজী দেখলেন, তিনি বিমানে গেলে ঝাঁসির রাণী বাহিনীর মেয়েরা আর যেতে পারবে না।

২৩শে এপ্রিল সমস্ত জাপানীরা রেঙ্গুন ত্যাগ করে। কিন্তু নেতাজী বললেন, ঝাঁসির রাণী বাহিনীর মেয়েরা না গেলে তিনি

তাদের ফেলে যাবেন না। অবশেষে তাই হলো। সব মেয়েকে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। যাদের বাড়ি মালয় ও ব্যাঙ্ককে তাদের নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে বর্মার সরকার ও জনসাধারণকে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে যান।

বর্মী ও ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার ভারতীয় ও বর্মা বন্ধুরা! আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্মা ত্যাগ করে যাচ্ছি। যাচ্ছি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। আমরা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে হেরে গিয়েছি কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হবার কিছু নেই। যুদ্ধের এখনও অনেক বাকি আছে। ব্রহ্মদেশের ভারতীয়রা লোকজন ও টাকাকড়ি দিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক সাহায্য করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আমি আগেই বলেছি, অন্ধকার যত গভীরই হোক না কেন, তারপর আলো আছে। বর্তমানে আমরা গভীরতম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি; সুতরাং সুপ্রভাত আর দেরি নেই। ভারত স্বাধীন হবেই।

আমি হচ্ছি জন্ম—আশাবাদী। ভারতের স্বাধীনতায় আমার বিশ্বাস এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরাও এই আশা পোষণ করো।

২৫শে এপ্রিল সবাইকে নিয়ে রওনা হলেন নেতাজী। পনেরটি লরিতে উঠল ঝাঁসির রাণী বাহিনীর সব মেয়েরা। ছয়টি গাড়িতে উঠল তার হেডকোয়ার্টারের স্টাফ অফিসারেরা আর ছয়শো সৈনিক মেজর পি, এস, রাতুরির নেতৃত্বে মার্চ করে ব্যাঙ্ককের পথে এগিয়ে যেতে লাগল। এ ছাড়া পাঁচ হাজার আজাদ হিন্দ সৈন্য রেঙ্গুনে ভারতীয়দের বর্মী দস্যুর কবল থেকে রক্ষার কাজে নিযুক্ত রয়ে গেল।

বর্মী সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠার পর জাপানী সৈন্যরা রেঙ্গুন

ছেড়ে চলে যায়। সেই সুযোগে বর্মী দস্যুরা ভারতীয় অধিবাসীদের ধনসম্পত্তি লুট ও নানারকমের অত্যাচার করতে থাকে। এজন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের এক বিরাট বাহিনীকে রেঙ্গুনে রেখে যান নেতাজী।

সারারাত গাড়িতে করে যাওয়ার পর পরদিন সকালবেলায় পেগুর কাছে রেঙ্গুন-মৌলমেল রোডের উপর একটি গাঁয়ে পৌছলেন নেতাজী। সব দেখাশোনা করে এক কাপ চা খেলেন। সারারাত একটুও ঘুম হয়নি। চোখ ছুটো লাল। তবু কোন ক্লান্তি নেই। গত রাত্রিতে পথে তাঁদের দারুণ বিপদ গেছে। সঙ্গে জাপানী সৈন্য একেবারেই নেই। বিদ্রোহী বর্মী গেরিলা সৈন্যরা পথের ছুপাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে যে কোন গাড়ির উপর গুলি ছোড়ে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নেতাজীর 'কনভয়ের' উপর কোন আক্রমণ করেনি।

চা খেয়ে সকলের খাবারের ব্যবস্থা করে কতকগুলো গাছের মাঝখানে বসে একটু বিশ্রাম করলেন। তারপর দাড়ি কামাতে শুরু করলেন। মাথার উপর দিয়ে নিয়ত শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান উড়ে যাচ্ছে। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই নেতাজীর। একবার একটি শত্রুদের যুদ্ধবিমান খুব কাছে নেমে গাছগুলিকে ঘিরে ফেলল। নেতাজীর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তারা সবাই ট্রেঞ্চের মধ্যে গা ঢাকা দিলেন অথচ নির্বিকারভাবে দাড়ি কামাতে লাগলেন নেতাজী। যেন কিছুই হয়নি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে যে একটা বিরাট ছুর্লঙ্ঘ্য সীমারেখা আছে, তার কথা ভুলেই গেছেন যেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর শত্রুদের বিমানগুলি চলে গেলে যেখানে ঝাঁসি-বাহিনীর মেয়েরা বিশ্রাম করছিল সেখানে পরিদর্শন করতে গেলেন। ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন নেতাজী। সঙ্গে আছেন ঝাঁসি বাহিনীর অধিনায়িকা লেফটেন্যান্ট মিস জানকী থীভার।

এমন সময় আবার সেই বোমারু বিমান এসে পড়ল। গা ঢাকা দেবার কোন উপায় নেই। মিস জানকী অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু মাঠের মাঝে এক জায়গায় চুপ করে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগলেন নেতাজী।

বেলা তখন চারটে। একজন অফিসারকে ডেকে নেতাজী আদেশ দিলেন, এখনই মটর সাইকেলে করে গিয়ে আমাদের যে সব সৈন্যরা মার্চ করে হেঁটে আসছে তাদের বড় রাস্তা ছেড়ে রেললাইন ধরে যেতে বল। কারণ ঐ পথে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

নেতাজী যা বলেছিলেন ঠিক তাই হলো। আজাদ হিন্দ সৈনিকরা ঠিক সময়ে খবর পেয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে চলে যেতেই সেই পথে শত্রুপক্ষের বহু ট্যাঙ্ক এসে পড়ে। অথচ এ খবর নেতাজীকে কেউ আগে দেয়নি। কিভাবে একথা মনে এল নেতাজীর তা কেউ বুঝতে পারল না। যেমন বুঝতে পারল না, কোন শক্তির বলে কোন বিপদকে গ্রাহ্য করেন না নেতাজী।

২৫শে এপ্রিল সন্ধ্যের দিকে পেগুর কাছাকাছি সেই গাঁ-টি ছেড়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন নেতাজী। পরদিনই বৃটিশ সৈন্যরা এসে পেগু দখল করে। নেতাজী থাকলে হয় তারা তাঁকে বন্দী করত অথবা মেরে ফেলত।

বৃষ্টি নামল সন্ধ্যের পর। মেঠো পথ। নেতাজীর গাড়িটি খালে পড়ে গেল। আর উঠল না। নেতাজী অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গেলেন। গাড়িটি ফেলে রেখে কোনরকমে সকলে মিলে রাত প্রায় দুটোর সময় সিটাং নদীর ধারে এসে হাজির হন। এই নদীটা পার হবার জন্য জাপানীরাও তাড়াহুড়ো করছে। কারণ এ পথে বৃটিশ ট্যাঙ্ক এসে পড়বে শীগগিরই। তাছাড়া দিনের বেলায় আর পার হওয়া হবে না। দেখে ফেলবে শত্রুরা।

নদী পার হওয়ার ফেরি নৌকোগুলো জাপানীরা সব নিয়ে

নিয়েছে। কেবলমাত্র একটা নৌকো আজাদ হিন্দ ফৌজকে দিল জাপানীরা। জাপানী অফিসার জেনারেল ইশোদা নেতাজীর কাছে এসে বললেন, আপনি সবচেয়ে আগে নিরাপদে পার হয়ে যান। তার পর বাকি সব যাবে।

নেতাজী রেগে বললেন, কী বলছ তুমি, জাহান্নামে যাও। মেয়েরা এখানে সব পড়ে থাকবে আর আমি আগে পার হব ?

কর্ণেল মল্লিক ও মেজর স্বামী পরীক্ষা করে দেখলেন নদীর গভীরতা মাত্র ছয় ফুট। তখন মেয়েরা সব রাইফেল হাতে সাঁতরে পার হলো। নেতাজী এক এক করে পনেরটি লরি পার করার পর নিজে ওপারে গেলেন।

পরদিন ২৬শে এপ্রিল নদীর ওধারে একটি গাঁয়ে বিশ্রাম করার সময় শত্রুদের বিমান আক্রমণ শুরু হলো। পরিখা কাটা আছে খুব অল্প। সবার জায়গা হবে না। মেয়েরা গাছের গুঁড়ির পাশে লুকিয়ে রইল কোন রকমে। কর্ণেল চ্যাটার্জি ছুটে এসে নেতাজীকে কোন একটি পরিখার মধ্যে ঢুকতে বললেন। কিন্তু নেতাজী বললেন, বাইরে মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে আর আমি পরিখায় গিয়ে ঢুকব ?

শান্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে লাগলেন নেতাজী। শত্রুদের গোলায় ছয়টি লরি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মেয়েরা কোনরকমে বেঁচে গেল।

এইভাবে দিনে কোন গাঁয়ে বা কোন বনের মাঝে বিশ্রাম করে আর সারারাত ধরে প্রায় দশ পনের মাইল করে পথ হেঁটে ১লা মে তারিখে মৌলমেন পৌঁছলেন নেতাজী, এই ছয়দিন দিনে মাত্র দু ঘণ্টা করে ঘুমিয়েছেন তিনি। অবসর সময়েও বিশ্রাম করেননি। ঘুরে বেড়িয়ে সকলের সুবিধা অসুবিধা দেখেছেন। কি করতে হবে না হবে তার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর পা দুটি ফোস্কায় ভরে গেছে। তাঁর গাড়ি পিছনে পিছনে এসেছে। অথচ তিনি চাপেননি। যারাই তাঁকে অনুরোধ করতে এসেছেন তিনি সবাইকে এক কথা

বলেছেন, সকলকে ফেলে আমি একা গাড়ি চেপে যেতে পারব না।

২রা মে ঝাঁসির রাণী বাহিনীর সব মেয়েদের ট্রেনে করে মৌলমেন থেকে ব্যাঙ্কক পাঠিয়ে দিলেন নেতাজী। জেনারেল চ্যাটার্জি আর কর্ণেল মল্লিক মেয়েদের সঙ্গে গেলেন।

৭ই মে সকালে ব্যাঙ্কক পৌঁছল ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েরা। জানবাজ ইউনিটের সেই ছয়শো সৈনিক যারা মেজর রাতুরির নেতৃত্বে মার্চ করে আসছিল তারাও ব্যাঙ্কক পৌঁছাল পরের দিন। নেতাজী গাড়িতে করে এসেছেন ৬ই তারিখে। এসেই সকলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সকলের প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি।

জানবাজ ইউনিটের সেই সেনাদলটি হয়ে পড়েছিল সবচেয়ে ক্লান্ত। ভেঙ্গে যাওয়া সুভাষ ব্রিগেড থেকে আসা এই দলটি ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি থেকেই হাঁটছে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তাঁরা রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যাঙ্ককে এসে নেতাজীর তত্ত্বাবধানে মাছ দুধ ফল প্রভৃতি ভাল খাবার খেয়ে দিনকতকের মধ্যেই সুস্থ সবল হয়ে উঠল তারা আবার।

২৭শে মে তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে বাহিনীটি কর্ণেল ঠাকুর সিংএর নেতৃত্বে পীনমনায় যুদ্ধ করছিল এবং যাদের খবর অনেকদিন পাওয়া যায়নি তারা হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে অতি কষ্টে ব্যাঙ্ককে এসে পৌঁছাল। এই বাহিনীতে ছিল এক হাজার সৈন্য। তারা নেতাজীকে দেখার জন্য তিনমাস ধরে বহু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নদী পেরিয়ে এক হাজার মাইল পথ ক্রমাগত হেঁটেছে।

এদের সকলের খাওয়া থাকার সব ব্যবস্থা করে নেতাজী মালয় চলে গেলেন জুন মাসের প্রথমে। সেখানে আছে আজাদ হিন্দ ফৌজের তৃতীয় ডিভিসন।

আবার শুরু হলো বেতার প্রচারের কাজ। ব্যাঙ্কক রেডিও স্টেশান কাজ শুরু করে দিল। জেনারেল চ্যাটার্জি ও আয়ার সারা

পূর্ব এশিয়া জুড়ে কাজের তালিকা তৈরি করলেন। প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হবে সিঙ্গাপুরে। দ্বিতীয় কেন্দ্র হবে সাইগনে।

এই সময় ভারতে রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে রেডিও মারফৎ খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন নেতাজী। বৃটিশ ও আমেরিকান রেডিও ভারতের খবরাখবর প্রচার করে নিয়মিত।

খবর পেলেন জওহরলাল নেহেরু ১৫ই জুন মুক্তি পেয়েছেন আলমোড়া জেল থেকে। নইনি সেন্ট্রাল জেল থেকে তাঁকে আলমোড়ায় পাঠানো হয়েছিল মার্চের শেষে। কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদও মুক্তি পেয়েছেন। এর মধ্যে ভারতের বড়লাট ওয়াভেল লণ্ডন থেকে এক প্রস্তাব এনেছেন। এই প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান তিনি তাঁর সিমলার গ্রীষ্মাবাসে।

কংগ্রেস নেতারা জড়ো হলেন সিমলায়। সেইখানেই আজাদ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলেন। এই সভার সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করেই হবে আলোচনা।

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না নেতাজী। তিনি জানতেন আরামপ্রিয় বিপ্লববিমুখ কংগ্রেস নেতারা ওয়াভেলের প্রস্তাব মেনে নেবেন। ১৮ই জুন ভারতের উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে নেতাজী বললেন,

ভাই ও বোনেরা! ১৪ই জুন তারিখে বড়লাট দিল্লী থেকে কি বলেছেন আমি তা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনেছি। তাঁর বিবৃতির সঙ্গে তিনি বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব রেখেছেন ভারত সম্বন্ধে। আমার যতদূর মনে হয় এবং বড়লাট নিজেও স্বীকার করেছেন, এ বিষয়ে বৃটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য হলো, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা লাভ করা। ইউরোপের যুদ্ধে রণক্লান্ত বৃটিশ এখন বিশ্রাম চায়, তাই সে ভারতকে নিযুক্ত করতে চায় জাপানের বিরুদ্ধে

যুদ্ধে। ব্রহ্মদেশে ইঙ্গ-মার্কিন জয়ের পর বৃটিশ চায় ভারতের রক্ত ও সম্পদের জোরে দূরপ্রাচ্যে ও প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান চালাতে।

কিন্তু ভারতের রক্ত ও সম্পদের অপচয় করে বৃটিশকে জাপান বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সাহায্য করে কি লাভ হবে ভারতের? বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের কয়েকটি আসন ছাড়া আর কিছুই নয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে বৃটিশরা প্রচার করত ভারতে জাপানীরা এসে পড়ল, তোমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। অতএব লড়াই করো। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের মোড় ঘুরেছে। সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন প্রয়োজন নেই ভারতের।

এখন লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব কোনক্রমেই মানা চলে না। স্বায়ত্তশাসনের খাতিরেও নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসন নিতে ভারত আর চায় না। ভারত এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই চায় না।

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের মধ্যে আর একটি খারাপ দিক আছে। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বলেছেন, তাঁর প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে ১৯৪২ সালের বিপ্লবে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের জেলের মধ্যেই রয়ে যেতে হবে। কিন্তু তিনি একথা কোথাও বলেননি, যদি তাঁর প্রস্তাব মেনে নেয়া হয় তাহলে ১৯৩৯ ও ১৯৪২ সালে যাঁরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তাঁদের সকলকেই মুক্তি দেয়া হবে।

বড়লাট আলোচনার জন্য সিমলায় যে বৈঠক আহ্বান করেছেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। একথা শুনে নেতাজী ২২শে জুন বললেন, যাঁরা বর্তমান জাতীয় কংগ্রেসের হাবভাবের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কাছে এ খবরটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব সম্বন্ধে ভারতের এক সংবাদ প্রতিষ্ঠান মন্তব্য করেছেন, বড়লাটের প্রস্তাব

সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতারা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। প্রথম দলে আছেন গান্ধীজী আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এঁরা বড়লাটের ভাষণে 'বর্ণহিন্দু' এ কথাটি ব্যবহার করায় খুব চটে গেছেন। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব করছেন জওহরলাল নেহেরু ও মৌলানা আজাদ। বৃটিশ যতটুকু ক্ষমতা এখন হস্তান্তর করছে এঁরা তাতে সন্তুষ্ট না হলেও পরীক্ষামূলক ভাবে এই ক্ষমতাটুকুই এখন নিতে চান। এঁরা মনে করেন এর মাধ্যমেই গরীব ভারতীয় জনগণের জন্য কিছু করা যাবে এবং পরে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার বৃহত্তর দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে। তৃতীয় দলের মধ্যে আছেন রাজাগোপালাচারী ও ভুলাভাই দেশাই। বিনা দ্বিধায় তারা এই প্রস্তাব মেনে নিতে চান। এঁরা বলেন, এ বিষয়ে কংগ্রেসের ভয় একেবারে ভিত্তিহীন।

কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব যাই হোক, আমি গতকালের ভাষণে বলেছি, এবং আবার বলছি কার্যকরী পরিষদ সমগ্র জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি নয়, সুতরাং লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস কর্মীর পক্ষ থেকে কার্যকরী পরিষদ এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কখনও শেষ কথা বলতে পারে না। কার্যকরী পরিষদ নিজের দায়িত্বে সিমলা কনফারেন্সে যোগদানের সিদ্ধান্তও নিতে পারে না। বৃটিশের ভারত ছাড়ার কথা ছাড়া আর কোন চুক্তি চলতে পারে না বৃটিশের সঙ্গে।

আমি মনে করি, ভারতের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে তিনটি ঘটনা কাজ করে যাচ্ছে এবং এদের প্রভাব এমন কিছু কম নয়। প্রথমতঃ ভারতের মধ্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত ভারতের বাইরে বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে এবং তৃতীয়ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছে। ব্রহ্মদেশে আমাদের পরাজয় ঘটলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের মূল বাহিনী এখনও সংগ্রাম ত্যাগ করেনি। যতদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সৈনিকও বেঁচে

থাকবে এবং যতদিন আমাদের পায়ের তলায় দাঁড়াবার মত এতটুকু মাটিও থাকবে ততদিন আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। সংগ্রাম চালিয়ে যাব ভারতের স্বাধীনতার জন্য।

নেতাজী যাই বলুন না কেন, কংগ্রেস নেতারা তখন আরাম পেয়ে ভুলে গেছেন। জেল থেকে বেরিয়েই আজাদ ও নেহেরু বৃটিশের সঙ্গে আপোষের জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সিমলায় এসে কংগ্রেস সভাপতি আজাদ কোন এক হোটেলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট সাহেব তাঁকে বিশেষ খাতির করে লাটভবনের একটি সুন্দর প্রকোষ্ঠে প্রভূত আরামের মধ্যে রাখেন। বড়লাটের আতিথেয়তায় বিশেষ প্রীত হন আজাদ সাহেব। এই প্রীতির ঝোঁকেই পরে কমিটির কাছে সুপারিশ করে বড়লাটের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলেন, we should accept it.

আজাদ কমিটিকে আরও বললেন, বড়লাট বলছিলেন, রাজনৈতিক মতামত যাই হোক না কেন, কংগ্রেস নেতারা বিশেষ ভদ্র।

সিমলা কনফারেন্সে বড়লাট তাঁর কার্যকরী পরিষদ পুরোপুরি ভারতীয়করণ করার আশ্বাস দিলেন। তবে অবশ্য জিন্না যদি একমত হন। কিন্তু জিন্না একমত হবেন না তা তিনি জানতেন। জিন্না বললেন, ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের অবাধ ও একক অধিকার থাকবে একমাত্র মুসলিম লীগের এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করবে শুধু হিন্দুদের। জিন্নার অনমনীয়তার জন্য ভেঙ্গে গেল কনফারেন্স।

তাঁর কার্যকরী পরিষদে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের সমান সমান আসন দিতে চাইলেন বড়লাট। কংগ্রেস বলল, ঠিক আছে, আমাদের কংগ্রেসী মুসলমানরাই মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলিতে বসুন। কিন্তু জিন্না বললেন, কংগ্রেস নয় ওখানে বসবে মুসলিম লীগের লোক।

ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে ভারত সচিব লর্ড এ্যামেরি তা সত্বেও বললেন,

বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন দেশের মর্যাদা নিয়ে এবার অচিরেই ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির পাশে এসে বন্ধুর বেশে দাঁড়াবে।

এ্যামেরি আশা পোষণ করলেন, অচিরেই ভারতীয় কংগ্রেস শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

আজাদ হিন্দের ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন মহা ভাবনায় পড়লেন নেতাজী। জার্মানির আত্মসমর্পণের কথা আগেই শুনেছেন তিনি ব্যাঙ্ককে এসে। আরও শুনেছেন, রাশিয়া জাপান আক্রমণ করেছে। এ অবস্থায় একা আজাদ হিন্দ ফৌজ পূর্ব এশিয়ায় কিভাবে যুদ্ধ করবে তা সত্যি ভাবনার কথা।

তবু সে কথা না ভেবে শুধু ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবতে লাগলেন নেতাজী। প্রায় রোজই সিঙ্গাপুরের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের বেতারে ভাষণ দিতে লাগলেন ভারতের উদ্দেশ্যে। অক্লান্তভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রচার করে যেতে লাগলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, পূর্ব এশিয়ায় আমাদের কাজ হবে দ্বিবিধ। প্রথমত ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে যুদ্ধ আমরা পূর্ব এশিয়ায় শুরু করেছিলাম, আজ মালয়কে ঘাঁটি করে সে যুদ্ধ আমরা চালিয়ে নিয়ে যাব। দ্বিতীয়ত আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে যাব এবং রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের মধ্যে যে কোন মতভেদের সুযোগ গ্রহণ করব।

জুলাই মাস পড়তেই এবারও নেতাজী সপ্তাহ পালনের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। নেতাজীর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মালয় ও সিঙ্গাপুরের অধিবাসীরা শুনবে না। ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই অর্থাৎ আজ হতে দু বছর আগে এই দিনটিতে পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ দল ও ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের ভার গ্রহণ করেছিলেন নেতাজী। এই দিনটিতেই, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে যাবার পবিত্র শপথ নেন পূর্ব এশিয়ার অজস্র প্রবাসী ভারতবাসী। সুতরাং এই দিনটি ভুলবার নয়।

৮ই জুলাই মৃত আই, এন, এ সৈনিকদের জন্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন নেতাজী। তারপর সেখান থেকে মালয়ের ভারতীয় অধিবাসী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের তৃতীয় ডিভিসনের সৈন্যদের দেখাশোনার জন্য মালয়ে চলে যান।

মালয় থেকে ১১ই আগস্ট খবর পেলেন নেতাজী, রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। ১৩ই আগস্ট সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজীর তুজন পরামর্শদাতা এসে খবর দিলেন, জাপান আত্মসমর্পণ করতে চলেছে। নেতাজী তখন সিঙ্গাপুরে জাপানী সামরিক কর্তাদের জানিয়ে দেন, জাপানীরা নিজেরা যা করে করুক, কিন্তু আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে যেন কোন কথা না বলে। আজাদ হিন্দ সরকার এ বিষয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

জাপানী জেনারেল জানালেন, এ বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না, তেরাউচি যা করবেন তাই হবে। নেতাজী নিজে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন যুদ্ধ সম্বন্ধে কথা বলার জন্য। সেখান থেকে ব্যাঙ্কক গেলেন ১৬ই আগস্ট। মালয়ের আজাদ হিন্দ ফৌজের সব ভার দিয়ে এলেন কিয়ানির হাতে।

কাউন্ট তেরাউচি তখন সাইগনে। ব্যাঙ্ককে আজাদ হিন্দ ফৌজের সব দলগুলি পরিদর্শন করলেন নেতাজী। সৈনিকরা 'নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ', ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানাল নেতাজীকে। নেতাজীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

রাত্রিবেলায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সব অফিসারকে ডেকে আলোচনা করলেন, যদি আজাদ হিন্দ ফৌজকেও আত্মসমর্পণ করতে ওরা বলে তাহলে কি করা হবে।

পরদিনই ব্যাঙ্কক থেকে সাইগনে গিয়ে তেরাউচির সঙ্গে কথা বললেন নেতাজী, কিন্তু তেরাউচি বললেন, টোকিও থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তিনি কিছু বলতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে সাইগন থেকে

টোকিও যাবার মনস্থির করে বসলেন নেতাজী। জেনারেল ইশোদাকে এ কথা জানাতে তিনি টোকিওগামী একটি বিমানে নেতাজীর জন্য একটি আসনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

তখন আজাদ হিন্দের ভোঁসলে, আবিদ হাসান, হবিবুর রহমান প্রভৃতি মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখলেন, নেতাজীর একা এখন জাপানে যাওয়া উচিত হবে কি না। তখন ঠিক হলো কর্ণেল হবিবুর রহমান নেতাজীর সঙ্গে যাবেন। নেতাজী ইশোদাকে আর একটি আসনের জন্য ব্যবস্থা করতে বললেন।

১৭ই আগস্ট বেলা পাঁচটা পনের মিনিটে ডবল এঞ্জিনযুক্ত একটি জাপানী বোমারু বিমান নেতাজী ও হবিবুর রহমান ও কয়েকজন প্রবীন জাপানী সামরিক অফিসারকে নিয়ে সাইগন থেকে টোকিও রওনা হলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যের সময় ইন্দোচীনের টুরেনে প্লেনটি থামল। পরের দিন সকালে আবার রওনা হয়ে বেলা তুটোর সময় ফরমোজার তাইহকুতে পৌঁছল।

যাত্রীরা সব খাওয়া সেরে নিল এইখানে। বেলা আড়াইটার সময় আবার প্লেন ছাড়ল। কিন্তু উপরে উঠতে না উঠতেই প্লেনটিতে আগুন লেগে গেল। বিমানবন্দরের কাছে একটি পাহাড়ে তিনশো ফুট উঁচুতে প্লেনটি পড়ে গেল। কর্ণেল হবিবুর রহমান নেতাজীকে টেনে বার করে আনলেন। তার জামায় তখন আগুন ধরে গেছে। নেতাজী ও কর্ণেল হবিবুর রহমান তুজনেরই গায়ে আগুন। নেতাজীর মুখ ও মাথায় আর হবিবুর রহমানের হাত ও মুখে। তুজনকেই আহত অবস্থায় তাইহকুর জাপ সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হল। হবিবুর রহমানের বরাবরই জ্ঞান ছিল। নেতাজী প্রথমে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরে চিকিৎসার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু তারপর কি হয় হবিবুর রহমান ঠিক জানেন না। কারণ তিনি ছিলেন সেই হাসপাতালেই অন্য ঘরে।

ছয় ঘণ্টার পর হবিবুর রহমানকে খবর দেয়া হয়, নেতাজী মারা

গেছেন। পরে তাঁকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি চেয়ারে বসানো হয়। হবিবুর দেখেন, সামনে চাদর ঢাকা একটি মৃতদেহ শায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে। মৃতদেহটি আপাদমস্তক ঢাকা থাকায় সেটি সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি কর্ণেল হবিবুরের পক্ষে। হবিবুর একবার বলেন, মৃতদেহটি তাঁর হাতে দেয়া হোক, তিনি সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সৎকার করবেন। কিন্তু তাঁকে তা দেয়া হয়নি এবং সেটিকে যথাসময়ে দাহ করে তাঁকে কিছু ভস্মাবশেষ দেয়া হয় শুধু।

১৯৪৫ সালের ২১শে আগস্ট সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনাজনিত এই মৃত্যু সংবাদ। কিন্তু কোন অভ্রান্ত প্রমাণ অভাবে এই মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারল না সকলের কাছে। প্রচুর সন্দেহ আর অবিশ্বাসের অবকাশ রয়ে গেল এই সংবাদের মধ্যে। ভারতের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনি উঠল, এ সংবাদ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের কৃত্রিম ঘটনা; এ সংবাদ মিথ্যা।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর আবিদ হাসান ও কর্ণেল সেগল হবিবুর রহমানের বিবৃতি বিশ্বাস করতে পারলেন না। কর্ণেল হবিবুরের হাতেও কোন অভ্রান্ত প্রমাণ নেই। তাঁকে যা যা বলা হয়েছে তিনি তাই রেকর্ডের মত বলে গেছেন। আবিদ হাসান বহুদিন ধরে নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহচররূপে কাজ করেছেন। তাঁর মতে সাইগনে তেরাউচি ও উর্ধ্বতন জাপ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে নেতাজীর একটি চুক্তি হয়। তাতে ঠিক হয় জাপানীদের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজও আত্মসমর্পণ করবে মিত্রশক্তির কাছে। কিন্তু জাপানীরা নেতাজীকে মাঞ্চুরিয়ায় নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য করবে। সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন চক্র গ্রেপ্তার করতে পারবে না তাঁকে। মাঞ্চুরিয়া থেকে নেতাজী চলে যাবেন রাশিয়া এবং সেখানে গিয়ে অসমাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার চালিয়ে যাবেন সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতিতে।

সুতরাং আবিদ হাসান ও সেগলের মতে যেমন করে হোক ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে রুশ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া ভূখণ্ডের সীমানার মধ্যে নিরাপদে চলে গেছেন নেতাজী। সেখানে হয় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অথবা তাঁকে আধা-স্বাধীন অবস্থায় রাখা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন নেতাজীর বিমানটি ১৮ই আগস্ট তারিখে দুপুরবেলায় ফরমোজায় তাইহকুতে থামলে সেখান থেকে অন্য বিমানে করে সোজা মাঞ্চুরিয়া চলে যান নেতাজী। যে বিমানটি তাইহকু থেকে টোকিও যাবার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এবং যাতে কর্ণেল হবিবুর আহত হন, তার সঙ্গে নেতাজীর মৃত্যুর ঘটনাকে জড়িয়ে ফেললে অনেকগুলি অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়ে যায়।

নেতাজীর প্রিয় একটি রূপোর সিগারেটের কেস ও পড়াশুনোর জন্য চশমা ছিল। এই জিনিস দুটি তাঁর বুশকোটের পকেটে সব সময় রাখতেন নেতাজী। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনার পর পোড়া বা আধপোড়া অবস্থায় এই দুটি জিনিস পাওয়া যায়নি। তাছাড়া নেতাজীর সঙ্গে চার বাক্স মূল্যবান গয়না ছিল। তার ওজন প্রায় দুই থেকে আড়াই মন হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু মাত্র দশ সের ওজনের মত গয়না আধপোড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। যাই হোক, এতগুলি গয়না যদি পাওয়া যেতে পারে তাহলে নেতাজীর সবচেয়ে দুটি প্রিয় জিনিস যা তিনি কখনও কোন অবস্থাতেই ফেলে রেখে কোথাও যেতেন না নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। বিমান দুর্ঘটনার পর নেতাজীর হাতঘড়ি হিসাবে যেটিকে দেয়া হয় সেটি নেতাজীর আসল ঘড়ি কি না সে বিষয়েও প্রচুর সন্দেহ আছে। নেতাজীর হাতঘড়িটি ছিল গোল। ১৯৪৪ সালে টোকিওর ইম্পিরিয়াল হোটেলে তোলা নেতাজীর যে ছবি পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট দেখা যায় এই গোল হাতঘড়ি। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনার পর যে হাতঘড়িটি দেখানো হয় তা চারকোণা। এর দ্বারা বোঝা যায় বেশ কিছু গয়না ও তাঁর উপরোক্ত প্রিয়

জিনিস দুটি নিয়ে তাইহকু থেকেই চলে যান নেতাজী। তাইহকুর কাছে পাহাড়ে যে বিমান দুর্ঘটনা হয় তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁর মৃত্যুর।

ফরমোজার হাসপাতালে সত্যি সত্যিই যদি মৃত্যু হয়ে থাকে নেতাজীর তাহলে আহত ও অসুস্থ কর্ণেল হবিবুর ছাড়া অন্য কোন আই, এন, এর অফিসারকে সিঙ্গাপুর বা সাইগণ থেকে আনা হলো না কেন? তাঁর মৃতদেহ দাহ করার আগে শ্মশানঘাটে তাঁর অনাবৃত মুখ ও দেহাবয়বের একটি ছবি তোলা হলো না কেন?

নেতাজীর মৃত্যুর ঘটনা যদি সত্যি হত তাহলে এই ঘটনার কথা তিন দিন চেপে রেখে ২১ তারিখে প্রকাশ করা হলো কেন?

নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকরা। এর পর সিঙ্গাপুর ও ব্যাঙ্ককে বৃটিশ সৈন্য নামলে মেজর জেনারেল কিয়ানি ও ভোঁসলের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করেন। পরে তাঁদের ভারতে এনে দিল্লীর লালকেল্লায় বিচারের ব্যবস্থা করে বৃটিশ সরকার।

এই সময় ভারতের মুক্তি ফৌজের জন্য সারা ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বৃটিশ সরকারের দমননীতি অগ্রাহ্য করে আত্মবলিদানের জন্য এগিয়ে আসে দেশের প্রতিটি ছাত্র ও যুবক। কলকাতা ও বাংলাদেশে পুলিশী অত্যাচার চরমে ওঠে।

লালকেল্লার বিচারে আজাদ হিন্দ ফৌজের কৌঁসুলীরূপে তাঁদের রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসেন ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ ভুলাভাই দেশাই। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়লে ডাক্তার তাঁকে নিষেধ করেন এ কেস করতে। তখন ভুলাভাই বলেন, এদের রক্ষা করবার জন্য আমায় যদি মরতেও হয় ত মরব। অবশেষে ভুলাভাই দেশাইএর অক্লান্ত চেষ্টায় আজাদ হিন্দ পক্ষের জয় হয়। তাঁরা মুক্তি পান। ১৯৪৬ সালের মার্চ

মাসে তাঁর মৃত্যুকালে জেনারেল শাহ নওয়াজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, যে সংগ্রামের জন্য তোমরা এত কষ্ট সহ্য করেছ সে সংগ্রাম তোমরা চালিয়ে নিয়ে যাও। নেতাজীর একদিন জয় হবেই। ভারত একদিন স্বাধীন হবেই। জয়হিন্দ!

) ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও ১৯৪৮ সালের ২৬শে জানুয়ারি পূর্ণ স্বাধীনতা পেল ভারত। কিন্তু যে সর্বত্যাগী মহান পুরুষ এই স্বাধীনতার জন্য এত সংগ্রাম করেছেন তাঁর প্রচারিত মৃত্যুসম্পর্কে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তাপ রয়ে গেল ভারতবাসীর মনে। সেই উত্তাপের ঢেউ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকর্তাদেরও স্পর্শ করতে থাকে মাঝে মাঝে। সে প্রশ্ন পার্লামেন্টেও ফেটে পড়ে। বিব্রত করে তোলে মন্ত্রীদের। তদন্তের দাবি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে।

এ বিষয়ে ১৯৫২ স লর ৫ই মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সম্পর্কে কোন সন্দেহ আমার মনে নেই। এ বিষয়ে কোন তদন্তের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, "I have said that the question of Netaji Subhas Chandra Bose's death, is, I think settled beyond doubt. There can be no enquiry about that."

১৯৫৫ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীকামাথের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু আবার জানান, এ ব্যাপারে একমাত্র তদন্তকার্য সম্পন্ন করতে পারে জাপান সরকার। কারণ গোটা ঘটনাটা ঘটেছে জাপানে।

দিনকতক পরে অর্থাৎ ৬ই অক্টোবর তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নেতাজী স্মারক স্মৃতি সভায় জেনারেল শাহ নওয়াজ খান বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোন সরকারী তদন্ত কমিটি স্থাপনের পক্ষপাতী নন।

পরে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে তিন জন সদস্য সমন্বিত এক তদন্ত কমিটি গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই কমিটির সভাপতি হন আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল শাহ নওয়াজ। বাকি দুজন সদস্য হলেন, এস, এন, মৈত্র ও নেতাজীর সেজদাদা সুরেশচন্দ্র বসু। জেনারেল শাহ নওয়াজ ও এস, এন, মৈত্র দুজনেই সরকার মনোনীত সদস্য এবং সুরেশচন্দ্র বসু হলেন নেতাজী পরিবারের তরফ থেকে মনোনীত একমাত্র বেসরকারী সদস্য। জাপানে গিয়ে তদন্তের পর এই বছরের ৯ই আগস্ট তারিখে নিউ দিল্লী হতে এই কমিটি ঘোষণা করলেন, Netaji died in a Formosa Hospital during last war. Enquiry findings report to be submitted tomorrow.

অর্থাৎ কমিটি বিমান দুর্ঘটনায় জীবিত অন্যান্য আরোহী, হাইহকু সামরিক হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্স এবং নেতাজীর তথাকথিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যারা সম্পন্ন করেছিল তাদের সকলের সাক্ষ্য গ্রহণের পর নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন।

কিন্তু কমিটির অন্যতম সদস্য সুরেশচন্দ্র বসু অন্য দুজনের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সুরেশচন্দ্রের অসন্তোষের সবচেয়ে বড় কারণ হলো নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সেই সামরিক হাসপাতালে ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার রেকর্ডগুলি তাঁকে দেখানো হয়নি। এ জন্য পরদিন কমিটির এই বিবৃতির প্রতিবাদ করেন সুরেশবাবু। তাঁর মতে জেনারেল শাহ নওয়াজ খাঁ রেলদপ্তরের সেক্রেটারির বড় পদ পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন সরকারের দ্বারা। প্রধানমন্ত্রী আগেই যে ঘোষণা করে বসেছেন লোকসভায় সে ঘোষণার বিপক্ষে যেতে রাজী নন তিনি।

তদন্ত শেষে সুরেশচন্দ্র বসু মন্তব্য করেন,

As world ordinarily be expected, I had a firm belief that this enquiry would be conducted with an

impartial just and open mind and without any preconceived or prejudiced idea or nation and without any mandate from any quarter. I regret very much to state that in this matter I have been sorely disappointed.

সুরেশচন্দ্র প্রথমে ভেবেছিলেন, এ তদন্ত হবে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ এবং একাজ করা হবে একেবারে খোলা মন নিয়ে। কিন্তু কমিটির অন্য দুজন সদস্যের ভাবগতিক দেখে হতাশ হতে হয় তাঁকে। তাঁদের সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় তাঁকে।

সুতরাং এ তদন্ত হলো একেবারে ব্যর্থ। নেতাজী মৃত্যু সম্বন্ধে সেই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ফাঁকটিকে একটুও পূরণ করতে পারল না এ তদন্ত। বরং তা বাড়িয়ে দিল আরও। এ বিষয়ে প্রতিটি ভারতবাসীর প্রাণের প্রশ্নকে প্রখর করে দিল আরও।

যদিও সেই অমিতপ্রভব সূর্যসন্নিভ আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের মৃত্যু নেই, যদিও সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের আত্মিক প্রভাব ভারতের জল, স্থল অন্তরীক্ষ আর মানুষের মনের প্রতিটি অনুকণায় চিরদিন ধরে ছড়িয়ে চলবে বৈপ্লবিক প্রেরণার শাশ্বত বীজ, তবুও তাঁর মরদেহ কোথায় কি ভাবে বিরাজ করছে সে সম্পর্কে কেন একটি পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হলো না আজও? তবে কি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের শারীরিক উপস্থিতির এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা আর উত্তাপকে ভয় পান ভরত সরকার?

॥ শেষ ॥